চাহেন না। বিশেষতঃ ইউরোপে কিনা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কামান প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তাঁহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দুরা কামান নির্ম্মাণ বা ব্যবহার করিতে জানিত ইহা বিদেশীমণ্ডলে সহজেই বিশ্বাস হইবার নহে। সাধারণ মত এই যে ১৩৩৬ কিম্বা ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ইহা এখন এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহার অগ্রে ১৩১২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মূরগণ স্পেনে এক প্রকার কামান ব্যবহার করিয়াছিল। মূরগণ যে আরবদিগের কর্তৃক অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং অধুনা যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে কামান ব্যবহারও তাহারা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়া পরে ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছে।

কিন্তু মূরদিগের ইউরোপে কামান প্রচলিত করিবার বহুদিন পরে ইংরাজেরা সবে মাত্র ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম কামান ব্যবহার করেন, সুতরাং ভারতবর্ষেও যে অল্প দিন হইতে কামান চলিয়াছে এ কথা যে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রা[illegible] ও মহাভারতে যে শতঘ্নীঅস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা [illegible] ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের মতেও কামান ব্যতীত আর [illegible]

লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন (৬) যে যমুনাস্তম্ভ কখনই মুসলমান-কৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যমুনা-স্তম্ভের তলদেশে হিন্দুদিগের পূজার ঘণ্টা প্রভৃতি যে সকল প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত রহিয়াছে তাহাতে উহা হিন্দুদিগের কৃত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। যমুনাস্তম্ভ আদিকালে যত উচ্চ ছিল এখন আর তত উচ্চ নাই। কেননা কুতবউদ্দিন উহার শিখর দেশ ভগ্ন করিয়া মুসলমানরীতি অনুসারে পুনর্ব্বার উহার শিখর নির্ম্মাণ করিয়া স্বনামেই উহা প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

যেমন কুরুক্ষেত্র এখন স্থানেশ্বর নামে অভিহিত, তেমনি কুরুক্ষেত্রের পুণ্যনদী দৃশদ্বতীও অধুনা কাগার (৭) নামে খ্যাত। ইহা স্থানেশ্বর প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে।

পাগলিনীর ব্যাপারটি আমরা একটী প্রকৃত ঘটনার আভাষ হইতে কল্পিত করিয়া লইয়াছি।

কাপ্তেন টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে আশা-পূর্ণানামে দেবী যথার্থই দিল্লির কুলদেবী ছিলেন, এবং সকল রাজপুতেরাই কোন কর্ম্ম করিবার অগ্রে আশাপূর্ণা দেবীর পূজা করিতেন।

…nninghan's Archeaological Survey of … Vol. IV.

…lphinstone's History of India.

হৃদয়ে ভক্তি এবং ভালবাসার উদ্রেক হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কম্পিতও হইতে থাকে। তাঁহার তেজস্বী অথচ অহঙ্কারশূন্য, প্রশান্ত কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাত্মক। সমরসিংহ ষড়বিংশ বর্ষীয় মাত্র, কিন্তু তাঁহার উন্নত রাজমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, সহসা একজন ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল "মহিষীর একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে।" এই শুভ সংবাদ শুনিয়াই মহারাজের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশাল সমুদ্র সহসা যেন রজতমার্জ্জিত হইয়া পড়িল।

মহারাজ হৃষ্টচিত্তে পুত্রমুখ দেখিতে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। এই শুভ লগ্নে কুমারের জন্ম হইতে সকলের হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। সমরসিংহ পুত্রমুখ দেখিয়া যেখানে তাঁহার গুরুদেব মঙ্গলাচার্য্য পুত্রের কোষ্ঠী নির্ণয় করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। মঙ্গলাচার্য্য রাজবাটীর উদ্যানে কুশাসনোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার হস্তে পুথি, পরিধান পট্টবস্ত্র, সুদীর্ঘ শুভ্র ললাটে রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র। তিনি পুথি পরে দৃষ্টি রাখিয়া নবকুমারের ভাগ্য গণনা করিতেছেন এবং সেই গণনার সহিত তারা নক্ষত্রের গতি মিলাইবার জন্য যেন মাঝে মাঝে এক একবার

আকাশে চাহিয়া দেখিতেছেন। গগন-মণ্ডলে মেঘের চিহ্ন-মাত্র নাই; আকাশের স্থানে স্থানে তারকারাজি দীপ্তি বিকাশ করিতেছে; আর পূর্ণশশধরের নির্ম্মল কিরণে সমস্ত উদ্যান, সরোবর, বৃক্ষ-পত্র, শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে। এ আলোকের নিকট দীপালোকের শোভা কোথায়? সে আলোক ইহার নিকট তীব্র লাগিতেছিল।

সমরসিংহ আসিয়া দেখিলেন, গুরুদেব গণনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ বিষাদে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার মুখ দেখিয়া সমরসিংহের আহ্লাদ তিরোহিত হইল; তিনি বলিলেন, "গুরুদেব! নবকুমারের ভাগ্যে কি দেখিলেন? সে ভবিষ্যতে রাজা হইবে ত?"

মঙ্গলাচার্য্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হইবে—কিন্তু—" সমরসিংহ 'কিন্তু' শুনিয়া বিষাদে ও বিস্ময়ে গুরুদেবের কথা শেষ না হইতে হইতে বলিলেন, "এবারও 'কিন্তু?' হায়! আমি এত কি পাপ করিয়াছি, যে আমার বংশে কেহই কোনমতে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবে না। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন—'কল্যাণ যদি সিংহাসনারূঢ় হয়, তবে গড়তোরের সৌভাগ্য। এমন সুপুত্র তোমাদের বংশে এ পর্য্যন্ত জন্ম-গ্রহণ করে নাই, কিন্তু কল্যাণ কোন শাপ-ভ্রষ্ট দেব। রাজা হইবার উপযুক্ত বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কল্যাণ এ পৃথিবীতে থাকিবে কি না সন্দেহ স্থল, তুমি তাহার রাজা হইবার আশা

ত্যাগ কর।' আমি কল্যাণের মঙ্গল কামনায় আপনাকে কত যাগ, যজ্ঞ, হোম করিতে বলিলাম, আপনি কিছুতেই তাহার সে গ্রহ খণ্ডন করিতে পারিলেন না। এখন কল্যাণের আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। কল্যাণের কনিষ্ঠ যে দুই ভ্রাতা আছে, আপনি বলিলেন. 'তাহারা রাজা হইবার উপযুক্ত নহে, তাহারা রাজা হইলে চিতোরের মঙ্গল নাই। তুমি আবার বিবাহ কর'। আমি সেই জন্য তাহাদেরও আশা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিলাম। তাহার সন্তান হইল না দেখিয়া. আপনার আজ্ঞাক্রমে আবার কমলদেবীকে বিবাহ করিলাম। তিনি গর্ভবতী হইলে আপনি বলিয়াছিলেন 'এবার যে পুত্র জন্মিবে সেই তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।' আমি মনে মনে কত আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলাম। এখন আজ আবার আপনি বলিতেছেন 'রাজা হইবে, কিন্তু'—তবে কিন্তু কি বলুন? আমার অদৃষ্টে নাই, আপনি কি করিবেন?"

গুরু। "বৎস! অত নিরাশ হইও না। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন হয় না, আমি কি করিব? এই নবকুমারের সমস্ত রাজলক্ষণ দেখিতেছি, যে প্রকারে হউক রাজা হইবে। কিন্তু তিন বৎসরে ইহার একটী গ্রহ আছে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিতে হইবে, তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইলে আর ভয় নাই।" সহসা এই সময় তাঁহারা অদূরে চীৎকার শুনিতে পাইলেন। দুই জনে সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,

একজন স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে কি লইবার জন্য দুই তিন জন স্ত্রীলোক চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে তাহা ছাড়িয়া দিতেছে না; এবং তাহাদের চারি জনের কথাতেই এইরূপ কলরব হইতেছে; তাহারা কোলাহল করিতে করিতে রাজ-গোচরে উপস্থিত হইল। একজন বলিল, "মহারাজ! এই পাগলী আপনার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আমাদিগের নিকট কোনমতে দিতে চাহিতেছে না। বলদ্বারা লইতে গেলে কুমারের লাগিবে ভয়ে আমরা বল প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।" তাহার কথা শেষ হইলে মঙ্গলাচার্য্য সমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পাগলিনী কে?" সমরসিংহ বলিলেন, "এ কি, আপনি বিন্দু দাসীকে চিনিতে পারিতেছেন না? আপনি কি শুনেন নাই, সে পাগল হইয়া গিয়াছে?" মঙ্গলাচার্য্য বলিলেন, "আমি তীর্থ হইতে আসিয়া ও কথা শুনি নাই। আর পাগল হইয়া এখন যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমি সত্যই প্রথমে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু পাগল হইল কেন?"

সমর। "ছয়মাস হইল, উহার একটী সন্তান হইয়াছিল, সেই সন্তানটী দুই তিন মাসের হইলে পাগলিনী বিধবা হয়। তাহার কিছুদিন পরে সেই সন্তানটীরও মৃত্যু হইল। সেই অবধি বিন্দু পাগল হইয়া গিয়াছে। পাগলিনী এখন মনে করে আমি উহার স্বামী; আর, উহার বিশ্বাস যে,

উহার পুত্র মরে নাই, জীবিত আছে, কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উহার আর বড় পাগলামী দেখা যায় না।" পাগলিনী এই সময় সহর্ষে শিশুকে চুম্বন করিতে করিতে বলিল, "মহারাজ! আজ আমি আমার হারাধনকে আবার পেয়েছি। আহা! যেমনটী হারিয়েছিল, ঠিক তেমটিই আছে। কে চুরি করেছিল জান?" এই বলিয়া সমরসিংহের কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমার সতীন। আজ দেখি, আমার বাছাকে সে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে আছে। আমি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান হতে তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কেমন জব্দ করেছি, কি মজা, হা হা হা!" সপত্নীকে ফাঁকি দিয়াছে, এই আহ্লাদে সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিল। সমরসিংহ বলিলেন, "না, এ তোমার পুত্র নহে। তুমি যাহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছ, এ তাহারি পুত্র। তোমার পুত্র হইলে এত দিন অনেক বড় হইত, দেখিতেছ না, এ সদ্যোজাত শিশু সন্তান?" পাগলিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কি—তুমিও সতীনের দিকে হয়ে আমার পুত্র তাকে দিতে বল্‌ছ? আমার স্বামীও আমার উপর নির্দ্দয়! না, আমি আমার বাছাকে দেব না, বরং তুমি আমার সতীনের হয়ে থাক। আর আমি তোমার দাবি করব না। আমি আর তোমাকে চাই না। তুমি তার একার স্বামী হও। আমি আমার বাছাকে

নিয়ে থাকি। আমার হারানিধি আবার আমি পেয়েছি—আমার ভাবনা কি?" পাগলিনী শিশুকে সমরসিংহের মুখের নিকট আনিয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি, আমার বাছার মুখ দেখ দেখি, ঠিক তেমনিটীই আছে। ওমা! এতক্ষণ এনেছি,—তোমার পুত্রের মুখে একটা চুমও খেলে না! হাঁ বুঝেছি, এ যে দুয়রাণীর ছেলে, স্থয়রাণীর পুত্র হলে এতক্ষণ কত গণ্ডা চুম পড়ত।" সমরসিংহ বলিলেন, "আচ্ছা, আমার ক্রোড়ে দেও, চুম্বন করি।"

পাগলিনী। তোমার কোলে দিতে ভয় হয়, যে সতীনের বশ, এখনি আমার পুত্র তাকে দিয়ে তার মন সন্তুষ্ট করতে পার। তা এই নেও! তোমারও তো পুত্র। তোমারও তো একবার কোলে করতে ইচ্ছা হয়। এই নেও, একবার কোলে করে চুম খেয়ে আমাকে দেও।" সমরসিংহ পাগলিনীর ক্রোড় হইতে পুত্র লইয়া এক জন পরিচারিকার ক্রোড়ে দিলেন। সে তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল। পাগলিনী রোষ ও বিস্ময়ের সহিত ক্ষণকাল রাজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরে রোষ-কম্পিতস্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! এই তো কর্ত্তব্য! আজ আমার রূপ গিয়াছে, যোহন গিয়াছে, এই ত ঠিক! এইত উচিত! যাও যাও! যাক্ যাক্ সব যাক্! আমার আছে কে? আমার স্বামী আমার না, সতীনের বশ, আমার ছেলে আমার না, সতীনের; তবে আমার আছে

কে ?" পাগলিনী রুসিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।
পাগলিনী যতক্ষণ ছিল, মঙ্গলাচার্য্য তাহার দিকে একদৃষ্টে
চাহিয়া ছিলেন। সে গমন করিলে তিনি বলিলেন, "এই
পাগলিনীর ক্রোড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত কুমারকে কোন
মতে দেওয়া না হয়, ইহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে।
একে ত সে ক্ষিপ্ত, তাহার কোলে শিশু সন্তান দেওয়াই
উচিত নহে, উহার মনের ভাব প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে
পারে, কখন মাতৃচক্ষে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিবে, কখন
সপত্নীপুত্র ভাবিয়া মন্দ ইচ্ছা হইবারও আশ্চর্য্য নাই,
এবং সে বালককে লইবার জন্য যে প্রকার উৎসুক,
তাহা দেখিয়া আমার ভয় জন্মিতেছে, হয় তো উহার
দ্বারাই কুমারের কোন মন্দ হইবে, সেই জন্যই উহাকে
মাতৃচক্ষে দেখিতেছে। যাহাই হউক, তিন বৎসর পর্য্যন্ত
উহার কোলে যেন না দেওয়া হয়, আর একটী রক্ষা কবচ
সর্ব্বদা কুমারের গলদেশে রাখিতে হইবে। তিন বৎসর যদি
নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আর ভয় নাই।" মঙ্গলা-
চার্য্য আবার বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। লক্ষ্মী-
দেবীর সন্তান হয় নাই, সপত্নীর সন্তান দেখিয়া মনে ক্ষুণ্ণ
হইয়া তিনি যদি কিছু অনিষ্ট কামনা করেন, সে পথও রুদ্ধ
করা উচিত। কমলদেবীকে সকল বুঝাইয়া বলিয়া লক্ষ্মী
দেবীকে এই শিশু সন্তান সমর্পণ কর। এই শিশু আজঅবধি
তাঁহার পোষ্য সন্তান হউক। কমলদেবীর সন্তান বলিয়া

কুমারকে কেহ যেন কখন উল্লেখ করে না। আপনার সন্তান হইলে লক্ষ্মীদেবীর হিংসার কিম্বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ থাকিবে না।" মঙ্গলস্বামী যাহা যাহা বলিলেন, মহারাজ তাহাই করিলেন। নবকুমারের কিরণসিংহ নাম প্রদত্ত হইল। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে পুত্ররূপে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমার দিন দিন শ্রীসৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাগলিনী তাহাকে আপন পুত্র জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ক্রোড়ে দিতে নিষেধ থাকায় নিতান্ত কাকুতি মিনতি করিলেও কেহ তাহার ক্রোড়ে দিতে সাহস করিত না। পাগলিনী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ হইত। কিন্তু কি করিবে, 'স্বামী সতীনের বশ,'—ক্রোড়ে না দিলেও তাহার কিছু ক্ষমতা নাই। ক্রমে বালক তিন বৎসরে পদার্পণ করিল। এত দিনের মধ্যে কুমারকে একবারও ক্রোড়ে না পাইয়া সন্তান পুনঃ প্রাপ্তির আশায় পাগলিনী ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল। 'এখন যদি তাহার সপত্নী এক দিনের জন্যও তাহার সন্তানকে তাহার ক্রোড়ে দেন, তাহা হইলেই সে তাহার বাছাকে সতীনকে দিবে,' মনে মনে এই স্থির করিয়া পাগলিনী এক জন পরিচারিকাকে বলিল, "সতীনকে গিয়া বল, আমার পুত্রকে তাহাকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এখন সে আমার ক্রোড়ে একবার কিরণকে দিবে কি না?" তখন পরিচারিকার ক্রোড়ে কিরণসিংহ ছিল ও

বলিল, "কেন, সে পাগলি এলে কি হবে?" কুমার বলিল, "আমি অমনি দৌড়ে তার কোলে যাব।"

দাসী। "আমরা যেতে দেব কেন?"

কুমার। "ঈস্! দেবে না বই কি! আমি দৌড়ে তার কোলে যাব, সে যে আমাকে নিতে চায়।" পরিচারিকা বলিল "সে যে পাগল তোমাকে যদি মারে ধরে?"

কুমার। "সে আমাকে মারবে কেন? আমাকে তো কেহ মারে না, আমি তার কোলে দৌড়ে যাব।"

পরিচারিকা। "তুমি তার কোলে যাবে কি? আমরা তো যেতে দেব না।" বালকদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা যায়, তাহারা তখনি তাহা করিতে আরো ব্যগ্র হইয়া উঠে। পরিচারিকার কথায় সে বলিল "না, আমি যাব।" দাসী তাহাকে ভুলাইবার ইচ্ছায় বলিল "সে তো এখানে নাই, তুমি কেমন করে যাবে?"

কুমার। "না আমি যাব।" পরিচারিকা তাহাকে অন্যমনা করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "ছি ও কথা কি বলে, ঐ দেখদেখি কেমন একটা বড় কেয়াফুল ফুটেছে।" কিরণ অমনি পাগলিনীর কথা ভুলিয়া গিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কই?"

দাসী। "ঐযে, ঐ পুকুরের ধারে। এই আমাদের খুব কাছে।" কিরণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কই?"

পরিচারিকা। "ঐ যে, ঐ গাছটার আড়াল দিয়ে একটু

একটু দেখা যাচ্ছে।” কিরণ বলিল, “ঐ ফুলটা আমি নেব, আমি যাই।” এই বলিয়া কুমার সেই দিকে ছুটিল। পরিচারিকা তাহাকে ধরিয়া বলিল, “ওমা! ওযে পুকুরের পাড়ে ফুটেছে, তুমি আন্‌তে পারবে কেন? পড়ে যাবে যে?” কুমার তাহার হস্ত ছাড়াইয়া পলায়নের নিমিত্ত বল প্রকাশ করিল, কিন্তু সক্ষম না হইয়া বলিল, “আমি ঐ ফুল নেব, না পেলে মাকে বলে দেব।” দাসী এখন পুষ্করিণীর তীরে গিয়া কণ্টকাবৃত কেয়াফুল তোলা বিষম সঙ্কট দেখিয়া বলিল, “এই যে এইখানে এই অনেক ফুল ফুটেছে তুলে দিচ্চি।”

কিরণ। “না এ ফুল না, আমি ঐ ফুল নেব।”

পরি। “তবে ঐ দরজায় গিয়া একজন প্রহরীকে বলি, সে ঐখানে গিয়া তুলে এনে দেবে।”

কিরণ। “না, প্রহরী দেবে না, তুমি এখনি এনে দেও।” দাসী কিরণের হস্ত হইতে কোনমতে নিস্তার না পাইয়া অগত্যা অতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া বলিল “আচ্ছা এস, ঐ পুকুরের কাছে গিয়ে তোমাকে ঐ প্রহরীর নিকট রেখে আমি ফুল তুলে আনি।”

চিতোরের রাজবাটী কতকটা দুর্গের আকারে নির্ম্মিত। সমস্ত রাজবাটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সেই প্রাচীর ও বাটির মধ্যে যে স্থান আছে, তাহা পুষ্পবৃক্ষে, প্রস্তর চিত্রে ও ফোয়ারায় একটি উদ্যান রূপে শোভিত হইয়াছে। সেই

উদ্যানের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে বাটী পর্য্যন্ত যন্ত্র-নির্ম্মিত পথ চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের চারি দিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার। প্রতি দ্বারের বাহিরে ও ভিতরে প্রহরীগণ সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চারিটি দ্বার ভিন্ন বাটী প্রবেশের অন্য দ্বার নাই। প্রাচীরের বাহিরের চতুর্দ্দিক আবার প্রকাণ্ড রমণীয় উদ্যানে বেষ্টিত। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে আর প্রাচীর নাই। উচ্চ উচ্চ লৌহদণ্ড দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, এবং ইহার দ্বারগুলিনও লৌহনির্ম্মিত। রাজবাটীর প্রাচীরের চারি দিকে যেমন চারিটি প্রবেশ-দ্বার আছে, এই উদ্যানেরও তেমনি চারিটি প্রধান প্রবেশ-দ্বার। কিন্তু তাহা ব্যতীত ইহার স্থানে স্থানে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-দ্বার ছিল। চারিটি প্রধান প্রবেশ-দ্বারের ন্যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে তেমন প্রহরীর আড়ম্বর ছিল না। প্রতি ক্ষুদ্র দ্বারে সর্ব্বদা একজন করিয়া প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কোন আবশ্যক হইলে, শীঘ্র যাইবার জন্য প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়া ঘুরিয়া না গিয়া, বাটীর দাসদাসী কখন কখন এই পথ দিয়া বাহিরে যাতায়াত করিত। তাহা ভিন্ন ইহা সচরাচর গমনা-গমনের পথ ছিল না। প্রথম এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, আবার সেই প্রাচীর দ্বার অতিক্রম করিলে তবে রাজবাটী মধ্যে প্রবেশ করা যাইত। এই উদ্যানে আজ কিরণসিংহ তাহার পরিচারিকার সহিত ভ্রমণ করিতেছিল। যে পুষ্করিণীর তীরে কেয়াফুল ফুটিয়াছিল, তাহার দক্ষিণ দিকে উপরোক্ত

প্রকারের একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। পরিচারিকা সেখানে আসিয়া তাহার দ্বারীকে বলিল "আমি কেয়াফুল তুলিতে ঐ পুকুরধারে যাচ্ছি, তুমি একবার এই কুমারকে দেখ। বাবা! এমন দুরন্ত ছেলে দেখি নাই, যা ধ'র্‌বে তা কিছুতেই ছাড়বে না।" কিরণকে প্রহরীর নিকট রাখিয়া পরিচারিকা ফুল তুলিতে চলিল। বৃক্ষের নিকট পঁহুছিয়া সে ফুল তুলিবার নিমিত্ত কেয়াবৃক্ষে হস্তার্পণ করিল। কণ্টকে অঙ্গুলী ঈষৎ বিদ্ধ হওয়াতে আবার অমনি হস্ত টানিয়া লইল। মনে মনে কুমারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু কেয়াফুল না লইয়া গেলে নিস্তার নাই দেখিয়া আবার সাবধানে তুলিতে চেষ্টা করিল। আপন অঞ্চল দ্বারা সাবধানে বৃন্ত ধরিয়া আস্তে আস্তে ফুল তুলিল। কিন্তু কেবল কণ্টকে অঙ্গুলী বিদ্ধ হইয়াই সে নিস্তার পাইল না। ফুল লইয়া যেমন আসিবে, তাহার অঞ্চল কেয়াবৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া অমনি সে সেখান হইতে একবারে পুষ্করিণী মধ্যে পড়িয়া গেল। পড়িয়াই 'মরিলাম' 'মরিলাম' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া, দাসী জলমগ্ন হইয়াছে, এই ভাবিয়া, প্রহরী কুমারকে সেইখানে রাখিয়াই, পুষ্করিণীর তীরে ছুটিয়া আসিল, আপনি অৰ্দ্ধজলে নামিয়া তাহাকে টানিয়া টানিয়া তীরে তুলিল। ভয়েই পরিচারিকার অৰ্দ্ধ মৃত্যু হইয়াছিল। সে তীরে উঠিয়া একটু শমিত হইবামাত্র যত রাগ কুমারের উপর ঝাড়িতে লাগিল। "বাবা, এমন ছেলে দেখিনি,

যা ধরবে তা কিছুতেই ছাড়বে না। রাজার ছেলে আবার আমাদের কিছু বলিবারও যো নাই।" প্রহরী তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল "চুপ চুপ, তোমার কথা যদি কেহ শুনিতে পায়? রাজাদের প্রতি রাগ করিতে নাই, যদি কর তো মনে মনে।" প্রহরী তাহাকে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু যেখানে কুমারকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা একটু ভীত হইল; খেলিতে খেলিতে যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে, প্রথমেই এই আশঙ্কা হইল। তাহারা উভয়েই ইতস্ততঃ একটু অন্বেষণ করিয়া দেখিল, পাইল না। তখন ভাবিল, কোন কারণ বশতঃ হয়তো কোন দাস দাসী এই পথ দিয়া যাইতেছিল, কুমারকে একাকী দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। কুমার একাকী ছিল, সেই জন্ত রাজ্ঞীগণ দাসীকে এক্ষণি কত ভর্ৎসনা করিবেন ভয়ে দাসী অত্যন্ত ভীত হইল। সে রাজ্ঞীগণের ভর্ৎসনায় কিরূপে উত্তর দিবে ভাবিতে ভাবিতে আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গমন করিল। সেখানে আসিয়া রাজ্ঞীগণের কথা কহিবার অগ্রেই ক্রন্দন স্বরে বলিল "আমার কিছু দোষ নাই, আমি প্রহরীর কাছে দিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু—কিন্তু—" কমলদেবী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি বকিতেছিস্! পাগল হইয়াছিস্ নাকি?" তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে না দেখিয়া, দাসী একটু সাহস পাইয়া বলিল "যথার্থ আমি দিব্বি করে

বলছি, আমি কুমারকে প্রহরীর নিকট রেখে গিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষের দৈব বিপদ।" কমলদেবী ভীত হইয়া বলিলেন "কি আবার দৈব বিপদ ঘটিয়াছে। প্রহরীর নিকট হইতে কুমার পড়িয়া গিয়াছে?"

দাসী। "না না, কুমার পড়্‌বে কেন, বালাই! আমি পুকুরে আর একটু হলে ডুবে মরেছিলুম।" তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন, "তবে আবার বাঁচ্‌লি কি করে?"

দাসী। "সেই প্রহরী আমার চীৎকার শুনতে পেয়ে আমাকে গিয়ে তুল্‌লে। আপনারা বুঝে দেখুন, এতে কি আমাদের কারো দোষ আছে?"

কমল। "দোষ আছে কে বল্‌ছে, প'ড়ে গিয়েছিস, প্রহরী তুলেছে, এতে আর দোষ কি?"

দাসী। 'তাই আমিও তো তাই বল্‌ছি, এতে আর দোষ কি? তবুও আমি আপনারা বক্‌বেন মনে করে এতক্ষণ, ভয়ে মরেছিলুম।

কমল। "এতে ভয় পেলি কেন? তুই মরতে মরতে বেঁচে গেছিস, আমরা শুনে আরো খুসি হলেম, বক্‌ব কেন?"

দাসী। "আমিও তো তাই বলছি। আপনারা হলেন মা বাপ, আপনারা আমাদের ভাল বাসবেন না তো কে বাসবে? তবে কুমার কোথা? তার জন্তে আমি এই কেয়া-ফুল তুলে এনেছি।"

কমল। "কুমার কোথা তা আমরা কি জানি। তুই যে বলছিস প্রহরীর কাছে রেখে গিয়েছিলি?"

দাসী। "আমি বলি বুঝি আপনারা আমাদের, ক্ষমা করেছেন, আপনারা শুনলেন আমাদের দোষ নাই, আর কেন? এবারকার মত মাপ করুন।" কমলদেবী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "বুঝেছি—তোদের দোষে কুমারের কোথায় লেগেছে? কি হয়েছে খুলে বল্ না? আর আমরা তোর 'মাপ করুন,' শুনতে চাই না।"

দাসী। বালাই! কুমারের কিছু হয় নাই।"

কমল। "তবে কি?"

দাসী। "কুমারকে প্রহরী একেলা রেখে আমাকে তুলতে গিয়াছিল তাই বলছি।"

কমল। "একাকী রেখে গিয়াছিল তা কি হয়েছে?"

দাসী। "এমন কিছু হয় নাই; কেবল আমরা জব্দ হয়েছি।"

কমল। "তোরা জব্দ হলি কি করে?"

দাসী। "কুমারকে একাকী দেখে আমাদের জব্দ করবার জন্য কে তুলে নিয়ে এসেছে।"

কমল। "এতে তোরা জব্দ হবি কি করে?"

দাসী। "আপনাদের কাছে নিয়ে আসবে, আর আপনারা আমাদের বকবেন।"

কমল। "কই আমাদের নিকট কুমারকে তো কেহ আনে নাই।" দাসীর সে কথা বিশ্বাস হইল না। সে ভাবিল

তাঁহারা তাহার সহিত তামাসা করিতেছেন। সে বলিল "অপরাধ ক্ষমা করুন, আর কখন, আমি কুমারকে একাকী রাখিব না। সে কোথায় বলুন, ফুল্ দেব।" মহিষীগণ আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া বলিলেন "তুই কার কাছে দিয়েছিস্? সে কোথায় নিয়ে গেছে, আমরা এখান হ'তে কি প্রকারে জানব?" দাসী কমলদেবীর চরণে পতিত হইয়া বলিল, "যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে আর আমি এমন কর্ম্ম কখন করিব না। কুমার কোথা আপনি বলুন।" মহিষীগণ তাহার কথায় উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য ও ভীত হইতে লাগিলেন। যথার্থ কি ঘটনা হইয়াছে, তাহা দাসীকে সবিশেষ বলিতে আজ্ঞা করিলেন। ক্রমে সে যেরূপ বলিল, তাহাতে তাঁহারা ভীত হইয়া বাটীর প্রত্যেক দাসদাসী প্রহরীদিগকে কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল "জানি না।" কুমারের নিমিত্ত বাটীমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহারা উদ্যানে ও বাটীর নিকট নিকট চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভাবিল "কুমার একাকী খেলিতে খেলিতে কোথাও গিয়াছে।" যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে, এই ভয়ে সকলে ভীত হইল। ক্রমে সমরসিংহ তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি ব্যাকুলচিত্তে স্বয়ং লোক সঙ্গে লইয়া, রাজবাটীর প্রত্যেক পুষ্করিণী, প্রত্যেক মঞ্চ, প্রত্যেক গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। যদি জলনিমগ্ন হইয়া থাকে, এই আশঙ্কায় প্রত্যেক পুষ্করিণী মধ্যে দুই তিন বার প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ

করা হইল; কিন্তু হায়! তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা হইল। উদ্যান, বাটী তল্লাস করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি কুমারকে পাওয়া গেল না। তথন সমরসিংহ শোকপূর্ণহৃদয়ে পরিচারিকাকে সম্মুখে আনীত করিয়া আবার নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রহরী যখন দাসীকে তুলিতে গিয়াছিল, তখন কিরণ কোন স্থলে ছিল, তাহাদের আসিতে কত বিলম্ব হইল ইত্যাদি নানা রূপ প্রশ্ন করিলেন। তাহারা পূর্ব্বেও যেমন বলিয়াছিল, এখনও সেইরূপ বলিল। সমরসিংহ যখন তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন সেখানে অনেক লোক ছিল। দাসী কিরণকে প্রহরীর নিকট রাখিয়া ফুল তুলিতে গিয়াছিল, শুনিয়া একজন বলিয়া উঠিল "মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, দাসী কুমারকে রাখিয়া ফুল তুলিতে যায় নাই, প্রহরী ফুল তুলিতে গিয়াছিল। কেন না তখন আমি ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় দ্বারে প্রহরীকে দেখিলাম না কেবল দ্বারদেশে কুমারকে কোলে করিয়া দাসীকে বেড়াইতে দেখিলাম।" পরিচারিকা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কখন কোলে করিতে দেখিয়াছ? যতক্ষণ আমি উদ্যানে কিরণের নিকট ছিলাম, তাহার মধ্যে কুমার একবারও আমার ক্রোড়ে উঠে নাই, হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিল। তোমরা যাহা বলিয়া শপথ করিতে বল, আমি করিতেছি। আর আমি ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম কি না, তাহা ঐ প্রহরী সাক্ষী দিবে।" প্রহরী পরিচারিকার পোষকতা করিয়া বলিল,

"কয়ার্থই দাসী কুমারকে আমার নিকট রাখিয়া ফুল তুলিতে গিয়াছিল। আমার বোধ হয়, আমি যখন পুকুর হইতে উহাকে তুলিতে গিয়াছিলাম, তখন অন্য দাসীর ক্রোড়ে কুমারকে দেখিয়া তোমার এই দাসী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বা কি প্রকারে হইবে ? সকল পরিচারিকাই তো বলিতেছে 'কুমারকে দেখে নাই।' তাহাদের কথায় হঠাৎ দুই তিন জন প্রহরী এককালে বলিয়া উঠিল, "তবে তো আর এক হইতে পারে, আজ পাগলিনী রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল দ্বার শূন্য ও কুমারকে একাকী দেখিয়া সে যদি সেই দ্বার দিয়া লইয়া গিয়া থাকে।" এই কথায় দাসী ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাহাই হইবে, এই ঠিক। একদিন পাগলী আমার কোল হইতে কুমারকে লইতে আসিয়াছিল, নিষেধ থাকায় আমি দিই নাই। তাহাতে সে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। তখন তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, কি বলিয়াছিল এখন বুঝিতেছি।" এই বলিয়া পাগলিনীর সহিত তাহার কি হইয়াছিল, সবিশেষ সমর সিংহকে বলিল। এবার তিনি বুঝিতে পারিলেন, কুমারকে পাগলিনী লইয়া গিয়াছে। ঐরূপ মনে না হইয়া বাটীর মধ্যে ও নিকট নিকট স্থান দেখিতেই বৃথা এত সময় নষ্ট হইল, এই ভাবিয়া সমরসিংহ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যাহারা পাগলিনীকে বাটী প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, তিনি তাহাদের বলিলেন, "পাগলিনীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলে,

তাহা এতক্ষণ বল নাই কেন?" তাহারা বলিল "তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের তাহাকে সন্দেহ হয় নাই। কেননা পাগলিনী কুমারকে লইয়া পলায়ন করিলে, দ্বার লঙ্ঘনের সময় কোন না কোন প্রহরীর নয়ন-প্রথে পড়িত, কিন্তু আমরা কেহই উহাকে বাটীর বাহির হইতে দেখি নাই, কিন্তু পরে যখন শুনিতেছি, একটী ক্ষুদ্র দ্বার শূন্য ছিল তখন মনে হইতেছে, সেই দ্বার দিয়া পাগলিনী পলায়ন করায়, আমরা কেহ দেখিতে পাই নাই।"

সমরসিংহ এখন ব্যাকুল হৃদয়ে পাগলিনীর উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়া আপনিও তাহার সন্ধানে গমন করিলেন।

কুমারকে পাগলিনী লইয়া গিয়াছে শুনিয়া মঙ্গলস্বামী বুঝিলেন, "যদি পাগলিনীর ক্রোড়ে তিনি শিশুকে দিতে নিষেধ না করিতেন, তাহা হইলে এ প্রকার ঘটিত না। নিষেধ করিয়াই বিপরীত ঘটিল। তাঁহার পরামর্শেই ভবিতব্য ফলিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাগলিনী কি প্রকারে কুমারকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদে প্রকাশ করিব।

রাজবাটী ত্যাগ করিয়া অবধি পাগলিনী পথে পথে বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং ভিক্ষার দ্বারা উদর পোষণ করিত। কিন্তু কিরণকে সে ভুলিতে পারে নাই। অল্পদিন পরেই আবার কিরণকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সতীনের বশীভূত স্বামীর বাটী যাওয়া অপমানজনক জ্ঞানে বাটীর বাহির হইতে কিরণকে দেখিবে, এই স্থির করিল।

পাগলিনী কিরণকে দেখিবার নিমিত্ত সেই দিন রাজবাটীর নিকটস্থ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছিল। কিরণ তাহার পরিচারিকার সহিত ছিল। সে চাহিয়া চাহিয়া দূর হইতে দেখিতেছিল। কিরণকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিতে পাগলিনী অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। 'সতীনের বাটী' বলিয়া আর তাহার মনে রহিল না। সে রাজপথ ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর অভিমুখে চলিল। দ্বারে পৌঁছিলে একজন প্রহরী বলিল, "কি পাগলি! এতদিনের পর আজ যে এখানে আস্‌ছ?" "পাগলী" বলিলে পাগলিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত। সে ক্রুদ্ধ হইয়া আস্তে আস্তে বকিতে বকিতে সেখান হইতে উদ্যানে প্রবেশ করিল, বলিল, "একবার স্পর্দ্ধা দেখ! চাকর হয়ে কি না রাণীকে পাগ্‌লী বলে! স্বামী সতীনের বশ ব'লে কেহই গ্রাহ্য করে না।" কিরণ ও পরিচারিকা যেথানে ছিল, সেথানে আসিয়া পাগলিনী তাহাদের দেখিতে পাইল না। চলিতে চলিতে আরো কিঞ্চিৎ দূরে আসিলে হঠাৎ চীৎকার-ধ্বনি তাহার

কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি সে এক জন প্রহরীকে সেই দিকে ছুটিতে দেখিল। প্রহরীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কিরণও বন্ধনমুক্ত অশ্বের ন্যায় একাকী মনের সুখে দ্বারদেশ হইতে এদিক ওদিক করিয়া খেলিতে লাগিল। কিরণকে একাকী দেখিতে পাইয়া পাগলিনী আশার অতীত ফল পাইল। সে সহর্ষে দ্রুতবেগে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার শূন্য দেখিয়া সহসা তাহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। সে আজ তাহার বহু দিনের আশা পূর্ণ করিবার সুযোগ দেখিল। কিরণকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিতে করিতে পাগলিনী বলিল "আহা! এই বাছাকে আমায় দেয় না! বাবা! তুমি আমার ছেলে, আমার মাণিক, আমার ধন, আমার সর্ব্বস্ব। আমার মত তোমাকে যে কেহই ভাল বাসে না। এস, তোমাকে নিয়ে একটা ফুলের বাগান দেখিয়ে আনি, বড় সুন্দর বাগান।" কিরণ বলিল "আমার জন্য ফুল আন্‌তে গেছে সেই ফুলটা নিয়ে যাব।"

পাগলিনী। "সে বাগানে এ ফুলের চেয়ে কত ভাল ফুল আছে, কত পাখী আছে, আমি তোমাকে সব দেখাব, সেখানে কত ভাল ফুল পাবে।" কিরণ সহর্ষে বলিল "তবে যাব,—কোথায়?' পাগলিনী তাহাকে লইয়া দ্বার পার হইয়া চলিতে চলিতে বলিল "কিন্তু তুমি যেন কেঁদ না। তোমার কান্না শুন্‌তে পেলে উহারা আমার কোল হ'তে

তোমাকে কেঁড়ে নেবে। আমার সঙ্গে ফুলের বাগান দেখ্‌তে যেতে দেবে না।" পাগলিনীর ক্রোড়ে কুমারকে কেহ দিত না, তাহা কিরণ জানিত, সেই জন্য সে মস্তক নাড়িয়া বলিল "না"। পাগলিনী বলিল "তবে তোমাকে নিয়ে দৌড়ে সেই বাগান দেখ্‌তে যাই।" পাগলিনী দ্রুত-বেগে অলক্ষ্যভাবে কিরণকে লইয়া পলায়ন করিল। সে রাজপথ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পথ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে নদীতীরাভিমুখে গমন করিল। নদীতীরে আসিয়া দেখিল, অনেক নৌকা চলিতেছে। সে উহার মধ্যে একখান নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল "আমি তোমাদের নৌকায় যাব, নৌকা তীরে লাগাও।" এই সময় কুমার বলিল "কই ফুলের বাগান কই?"

পাগলিনী বলিল "এই যে নৌকা ক'রে আমরা ফুলের বাগান দেখ্‌তে যাব।" বালক আর কিছু বলিল না।

মাঝি বলিল "আমরা অনেক দূরে যাব।"

পাগলিনী। "তোমরা যেখানে যাবে সেখানে যেতে আমার আপত্তি নাই। শীঘ্র এস, দেরি হ'লে আমার রাণীদের লোকেরা এসে আমার বাছাকে নিয়ে যাবে"। মাঝি নৌকা তীরে লাগাইল। পাগলিনী নৌকায় উঠিলে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকায় উঠিয়া পাগলিনী কটিদেশ হইতে একটী বস্ত্রের থলি বাহির করিয়া, তাহার ভিক্ষা-সঞ্চিত ধনের মধ্য হইতে কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা বাহির করিয়া নাবিকের হস্তে

দিয়া বলিল "পঁহুছিনে আরো দিব"। কিছু দূর গিয়া কুমার আবার বলিল "ফুলের বাগান?" পাগলিনী আবার তাহাকে তরঙ্গ দেখাইয়া, তীরস্থ উদ্যান দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে সন্ধ্যাতারা দেখা দিল। সন্ধ্যা-সমীরণে অল্প অল্প তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকার গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তরঙ্গ ভেদ করিয়া ঝপ ঝপ শব্দে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে দাঁড়ি মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে গীত আরম্ভ করিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িল! কুমারও 'ফুলের বাগান, ফুলের বাগান' করিয়া বিরক্ত করিতে করিতে পাগলিনীর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। এখনো চন্দ্রমার দেখা নাই। জ্যোৎস্না-ধৌত হইয়া এখনো তরঙ্গমালা হাসিতেছে না। সহসা এ আবার কি! হায়! চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ বুঝি আর আজ এ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতে আসিবে না। পূর্ব্ব গগনে চাহিয়া দেখ! চন্দ্রের স্থান সহসা একখণ্ড মেঘ আসিয়া অধিকার করিল। ক্রমে একটু একটু করিয়া চতুর্দ্দিক মেঘে ব্যাপ্ত হইল। বাতাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহার সহিত জলের ঢেউও বাড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই বাতাসের গতি অস্থির হইল, কোন বার দক্ষিণ হইতে, কখন পশ্চিম হইতে, কখন আবার অপর কোন দিক হইতে, বেগে দমকা আসিতে

লাগিল। তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে মেঘের গর্জ্জন, বজ্রের কড়মড় শব্দ আরম্ভ হইল। মাঝিদের আর কিছু দেখিবার কিম্বা শুনিবার উপায় রহিল না। বায়ুবেগে উচ্চ উচ্চ তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে নৌকামধ্যে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। মাঝিরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নৌকা তীরে লাগাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যুতালোকে ও আন্দাজে আন্দাজে তাহারা নৌকা তীরের দিকে লইয়া চলিল। একটু অগ্রসর না হইতে হইতেই অমনি একটা ঢেউ আসিয়া তাহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দিল। ঝড়ের শব্দে কুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে মাতার ক্রোড়ে আপনাকে না দেখিয়া ও ক্ষুধায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। পাগলিনী সাধ্যমত ভুলাইতে চেষ্টা করিল। ক্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল৷

এ দিকে মাঝিরা এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আবার নৌকা তীরে লাগাইবার চেষ্টা করিল, আবার একটা ঢেউ আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। বারম্বার এইরূপ বাধা পাইয়া শেষে তাহারা নিরাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার ঢেউ আসিল। আবার আর একটা ঢেউ আসিল। উপর্য্যুপরি দুই তিনটা ঢেউ আসিয়া নৌকা সজোরে উল্‌টাইয়া ফেলিল। নৌকারোহী লোকগণ জল-নিমগ্ন হইল। পাগলিনী জলে পড়িবার সময় কুমার ক্রোড়চ্যুত হইয়া দূরে পড়িয়া

গেল। মাঝি মাল্লা প্রভৃতি সন্তরণ-পারগ লোকেরা সন্তরণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে কেহ কাহাকে সাহায্য করিতে পারিল না।

এ দিকে রাজবাটীর লোকেরা পাগলিনীর অনুসন্ধানে গমনের অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা আরম্ভ হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আসিল। রাশি রাশি ধূলিকণা উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখে চক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই ধূলিতে ও ভীষণ অন্ধকারে নিকটের বস্তু দেখিতে পাওয়াও তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। ক্রমে ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। মড় মড় শব্দে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা চিতোরের বহির্গত স্থানাদি অন্বেষণে গিয়াছিল তাহারা কষ্টে আবার সহরে পদার্পণ করিল। তখন পুরাতন অট্টালিকার জীর্ণ দরজা জানালা পড়িবার দুম দাম শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। কোন অট্টালিকার জীর্ণ অংশ হয়তো কাহারো গাত্রে পড়িতে পড়িতে সে বাঁচিয়া গেল। ভূমিশায়ী বৃক্ষের উপর পড়িয়া কাহারো পদে গুরুতর আঘাত লাগিল, কেহ অন্ধকারে পথ হারাইয়া চলিল, এই রূপে এখন আর কুমারকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা বহু কষ্টে রাজবাটী ফিরিয়া আসিল। আসিতে আসিতে পরস্পর সকলেরই আশা হইতে লাগিল, যে অন্য পথ দিয়া কুমারকে এতক্ষণ আর কেহ বাটী লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আর সকলে ফিরিয়া আসিলেও এই ঝড় বৃষ্টি অন্ধ-

কারে দুর্যোগে হতভাগ্য সমরসিংহ প্রাণের মুকুলকে হারাইয়া ঝটিকা-ত্রস্ত তরণীর ন্যায়, বাতক্ষুভিত সাগরের ন্যায়, উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বায়ুর শব্দে তিনি মনে করিতেছিলেন তাঁহার শিশুরই ক্রন্দন। অন্ধকারে দূর হইতে ছোট ছোট গাছ পালা দেখিয়া তাঁহার পুত্র বলিয়া ভ্রম হইতে ছিল। এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া আরো উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। হা বিধাতঃ! আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। অদৃষ্ট! তুমি পরাক্রান্ত রাজার ক্ষমতাকে পরিহাস করিয়া আজ তোমার কঠোর লিখন সার্থক করিলে। তুমি সমর-সিংহের ক্রোড় হইতে তাঁহার সন্তানকে কাড়িয়া লইলে এবং আজ হতভাগ্য রাজা বর্ত্তমানের আনন্দ ও ভবিষ্যতের আশা হারাইলেন।

ছুটিতে ছুটিতে তিনি কতবার নদীতীরে গমন করিলেন। দেখিলেন সেই প্রশান্ত মৃদুনাদী নদী এখন লোক-সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধে ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে! তাহার বক্ষোপরি একখানাও নৌকা নাই। তীরে শূন্য নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া দেশীয় নাবিকগণ এই দুর্য্যোগে আপন আপন গৃহে গিয়াছে। কেবল তীরস্থ মহাজনি নৌকায় লোক রহিয়াছে। সকলেই দুর্যোগ দেখিয়া সাবধান হইয়াছে। যাহারা সাবধান হয় নাই তাহারা এতক্ষণ তাহার ফলভোগ করিয়াছিল। তিনি একখানি মহাজনি নৌকার নিকট আসিয়া তাহার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই নদী

তীর দিয়া একটী স্ত্রীলোককে একটী সুন্দর শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছ ?” মাঝি তাঁহার উন্মত্ত বেশ দেখিয়া বলিল “এটা পাগল না কি ? আমরা নদীর মাঝে থাকি, দূর হইতে কত স্ত্রীলোককে শিশু ক্রোড়ে চলিতে দেখি, সে শিশু সুন্দর, কি তার কত বয়স, স্ত্রীলোকটী কেমন তাতো আর আমরা দূর হইতে এত দেখিতে পাই না।” সমরসিংহ তাহাকে আরো দুই এক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ উত্তর পাইয়া সে নৌকা হইতে আর এক নৌকার নিকট গিয়া তাহার মাঝিকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল “আমরা আপন আপন নৌকা নিয়েই ব্যস্ত থাকি, কখন্ তীর দিয়া কে কাকে কোলে ক’রে যায় তাহা দেখ্‌বার এত আমাদের সময় থাকে না।” তিনি সেখান হইতে আর একখান নৌকার মাঝির নিকট আসিলেন। সে মাঝি বলিল “মশাই ! আমরা বিদেশী লোক, অন্নের চিন্তায় দেশ হ’তে এখানে এসেছি, আমাদের ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কিছুই বলিতে পারিব না।” সমরসিংহ এই প্রকারে সেই বিদেশীয় নাবিকগণের নিকট কিছুই সন্ধান পাইলেন না। তিনি তীরে স্বদেশীয় এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না যে তাহার নিকট কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ‘পাগলিনী কুমারকে তীর দিয়া লইয়া গিয়াছে কি না ?

কিন্তু হায়! তিনি জানেন না যে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই নদী দিয়াই তাঁহার কিরণ চলিয়া গিয়াছে।

পাগলিনী যে কুমারকে লইয়া চিতোর ত্যাগ করিবে সমরসিংহ এরূপ মনে করেন নাই।

কোন মতে কুমারকে প্রাপ্ত না হইয়া রাজাও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। মায়াবিনী আশা তাঁহাকে বলিল "মিছামিছি এখানে এতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? তোমার হৃদয়ধনকে এতক্ষণ অন্য দিক দিয়া অন্য লোকেরা বাটীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে। কুমার এখন মাতৃক্রোড়ে শুইয়া কত কথা বলিতেছে। রাজবাটীতে চারি দিকে আহ্লাদ-সূচক হাস্য পড়িয়া গিয়াছে, আর তুমি এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। যাও যাও শীঘ্র যাও, রাজবাটী গিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইবে।" আশার কথায় রাজা অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজবাটী ছুটিলেন। প্রশান্ত সাগর যেমন বাত্যাহত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠে, আজ সেই গম্ভীর রাজমূর্ত্তিকে সেই রূপ শোকোন্মত্ত দেখিয়া কাহার পাষাণ হৃদয় না ব্যথিত হইবে? তিনি পথে আসিতে আসিতে 'কুমার কুমার' রবে পথঘাট ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কুমার তাঁহাকে উত্তর দিল না। বাটী আসিয়াও কুমারের দেখা পাইলেন না। দেখিলেন তাহার মাতৃক্রোড় শূন্য। তাহার মাতা কম্পিত হৃদয়ে, সজলনয়নে তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি কুমারকে লইয়া ফিরিয়া আসিবেন, এই

আশায় রাজ্ঞীগণ প্রতিশব্দে তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, গৃহে আসিলেন, আশাও তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

নিরাশ রাজা শূন্যক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলে বাটীর মধ্যে আরো হাহাকার পড়িয়া গেল। সে রাত্রে কেহ নিদ্রা গেল না। আবার কে কোন্ দিকে কুমারের অন্বেষণে গমন করিবে, এই বন্দোবস্ত করিতেই রাত্রি প্রভাত হইল। কেহ বলিল "পাগলিনী পর্ব্বতগুহায় আছে, তথায় লোক প্রেরণ কর।" কেহ বলিল "তাহা কেন হইবে, পাগলিনী পর্ব্বতে উঠিতে ভয় করিত, পর্ব্বতে সে কখনও যায় নাই, আর কোথায় আছে।" এই প্রকার নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পাগলিনী যে চিতোর হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত নৌকাপথে যাইতে পারে, এরূপ কথা কাহারো মুখ হইতে একবার নির্গত হইল না। প্রত্যুষে আবার কুমারের উদ্দেশে লোক রহনা হইল। কিছু পরেই কয়েকটী লোক পাগলিনীর মৃত-দেহ লইয়া রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিল। সমরসিংহের মস্তকে বজ্রপাত হইল। তিনি ভাবিলেন পাগলিনীর সহিত কুমারেরও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন "এ মৃত-দেহ কোথা পাইলে?" যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা বলিল "আমি অন্বেষণ করিতে করিতে নদীতীরে ইহাকে দেখিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছি।"

রাজা। "সেখানে কুমারকে দেখিলে না?"

তাহারা বলিল "না।"

রাজা। "তবে কুমারের কি হইল? পাগলিনী মরিল কি প্রকারে?" তাহারা বলিল "বোধ হয়, নৌকায় উঠিয়া থাকিবে, কা'ল ঝড়ের সময় নৌকা শুদ্ধ ডুবি হইয়াছে।" সমরসিংহ তাহাই সম্ভব জ্ঞানে রাত্রিকার ঝড়ের সমস্ত সংবাদ আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোকেরা তদন্ত করিয়া আসিয়া বলিল "আমরা অনেক দূরে চড়ার উপর একখানি ভাঙ্গা নৌকা দেখিয়া আসিলাম। কা'ল রাত্রিকার ঝড়ে সেইখান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর অন্য অন্য মাঝিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও বলিল 'একটী স্ত্রীলোককে তিন চারি বৎসরের একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া তাহারা ঐ নৌকায় উঠিতে দেখিয়াছিল।' তাহারা যে প্রকার বলিল, তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটী পাগলিনী ও বালকটী যে কুমার তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পাগলিনী ডুবিয়া ক্রমে স্রোতে এই দিকে ভাসিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কুমারের যে কি হইল কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

সমরসিংহ তাহাদের কথা শুনিয়া কুমারের কি দশা হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তাহাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা আর তাঁহার কিছুমাত্র রহিল না। তিনি যদিও পূর্ব্ব হইতেই নিরাশ হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার যে একবিন্দুও আশা ছিল না এমন আমরা বলিতে পারি না। এই আশাই

মানবের প্রধান জীবনোপায়, আশাতেই সংসার চলিতেছে। যখন আমরা বলি 'আর আশা নাই', অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তখনও হৃদয়ের একস্থানে কণামাত্র আশাও লুক্কায়িত রহিয়াছে। অল্পে আমরা আশাকে ছাড়িতে চাহি না। নিতান্ত বাধ্য হইলে তখন শেষ অবস্থায় আমরা আশাকে ত্যাগ করি।

সমরসিংহের তখনো এক একবার মনে হইতেছিল কুমারকে হয়তো এখনো পাইতে পারেন। কিন্তু এইবার সম্পূর্ণরূপে আশা ত্যাগ হইল।

* * * * * *

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সমরসিংহ চিতোরাধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতেছিলেন? তিনি নয়ন মুদিয়া যোড় করে নিবিষ্ট চিত্তে দেবীর উপাসনায় রত ছিলেন। কষ্টের উপর নৈরাশ্য মিশিয়া তাঁহার বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় ভাব লক্ষিত হইতেছে। তিনি হৃদয়কে অনেক সংযত করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন তাঁহার শিরোদেশ মুকুটে শোভিত হইতেছে না, নিকটে একটী আসনে মুকুট পড়িয়া রহিয়াছে, অঙ্গে রাজকীয় পরিচ্ছদ নাই, আজ সমরসিংহ সামান্য বেশে দেবীর আরাধনা করিতে আসিয়াছেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভক্তি ভাবে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। উঠিয়া আসনস্থ মুকুট হস্তে লইয়া দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবি চতুর্ভুজে! এই আজ আমি তোমার পদ-

তলে মুকুট পরিত্যাগ করিতেছি, আজ হইতে আর মুকুট পরিব না, রাজকীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হইব না; আজ হইতে এই মস্তকে জটাভার বহন করিব, আজ হইতে রাজা নামে আর আমাকে সম্বোধন করিতে দিব না। ভগবতি! আমার মনের যাহা কিছু বৃথা অহঙ্কার আছে আজ তোমার সম্মুখে তাহা বিসর্জ্জন দিলাম। কিন্তু এই অহঙ্কারের জন্য আমাকে যে শাস্তি দিয়াছ, যে বহুযত্নসঞ্চিত আশা উন্মূলিত করিয়াছ, তাহা এখনও ভুলিতে পারিতেছি না। হউক, দেবি! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তোমার আজ্ঞা পালন করিতেই হৃদয় সমর্থ হউক।" এই বলিয়া মহারাজ দেবীর চরণে মুকুট নিক্ষেপ করিয়া আবার প্রণাম করিয়া মন্দির ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন হইতে তাঁহার যোগীন্দ্র নাম হইল; এবং এই যোগীন্দ্র নামেই ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত আছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যমুনার একটী শাখানদী আলোয়ার নগরীর প্রান্ত ভাগ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রথমোক্ত ঘটনার সাত বৎসর পরে ১১০৩ শকে সেই নদী দিয়া এক খানি নৌকা চলিতে-ছিল। তখন নিশা প্রভাত প্রায়। পূর্ব্বদিকে তরুণ উষার

ছটা দেখা দিতেছে। পক্ষীগণ মনের উল্লাসে গান গাহিতেছে। অল্প অল্প প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে আসিয়া ধীরে ধীরে তরুলতাকে আলিঙ্গন করিতেছে ও তাহার কোমল চুম্বনে মুদিত কুসুমনিচয় চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিতেছে।

নিশা অবসান দেখিয়া নৌকামধ্য হইতে এক জন বলিল "মাঝি, নৌকা তীরে লাগাও, আমি এই খানেই নামিব"। নৌকা তরঙ্গ-দোলিত হইয়া ধীরে ধীরে তীরে আসিয়া লাগিল। অমনি এক জন প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ একটী বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া নৌকা হইতে নামিলেন। পুরুষটীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইবে। ইহাঁর মধ্যেই কেশ শ্মশ্রু অধিকাংশ পক্ক হইয়াছে, মুখে কালিমা পড়িয়াছে। হাসির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। ইহাঁর হৃদয়ে ঘোর অন্ধকার, মুখে তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। যৌবনের সুখ ইহার মধ্যেই ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার পরিধান গেরুয়া বস্ত্র। কিন্তু পরিধানে অনভ্যাস লক্ষিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যে তাহা তাঁহার নূতন ব্যবহৃত। বালিকাটি চারপাঁচ বৎসরের হইবে। তাহার অল্প অল্প লম্বিত মুক্ত কেশদাম কপোলদ্বয় ঢাকিয়া বক্ষদেশে পড়িয়াছে। কেশের মধ্য হইতে সুকুমার চঞ্চল চক্ষু বুদ্ধি-জ্যোতিতে জ্বলিতেছে ও শৈশবের কোমল মধুর হাস্য অধরে লাগিয়া রহিয়াছে। রূপের সহিত বুদ্ধির সৌন্দর্য্যে তাহার মুখ-মণ্ডলের গরিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বালিকার পরিধান পরিচ্ছদ পিতার ন্যায় হীন নহে। তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে ধনাঢ্যের কন্যা মনে হয়। পুরুষটি নামিয়া হস্তস্থিত একটী বাক্স হইতে ত্রস্তে কয়েকটী মুদ্রা বাহির করিয়া নাবিকের হস্তে দিলেন। মুদ্রার সহিত এক খণ্ড কাগজ তাঁহার হস্তে উঠিয়া আসিল। তিনি বাক্সের মধ্য হইতে এক একটী করিয়া আরো দুই তিন খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া পূর্ব্ব কাগজের সহিত একত্র করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। কাগজ গুলিন ভাসিয়া চলিল তিনি কন্যাকে লইয়া নদীর তীরে বসিলেন। বালিকা ক্ষণ পরে বলিল "পিতা! বাড়ি যাবে না?" তাহার পিতা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "শৈল! তোমার পিতার বাড়ি নাই"। বালিকা বলিল "তবে আমরা কোথায় থাকিব?"

পিতা। "বনে।"

বালিকা। "তবে চল আমরা বনে যাই। বাবা! বন কেমন"? বালিকাকে এই দুঃখের অবস্থাতেও সুখী দেখিয়া তাঁহার সেই শুষ্ক অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি তাহার কথার উত্তর না দিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আবার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ক্ষণ পরে বালিকা আবার অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিল "দেখ দেখ! বাবা, ঐ জলে কে দাঁড়িয়ে আমাদের চেয়ে দেখ্‌ছে।" তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন এক জন সন্ন্যাসী প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিতে চাহিতে জল

হইতে উঠিতেছেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের দুজনের কথা সকল শুনিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে তাঁহাদের নিকটই আগমন করিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বালিকার পিতা ত্রস্তে উঠিয়া প্রণিপাত করিলেন। সন্ন্যাসী আশিষ করিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আইস।" বালিকার পিতা হঠাৎ এই কথায় আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "এখন কারণ জিজ্ঞাসা করিও না, পরে বলিব।" এই কথায় অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বালিকার পিতা কন্যাকে ও তাঁহার পথের সম্বল সেই বাক্সটি লইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

সেখান হইতে চারপাঁচ ক্রোশ দূরে আলোয়ার সীমানার বহির্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাহার একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সন্ন্যাসীর কুটীর। এই কুটীরে সন্ন্যাসী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। পাহাড়ী অসভ্য মনুষ্য ব্যতীত এই পাহাড়ে সচরাচর আর কোন মনুষ্যকে দেখা যাইত না। কেবল কখন কখন কেহ আজমীর হইতে দিল্লী গমনকালে এই পাহাড় দিয়া যাইত, কারণ আজমীর হইতে দিল্লী গমনের অন্য অন্য সুগম পথ থাকিলেও এই পাহাড়-পথ দিয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্র যাওয়া যাইত বলিয়া, কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে লোকে কষ্ট করিয়াও এই পথ দিয়া কখন কখন দিল্লী গমন করিত। এই পাহাড়ে আমাদের আরও আসিতে হইবে বলিয়া উপরে এটুকু বলিয়া রাখিলাম।

সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া একটি প্রায় দশমবর্ষীয় বালক হাসিতে হাসিতে "পিতা পিতা" করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "পিতা, আপনি তো এই কুটীর ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। আজ কত রাত্রি থাকিতে নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন তবুও এত বিলম্ব করিয়া আসিলেন। আর আমি আপনাকে একেলা যাইতে দিব না—উহারা কে আসিতেছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "আচ্ছা আমি আর কোথাও একেলা যাইব না, এইবার অবধি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। ইহাঁরা আমার অতিথি, উহাঁরা এইখানে থাকিবেন।" অতিথি শুনিয়া বালকের অতিশয় আহ্লাদ হইল। সে শীঘ্র অতিথিসেবার উদ্যোগে গমন করিল। কুটীরে আসিয়া বালিকার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য লইয়া আসিলেন, এখন বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "বলিতেছি! অগ্রে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ?"

পিতা। "ক্ষমা করুন! তাহা আমার বলিবার ইচ্ছা নাই।"

সন্ন্যাসী। "তাহা বুঝিয়াই কেবল পরীক্ষার জন্য এ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে তুমি ছদ্মবেশে থাকিতেই দেশ ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ?"

পিতা। "আপনি কিরূপে জানিলেন!"

সন্ন্যাসী। "তোমার কন্যার সহিত যে কথা হইতেছিল

তাহা শুনিয়া আমার এই প্রকার অনুমান হইয়াছে। হায়! আমারও একদিন ঐ দশা ঘটিয়াছিল! পথে পথে ছদ্মবেশে বেড়াইতাম, কিন্তু তখনও স্বদেশ ত্যাগ করি নাই। সে সব যাক্—তোমাকে কিজন্য এখানে আনিলাম বলি। তুমি ছদ্মবেশে থাকিতে ইচ্ছা কর?"

পিতা। 'হাঁ।"

সন্ন্যাসী। "এই কুটীর অতি নির্জ্জন, এইখানে নিঃশঙ্ক-চিত্তে তুমি বাস করিতে পারিবে, সেই জন্য তোমাকে এই খানে লইয়া আসিলাম।" বালিকার পিতা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি, আমাকে আশ্রয়হীন দেখিয়া আপনার দয়া হইয়াছে, সেই জন্য আপনার কুটীরে আমাদের আশ্রয় দিতেছেন, কিন্তু এখানে থাকিতে আমি সম্মত নহি, তাহা হইলে আপনাদিগের অসুবিধা হইবে।"

সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে বালিকার পিতা কাহারো অনুগ্রহ লইতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলিলেন "আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই। আমার অসুবিধা হইবে না। তোমার যথার্থ মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি। তুমি কাহারও নিকট অনুগৃহীত হইতে চাহ না, কিন্তু অন্যের সহিত আমার তুলনা করিও না। আমি সন্ন্যাসী, তোমার পিতৃতুল্য। আমি তোমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি করিতেছ না। আমার বাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে আমার মনে কষ্ট হইবে।" বালিকার পিতা সন্ন্যাসী যোগীদের অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

কুটীরে না থাকিলে যদি সন্ন্যাসী ক্ষুব্ধ হন এই ভয়ে তিনি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ না হইয়া সেইখানে থাকিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের আহারাদি সমাপ্ত হইলে বালক, বালিকাকে লইয়া, তাহার খেলিবার দ্রব্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিল। দুজনে কত কথা হইতে লাগিল। বালিকা বলিল "তোমাদের বাড়ির নীচে নদী নাই কেন? আমাদের বাড়িতো এমন ছিল না!"

বালক। "তবে তোমাদের বাড়ি কেমন ছিল ভাই!"

বালিকা। "আমাদের কেমন নদীর উপর বাড়ি ছিল। আমাদের বাড়ির উপর নদীর জল কেমন উথলাউথলি করিত, আমরা কেমন দেখ্‌তেম। বাবা সে বাড়িকে নৌকা বলেন, সে বাড়ি কেমন সকল জায়গায় বেড়িয়া বেড়ায়।"

বালক। "তুমি কখন আমাদের মত বাড়িতে থাক নাই?"

বালিকা। "না।"

বালক। "কিন্তু এমন বাড়ি দেখেছ?"

বালিকা। "দেখেছি বইকি? এর চেয়েও বড় বড় বাড়ি দেখেছি, আমাদের বাড়ি ব'সে ব'সে নদীর পাড়ে এই রকম অনেক বাড়ি দেখতে পেতেম।"

বালক। "তোমার সে বাড়ি দেখ্‌তে যেতে ইচ্ছা হতো না?"

বালিকা। "তা ইচ্ছা হতো, আমি বাবাকে বলতেম—বাবা আমি ঐসব দেখ্‌তে যাব।"

বালক। "সেখানে থাক্‌তে ইচ্ছে করত ?"

বালিকা। "তা কেন কর্‌বে।"

বালক। "তবে তুমি সে বাড়ি ছেড়ে এলে কেন ?"

বালিকা। "বাবা এলেন তাই আমিও এলেম।" বালক ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "তবে তোমার আমাদের কুটীরে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না ?"

বালিকা। "বাবা যেখানে থাকেন আমারও সেইখানে থাক্‌তে ভাল লাগে।"

বালক। "তোমার বাবা যদি যান, তুমিও যাবে।"

বালিকা। "হাঁ।"

বালক। "আচ্ছা, এস এখন আমি তোমাকে আমার হরিণ দেখাইগে।"

এই বলিয়া দিলীপ শৈলবালার হস্ত ধরিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। কুটীর হইতে বাহির হইয়া বালিকা অদূরে দুইটী ময়ূর দেখিয়া বলিয়া উঠিল "দেখ দেখ! কেমন সুন্দর পাখী! আমি যাই—একটা ধরিগে।" বালিকা ময়ূর ধরিতে ছুটিল, ময়ূরও অমনি ছুটিল। দিলীপ বলিলেন "আমি ময়ূর দিতেছি, তুমি ছুটিও না।" কিন্তু বালিকা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। দিলীপও তাহার অনুগমন করিলেন। কিছু দূরে গিয়া পর্ব্বত-পথে চলা অনভ্যাস বশতঃ

শৈলখণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শৈলবালার পড়িবার উপক্রম হইল। দিলীপ অমনি তাড়াতাড়ি সেই অর্দ্ধপতিত অবস্থায় শৈলবালাকে ধরিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাও আঘাত লাগিয়াছে?" বালিকা "না" বলিতে বলিতে শিলাখণ্ডে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। দিলীপ হাসিয়া বলিলেন "তুমি ময়ূর নেবে?" তিনি নাম ধরিয়া ময়ূর ডাকিতে লাগিলেন, ময়ূর আসিল। শৈলবালা আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়া বলিল "তোমার কাছে ত এল! আমার কাছ হ'তে তবে পালাল কেন, আমি নেব না।" দিলীপ দুঃখিত হইয়া বলিলেন "তুমি নূতন, তোমাকে চেনে না, তাই পালিয়েছিল, এবার নেও, আর পালাবে না।" দিলীপের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বালিকা বলিল "আচ্ছা আমি নেব।" দিলীপ ময়ূর ধরিয়া রাখিলেন, বালিকা তাহাকে লইতে গেল। কিন্তু তাহার গাত্রে হস্ত দিবামাত্র সে পলায়ন চেষ্টায় এমনি পাখ্না ঝাড়িয়া উঠিল যে বালিকা ভয়ে হস্ত টানিয়া বলিল "আমি আর নেব না।" দিলীপ অপ্রতিভ হইলেন। তিনি ময়ূরের গাত্রে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তুই গেলিনে কেন? তবে আমিও আর তোকে নেব না।" তিনি সেখান হইতে ময়ূর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে উঠিয়া অন্যস্থানে গিয়া বসিল। দিলীপ বলিলেন "তবে আমার আর কি কি আছে দেখিবে এস।" তাঁহার হরিণ অশ্ব প্রভৃতি যেখানে থাকিত, দিলীপ শৈলবালাকে

সঙ্গে করিয়া সেই খানে লইয়া আসিলেন। অশ্ব দেখিয়া শৈলবালা বলিল "অত বড় ঘোঁড়ার সঙ্গে তুমি কেমন ক'রে খেলা কর।"

দিলীপ। "আমি উহার উপর চড়ি।" শৈলবালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "চড়! আচ্ছা চড় দেখি।" দিলীপ অশ্বারোহণ করিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। শৈলবালা উল্লাসে করতালি দিয়া উঠিল। সে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সেখান হইতে দৌড়িয়া কুটীরে তাহার পিতার নিকট আগমন করিল। পিতাকে বলিল "দেখ দেখ! দিলীপ কেমন ঘোঁড়ায় চড়েছে! তুমি কেন চড় না। আমি চড়ব বাবা! সে আবার কুটীর হইতে দিলীপের নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন দিলীপ লাগাম ঢিল দিয়া আস্তে আস্তে শৈলবালার নিকটে আসিলেন। বলিলেন "তুমি চড়িবে? এ ঘোঁড়া তোমাকে কিছু বলিবে না।" বালিকা ব্যগ্র হইয়া বলিল "হাঁ আমি চড়িব, আমাকে চড়িয়ে দেওনা!" দিলীপ নামিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন। বলিলেন "আমি তোমাকে ধরে থাকি, আর ঘোঁড়া আস্তে আস্তে চলুক; নহিলে তুমি পড়ে যাবে।" দিলীপ এক হস্তে শৈলবালাকে ধরিয়া অপর হস্তে অশ্বের লাগাম ধরিয়া কুটীরের দ্বারে লইয়া আসিলেন। দ্বারে আসিলে বালিকা বলিয়া উঠিল "দেখ দেখ বাবা! আমি কেমন দিলীপের মত ঘোঁড়ায় চড়েছি।" সন্ন্যাসী ও বালিকার পিতা হাসিতে লাগিলেন।

বালিকার পিতা তিন চারি বৎসর এই কুটীরে রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে নিবিড় মেঘে গগন আচ্ছন্ন। অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে নিঃশব্দে বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। এখনি অত্যন্ত বৃষ্টি হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু দীপালোকের সহায়তায় এ সময়েও কুটীরে অন্ধকার নাই। বালক বালিকা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সন্ন্যাসী ও বালিকার পিতা দুয়ারে দিয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া গল্প করিতেছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন "দেখিতেছ মেঘে কি অন্ধকার হইয়াছে, এখনি অত্যন্ত বৃষ্টি হইবে।" বালিকার পিতা বলিলেন "হাঁ বৃষ্টি হইলেই ও মেঘ এখনি চলিয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের দুঃখ-আঁধার কিছুতেই ঘুচিবার নয়?"

সন্ন্যাসী। "ওরূপ ভাবিও না। দুঃখও এই মেঘের

ন্যায় চঞ্চল। তুমি কি ভাবিয়াছ তোমার দুঃখ অনন্ত? তাহা ভাবিও না। এ লোকে সুখী না হও পরলোকে হইবে, কখন একেবারে নিরাশ হইও না।"

তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে টপ্‌টপ্‌ শব্দে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঘন ঘন কড় মড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া পৃথিবী কাঁপাইতে লাগিল। বিদ্যুৎ চমকিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবী, মেঘাবৃত আকাশ, ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কুটীরে বৃষ্টিধারা প্রবেশ করাতে সন্ন্যাসী দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। কিছু পরে সহসা দুম দুম শব্দে কুটীরের দ্বারে আঘাত পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী কুটীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" উত্তর হইল "আমি পথিক, বৃষ্টির জন্য আর অধিক চলিতে সক্ষম নহি, রাত্রের জন্য এখানে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া একটী বৃদ্ধ পুরুষকে কুটীরে লইয়া আসিলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে আর্দ্র, হস্তপদাদি পাংশুবর্ণ ও শীতল, শীতে নীলবর্ণ ওষ্ঠাধর এখনো কাঁপিতেছে। বার্দ্ধক্য বশতঃ অল্পেতেই অতি শীত লাগিয়াছে। সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে তাহার আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িতে শুষ্ক বস্ত্র দিলেন। বৃদ্ধ তাহা পরিয়া অগ্নির নিকট বসিয়া হস্ত পদ সেঁকিতে লাগিল।

বালিকার পিতা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা নাসিকা ও চক্ষু ব্যতীত আর সমস্ত মুখ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া কুটীরের এক পার্শ্বে গিয়া বসিয়া রহিলেন। হস্ত পদ সেঁকিতে সেঁকিতে আগন্তুক সন্ন্যাসীর সহিত গল্প আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন "এ অসময়ে তুমি কোথা যাইতেছিলে ?"

আগন্তুক। "আমি দিল্লী যাইতেছিলাম। আমার প্রভু চন্দ্রপতি সেখানে আছেন, সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

সন্ন্যাসী। "অন্য সুগম পথ থাকিতে এ পথে যাইতেছ কেন ?"

আগন্তুক। "শীঘ্র যাইবার জন্য এ পথে যাইতেছিলাম।

সন্ন্যাসী। "শীঘ্র যাইবার এত আবশ্যক কি ?"

আগন্তুক। "দুঃখের কথা বলিব কি, প্রভুর বিবাহ উপস্থিত !" সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "বিবাহ হইবে, ইহাতো সুখের বিষয়, দুঃখ কেন ?

আগন্তুক। "তাহা আপনারা কি প্রকারে বুঝিবেন ? কোথা হ'তে এতটুকু একটা কন্যা বিবাহ করে আনবেন, দুদিন পরে আবার সে আমাদের উপর প্রভুত্ব খাটাবে। এতদিনকার ভৃত্য জ্ঞানে একটুও সঙ্কুচিত হবে না। একি আমাদের সুখের বিষয় !" আগন্তুকের দুঃখের কারণ শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিলেন। আগন্তুক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল

"তা আপনারা হাসিবেন না তো কি? আমাদের মান যাবে, আপনাদের কি; আমাদের দুঃখ আপনারা কি বুঝবেন?" সন্ন্যাসী হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন "তোমার প্রভুর আজমীরে বাড়ি, তবে দিল্লীতে বিবাহ হইতেছে কেন?"

আগন্তুক। দিল্লীশ্বরের ইচ্ছা। আমার প্রভু তাঁহার পরম বন্ধু, সেই জন্য দিল্লীশ্বর আপনি কন্যা মনোনীত করে মহা ধুমধামে আপনার নিকট বিবাহ দিতেছেন। মেয়েটী শুনেছি বার বৎসরের আর খুব সুন্দরী, প্রভু শুনছি দেখেই ভুলে গেছেন। এবার আর আমাদের রক্ষা নাই। এইবার আমাদের মান সম্ভ্রম গেল।"

সন্ন্যাসী। "কি প্রকার ধুমধাম হবে?"

আগন্তুক। "অনেক রাজাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, তাঁহারা সবাই এসেছেন। কেবল জয়চন্দ্র আসেন নাই। সমরসিংহ সপরিবারে এসেছেন। কিন্তু কমলদেবী না আসাতে রাজমহিষী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। কমলদেবীর সহিত মহিষীর অতিশয় সৌহৃদ্য আছে।"

সন্ন্যাসী। "তিনি আসেন নাই কেন?"

আগন্তুক। "হায়! তাঁহার পুত্র কিরণসিংহ জলনিমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন আমোদ প্রমোদে কোথাও যান না, সেই অবধি তিনি জীবন্মৃতবৎ হইয়া আছেন।"

সন্ন্যাসী। "কি, সমরসিংহের পুত্র জলনিমগ্ন হইয়াছেন? রাজকুমার কি প্রকারে জলনিমগ্ন হইলেন?"

আগন্তুক কিরণের জলনিমগ্ন হইবার বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী নীরবে শুনিতে লাগিলেন। শেষ হইলে সে বলিল "সে কথায় আর কায নাই, সে সব মনে করিলে বড় কষ্ট হয়। এখন একটি সুসংবাদ শুনুন। প্রভুকে মহারাজ এইবার কবি উপাধি প্রদান করিবেন।"

সন্ন্যাসী। "তোমার প্রভু কবি?"

আগন্তুক। "কবি! আপনি এত নিকটে থাকিয়া তাহা জানেন না। দূর দূর দেশে তাঁহার নাম কবি নামে পরিচিত হইয়াছে। তিনি যে এখন অদ্বিতীয় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ!"

সন্ন্যাসী। "আমি জানিতাম না।"

আগন্তুক। "এবার প্রত্যেক ক্ষুদ্র লোকও তাঁহাকে কবি বলিয়া জানিতে পারিবে। এবার আর কেহ চন্দ্রপতি বলিবে না। এখন অবধি তাঁহার নাম কবিচন্দ্র হইবে।" সন্ন্যাসী ও কথা আর না উঠাইয়া বলিলেন "আচ্ছা, অন্য রাজারা আসিয়াছেন, জয়চন্দ্র আসেন নাই কেন? শুনিয়াছি সম্পর্কে জয়চন্দ্র ও দিল্লীশ্বর পরস্পর কিরূপ ভ্রাতা হন।"

আগন্তুক। "কারণ আবার কি?—হিংসা। মৃত দিল্লীশ্বর তাঁহাকে রাজত্ব না দিয়া পৃথ্বীরাজকে দিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি জয়চন্দ্র হিংসায় জ্বলিতেছেন। আর একটা কথা শুনিয়াছেন? জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজের প্রতি ঈর্ষা ও তাঁহার মন্দ চেষ্টা করেন বলিয়া, জয়চন্দ্রের পিতৃব্য জয়চন্দ্রকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন সেই অবধি তাঁহাদের দুজনের বিবাদ হইয়াছে।"

কথা কহিতে কহিতে বালিকার পিতার প্রতি আগন্তুকের দৃষ্টি পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কে বসিয়া রহিয়াছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "উনি আমার শিষ্য।"

আগন্তুক। "ঐ বালক বালিকা দুইটী কাহার?"

সন্ন্যাসী। "পুত্রটী আমার, কন্যাটী উহাঁর।"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল "বাঃ! বেশ তো মিলিয়াছে?" এই সময় বাহিরে আবার কি শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন আজ নিশ্চিন্তে কোনমতেই বসিতে পারিবেন না। সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া শব্দের কারণ দেখিয়াই আবার ত্রস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বালিকার পিতা ব্যতীত আর সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কি হইয়াছে?" সন্ন্যাসী বলিলেন "আমাদের দ্বারে একটা বাঘ আসিয়াছে।" বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া দিলীপের পালিত হরিণ ও ঘোঁড়ার কথা মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "বাঘ যদি আমাদের অশ্বশালে প্রবেশ করে? আর কোন পথিককে একাকী পাইলেও তো বধ করিতে পারে। পিতা, চলুন আমরা উহাকে বধ করিয়া আসি।" সন্ন্যাসী তাহাতে সম্মত হইলেন দেখিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষীয় দিলীপ সানন্দচিত্তে তরবারি লইয়া ব্যাঘ্র বধ করিতে চলিলেন। বালিকা "দিলীপ দিলীপ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "এই আমি আসিতেছি ভয় নাই—" বলিয়া দিলীপ কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। দিলীপ ও সন্ন্যাসীর সহিত আগন্তুকও গমন করিল। অন্য দিন হইলে

বালিকার পিতাও সেই সঙ্গে যাইতেন। আজ তিনি চিন্তায় মগ্ন, এ সকল গোলযোগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি মনে মনে বলিলেন "কাল প্রাতঃকালে আমাকে চিনিতে পারিবে! কি লজ্জা, আমি তেজসিংহ, আমি এই কুটীরে! আমি পলাতক হইয়া ছদ্মবেশে কাল যাপন করিতেছি! কি লজ্জা! কাল আমি পরিচিত ব্যক্তিকে কি প্রকারে এ মুখ দেখাইব। আঃ! এই কন্যা যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমার এ প্রকারে থাকিতে হইত না। সেই দিনই প্রাণত্যাগ করিতাম। এখন কি হইবে! অনাথ আমাকে চিনিতে পারিবে! তাহা কখনই হইবে না। আমি অদ্য রাত্রেই কন্যাকে লইয়া এখান হইতে পলায়ন করিব।" কন্যার ক্রন্দনে তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন "কি হইয়াছে?" সে কাতরে বলিল "দিলীপ বাঘ মারিতে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া তাহার সাহায্য জন্য উঠিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসীরা কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, ব্যাঘ্র কুটীরের দ্বার হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধ গর্জ্জন করিতেছে। তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী ও আগন্তুককে পশ্চাতে রাখিয়া দিলীপ আপনি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীকে বলিল "চলুন মহাশয়! আমরা অগ্রে যাই, দেখিতেছেন না—বালক কি অভিপ্রায়ে যাইতেছে?" সন্ন্যাসী বলিলেন "আমরা এত নিকটে থাকিতে বালক অগ্রসর হই-

লেও তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। বৃথা উহার উৎসাহে বাধা দেওয়া ও সাহসের খর্ব্বতা করা উচিত নহে।” মনুষ্য দেখিয়া ব্যাঘ্র আহারের লোভে জিহ্বা লেহন করিতে করিতে দ্রুতবেগে তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিল। অমনি দিলীপ তাহার গাত্রে তরবারির আঘাত করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন। আহত ব্যাঘ্র ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া অন্যকে ত্যাগ করিয়া লম্ফ প্রদানে তাহাকে আবার আক্রমণ করিতে আসিল। সে যেমন মুখ বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে যাইবে অমনি দিলীপ নিপুণতা সহকারে তাহার বিস্তারিত মুখে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ক্রোধান্ধ ব্যাঘ্র তরবারি হইতে মুখ টানিয়া লইয়া কিঞ্চিৎদূরে সরিয়া গেল। একস্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এখন আর আক্রমণের কোন অভিপ্রায় দেখাইল না। দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া আবার লম্ফ প্রদান করিল। সন্ন্যাসী ও আগন্তুক দিলীপের জন্য ভীত হইলেন। তাঁহারা হস্তস্থিত তরবারি দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। দিলীপ ব্যাঘ্রকে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া তাহার লক্ষ্য স্থান হইতে কিছু দূরে যাইবার মানসে, সেখান হইতে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা নরম হওয়াতে পা পিছলিয়া সেই খানে পড়িয়া গেলেন। ব্যাঘ্র সহর্ষে যেমন তাহাকে ধরিবে অমনি পশ্চাৎ হইতে সন্ন্যাসী তরবারির

আঘাত করিলেন। দিলীপকে ত্যাগ করিয়া সক্রোধ দৃষ্টিতে ব্যাঘ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল। সেই অবকাশে দিলীপ ভূমি হইতে উঠিয়া বলপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের পশ্চাতের এক পদে আঘাত করিলেন। পদ ছিন্ন হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্র আবার তাঁহার দিকে ফিরিল। সেবারে দিলীপ তাঁহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ব্যাঘ্র অমনি ভূমিশায়ী হইল। তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

বালিকার পিতা কুটীর হইতে বাহির হইতে না হইতে দিলীপ রক্তাক্ত তরবারি হস্তে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া বালিকা সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে দিলীপের সম্মুখে আগমন করিল। এরূপ অল্পবয়স্ক বালকের এমন অসম সাহস দেখিয়া আগন্তুক অতিশয় আশ্চর্য্য হইল।

রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল। আহারান্তে তাঁহারা সকলে শয়ন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্ন্যাসী, বালিকা ও তাহার পিতাকে আর দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরো চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল। নানা ঘটনাবলী বহন করিয়া সময় আবার চারিটি পদাঙ্ক রাখিয়া গেল। তাহার পরে চারিবার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা পৃথিবীকে অধিকার করিয়াছে। তাহার পরে চারিবার পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে আবহমান কালস্রোত ১১১২ শকে গড়াইয়া পড়িল। এই শকে কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্র ও দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সহিত একটী সংগ্রাম বাধিল। যদিও এই যুদ্ধের সহিত পরে আর আমাদের অধিক সংশ্রব নাই, তথাপি ইহার কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এই নিমিত্ত নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই শকে মহারাজ জয়চন্দ্র, রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। ইহাতে অন্যান্য সকল রাজাই তাঁহাকে রাজাগ্রগণ্য স্বীকার করিয়া যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল দিল্লী ও আজমীরাধিপতি

পৃথ্বীরাজ এবং চিতোরাধীশ্বর সমরসিংহ তাহা অস্বীকার করিয়া সেখানে গমন করেন নাই। এই জন্ম জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের অপমান জন্য তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া দ্বারবানচ্ছলে দ্বারদেশে রাখিয়াছিলেন। কেবল এই এক কারণেই যে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের অপমান করিলেন এমন নহে। তাহা হইলে সমরসিংহও তাহার ভাগী হইতেন। আর এক কারণবশতঃ পৃথ্বীরাজের উপর জয়চন্দ্রের দ্বেষ জন্মিয়াছিল তাহা এই—

জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই মৃত দিল্লীশ্বরের দৌহিত্র সন্তান। জয়চন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্র, পৃথ্বীরাজ কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নানা সদ্গুণ থাকায় দিল্লীশ্বর ইহাঁকেই অধিক ভাল বাসিতেন ও তাঁহার পুত্র না থাকায় মৃত্যুকালে জয়চন্দ্রকে রাজত্ব না দিয়া পৃথ্বীরাজকে দিয়া গিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ পিতৃরাজ্য আজমীর ও মাতামহ-রাজ্য দিল্লী এই দুইয়েরি অধিকারী হইলেন। জয়চন্দ্র সেই জন্য মনে মনে পৃথ্বীরাজকে যথেষ্ট ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদিন কোন সুযোগ না পাওয়াতে তাহা দেখাইতে পারেন নাই, এইবার তাহা দেখাইলেন।

পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করিলেন। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের জয় হইল বটে কিন্তু তাঁহার প্রধান ১০৮ সেনাপতির মধ্যে ৬৪ জন বাঁচিয়া আসিল. সামান্য সৈন্য কত মরিল তাহা ইহা হইতে অনুমান

করা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে, জয়ের দিবসে সকলে নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলে পর, একজন অস্ত্রধারী যুবা পুরুষ সেই রণক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছিলেন। যুবা, পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু কবিচন্দ্র। ইতিহাসেও ইহাঁর নাম কবি বলিয়া খ্যাত আছে। কবিচন্দ্র কবি হইলেও বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম চতুস্ত্রিংশৎ, মুখাবয়ব সুন্দর ও প্রফুল্ল, গঠন বলিষ্ঠ, বীরনামের উপযুক্ত, সেই বলিষ্ঠকায়ে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র অতি শোভা পাইয়াছিল। তাঁহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ, শরীর বর্ম্মে আচ্ছাদিত। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ঢাল, বাম হস্তে বর্শা, এবং কটীবন্ধের বামভাগে কৃপাণ শোভিত হইয়াছিল।

বোধ হয় কোন কারণবশতঃ ইনি অন্য সকলের সহিত একত্রে যাইতে পারেন নাই, এখন একাকী শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সহসা বালিকা-কণ্ঠনিঃসৃত রোদন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, একটি বালিকা এক মৃত ব্যক্তির গললগ্ন হইয়া "পিতা পিতা" করিয়া রোদন করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, এই যুদ্ধে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ভাবিলেন "যদি তাহাই হয়, বালিকার মাতা কি আর কেহ তাহার সঙ্গে না আসিয়া তাহাকে একেলা এই স্থানে আসিতে দিল কেন? তবে কি তাহার আর কেহ নাই। সংসারে পিতাই কি এই বালিকার একমাত্র সম্বল ছিল, থাকিলেই বা এই বালিকাকে একেলা এই

ভয়ঙ্কর-দৃশ্য স্থানে আসিতে দিবে কেন? যদি আর কেহ না থাকে তবে তাহাকে এখন কে রক্ষা করিবে? তাহা হইলে এই সুকুমার কুসুমলতিকা কাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? সত্য সত্যই কি সে আজ হইতে অনাথা হইল? আর যদি হয়, আমরাই তাহার মূল। আমরাই অদ্যকার যুদ্ধে তাহার পিতাকে বধ করিয়া এই বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছি।" চন্দ্রপতি স্বভাবতঃ দয়ালু, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইল। তিনি তাহার অবস্থা জানিতে উৎসুক হইয়া তাহার নিকট আসিলেন। অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া বালিকা মস্তক উত্তোলন করিল। এই রাশি রাশি মৃতদেহের মধ্যে সহসা এক জীবিত মনুষ্য দেখিয়া তাহার সেই বিষণ্ণ মুখমণ্ডলও যেন কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দূর হইতে তাহাকে ৫।৬ বৎসরের মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে। এই অপরিস্ফুট গোলাপ কলিকা কালে সুগন্ধ বিস্তার করিবে বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কবিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহার জন্য কাঁদিতেছ? ইনি তোমার কে?" বালিকা উত্তর করিল "ইনি আমার পিতা।"

শৈলবালার পিতা সন্ন্যাসীর কুটীর ত্যাগ করিয়া প্রথম দুই তিন বৎসর কন্যাকে লইয়া দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। শেষে এই যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে হইতে তিনি

কান্তকুব্জের একটী পর্ব্বতে আসিয়া বসতি করিতেছিলেন, মৃত্যুর জন্যই যেন এখানে আসিয়াছিলেন। আজ তিনি রণ-ক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, বক্ষে তরবারি বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাহু ও অন্য অন্য স্থানেও অল্প অল্প আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, এখন তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে একখানা রক্তাক্ত তরবারি পড়িয়া আছে। এক তরবারি ব্যতীত আর কোন অস্ত্র নিকটে নাই। হস্তযুগল সমভাবে বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার অর্দ্ধমুদিত অসাড় চক্ষুদ্বয়, ঈষৎ উন্মীলিত ওষ্ঠাধর, ও বিষাদাঙ্কিত মুখ যেন গভীর দুঃখে কাতর হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। মরিবার সময়ও যেন নিশ্চিন্তে মরিতে পারেন নাই। যেন কোন গভীর দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মরিবার সময় যেমন কাতর চিত্তে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছেন, ঠিক যেন এখনো তাহাই করিতেছেন। কেবল সেই কাতরতার উপর, শান্ত ভাব আসিয়া এখন মুখশ্রী আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার এখনো গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, সমরে আসিতেও সে বস্ত্র ত্যাগ করেন নাই।

যুদ্ধের সময় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান দেখিয়া কবিচন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেন। কিছু পরে তিনি বলিলেন "তুমি একেলা বালিকা হইয়া এই ভয়ঙ্কর-দৃশ্য স্থানে কি প্রকারে আসিলে? ভয় হইল না?"

বালিকা। "ভয় হইবে কেন? ভালবাসা কি ভয়কে অতিক্রম করিতে পারে না?"

কবিচন্দ্র বালিকার মুখে এইরূপ উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তুমি বালিকা, এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিতে গেলে অনেক বিপদ সম্ভাবনা, তুমি ইচ্ছা করিলেই বা তোমার মাতা কি বাটীর আর কেহ কাহাকেও সঙ্গে না পাঠাইয়া একেলা আসিতে দিলেন?"

বালিকা। "আমার মাতা কি আর কেহ নাই?"

কবি। "কি, তোমার আর কেহই নাই?" তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় বাস করিতে?" বালিকা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিল "ঐ পর্ব্বতের উপর।" কবিচন্দ্র বলিলেন "অতদূরে এত শীঘ্র তোমার পিতার মৃত্যুসমাচার কে দিল?"

বালিকা। "কেহ নহে, আমি ঐ পর্ব্বত হইতে পিতাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িতে দেখিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নামিতে এত বিলম্ব হইল, যে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়াও, পিতাকে জীবিত দেখিতে পাইলাম না। হায়! যদি বলিয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামিবার পরক্ষণেই আমি পর্ব্বত হইতে নামিতে আরম্ভ করিতাম।" এই কথা বলিয়া বালিকা আরো কাঁদিতে লাগিল।

কবি। "তিনি যুদ্ধে আসিবেন, তাহা কি তোমাকে বলেন নাই?"

বালিকা। "না।"

কবি। "তবে তিনি যুদ্ধে আসিবেন বলিয়া তোমার সন্দেহ হইল কেন? যুদ্ধ হইবে তাহাই বা কি প্রকারে জানিলে?"

বালিকা। "যুদ্ধে আসিবার কথা কিছুই বলেন নাই, কিন্তু আজ যুদ্ধ হইবে তাহা বলিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন হইতে তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া কাঁদিতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন না। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম, যে তিনি আমার কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতেন। কাল আমাকে একটি ক্ষুদ্র বাক্স দিয়া বলিলেন "বৎসে! আমি বৃদ্ধ, তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় রাখিয়া আমার যদি অগ্রে মৃত্যু হয় তো তোমার দশা কি হইবে? আর তাহাই হইবে, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। এই বাক্সের ভিতর তোমার জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া গেলাম, যতদিন কোন সৎলোকের আশ্রয় না পাও, ইহাতে আত্মরক্ষা করিও। তুমি বালিকা, দেখিও কোন দুষ্ট লোকের কথায় ভুলিয়া তাহার সহবাস করিও না। যতদিন না বিবাহ হয় ভদ্রের আশ্রয়ে থাকিও। যাহার আশ্রয়ে থাকিবে, তাহার অসদভিপ্রায় দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে গৃহ ত্যাগ করিও।" এই কথা বলিয়া তিনিও কাঁদিলেন, আমিও কাঁদিলাম। আজ সকালে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই-লাম না। মনে মনে মহা ভীত হইলাম আজ যুদ্ধ হইবে

মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম সত্যই হইয়াছে।" বালিকা আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। কবিচন্দ্র বলিলেন, "যদি তোমার পিতার তোমার জন্য এত ভয় হইয়াছিল, তবে যুদ্ধে আসিলেন কেন?"

বালিকা। "তিনি দেশে থাকিয়া, দেশের জন্য যুদ্ধে না আসা অধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। তিনি কি আমার জন্য অধর্ম্ম করিবেন?"

কবিচন্দ্র বালিকার মুখনির্গত এই প্রকার কথা বার্ত্তা শুনিয়া, তাহাকে একজন উচ্চবংশজাতা মনে করিলেন। সে কে জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল পিতার নাম বলিল। তাহাতে তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন "শৈলবালা"। কবিচন্দ্র বলিলেন "এখন তুমি কোথায় কি প্রকারে থাকিবে?"

বালিকা। "কোন উপায় না পাই, আমিও পিতার অনুসরণ করিব।"

কবি। "আমার সহিত যাইবে?" সে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিল "কোথায়?" তিনি বলিলেন "আমার বাটী।"

বালিকা। "সেখানে কে আছে?"

চন্দ্র। "সেখানে তোমা অপেক্ষা বড় একটী যুবতী আছেন, তিনি তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিবেন।"

বালিকা। "তবে যাইব। আমাকে আর একজন ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত, সেই ভালবাসা আবার পাইতে ইচ্ছা করে।

চন্দ্র। "সে কে?"

বালিকা। "সে একটি বালক। আমরা তাহাদের কুটীরে কিছু দিন বাস করিয়াছিলাম।"

চন্দ্র। "তাহাদের বাটী কোথায়?"

বালিকা। "অনেক দূরে। সে দেশের নাম আমি জানি না, আমি তখন ছোট ছিলাম। আমরা অনেক দিন সেখানে হইতে চলিয়া আসিয়াছি। দিলীপ বলেছিল "আমাকে না ব'লে কোথাও যেও না," কিন্তু আসিবার সময় সে জানিতে পারে নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখ আর এক প্রকার দুঃখব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিল। কবিচন্দ্র বুঝিলেন "সেই বালকের নাম দিলীপ ছিল, বালিকা তাহাকে ভাল বাসিত। তিনি সে কথা আর না উঠাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া পৃথ্বীরাজের শিবিরে আসিলেন. আসিবার সময় বালিকা পিতার জন্য কত কাঁদিল। কবিচন্দ্র যথাসাধ্য বুঝাইয়া শেষে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পথে আসিতে আসিতে কবিচন্দ্র বালিকার কত বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলিল "পিতা বলিতেন এইবার দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।" কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা দুজনে শিবিরে পঁহুছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পৃথ্বীরাজ কহিলেন "কি কবি, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" কবিচন্দ্র বালিকাকে দেখাইয়া তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলেন। পৃথ্বীরাজ বলিলেন "কল্যই আমি স্বদেশ গমনের ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে তুমি কি বল?" কবিচন্দ্র বলিলেন "এখন আমাদের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, এখন যখন ইচ্ছা যাইলেই হয়।"

পৃথ্বী। 'তবে যাইবার জন্য সকল উদ্যোগ করিতে বলিয়া দেও। তোমার পরামর্শ না লইয়া এতক্ষণ আমি যাইব কি না নিশ্চয় করিতে পারি নাই।" পরদিন আর আর সকলে কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। কেবল চন্দ্রপতি দিল্লী না গিয়া আজমীরাভিমুখে গমন করিলেন। পৃথ্বীরাজ আজমীর হইতে দিল্লী আসিয়া বাস করিলেও চন্দ্রপতি আজমীরেই ছিলেন। জন্মস্থান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি কেবল যুদ্ধ কি অন্য প্রয়োজন হইলে দিল্লী আসিতেন। কার্য্য সমাপ্তে আবার ফিরিয়া যাইতেন। চন্দ্রপতি বাটী পঁহুছিয়াই তাঁহার স্ত্রীর হস্তে শৈলবালাকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রভাবতী, তিনি তাহাকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। চন্দ্রপতির গোলাপ নামে এক ভগিনী ছিল, সে বাটী থাকিত না, রাজকন্যার সহিত দিল্লীতে বাস

করিত। প্রভাবতীকে সেই জন্য একেলা থাকিতে হইত, আজ দোসর পাইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া বাঁচিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আজমীরের প্রান্তপ্রবাহিণী মানসনদী ধীরে ধীরে বেলা-ভূমি আঘাত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরস্থ একটী উদ্যানে, চাঁদনিতে শৈলবালা ও প্রভাবতী বসিয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। তখন জ্যোৎস্না-ধৌত তরঙ্গমালা নাচিয়া নাচিয়া সৈকত পুলিনে চলিয়া পড়িতে-ছিল। সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিত ঝাউ বৃক্ষের মৃদুমধুর নিনাদ নদী-কল্লোলের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। মাতৃবক্ষস্থিত শিশুসন্তানের ন্যায়, নদীগর্ভে নৌকারাজি, হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গমালার সহিত খেলা করিতেছিল। তাঁহারা যে চাঁদ-নিতে বসিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বস্থ একটী ঝাউ-বৃক্ষ-বিল-ম্বিত লতা আসিয়া সেই চাঁদনি স্পর্শ করিতেছিল। শৈল-বালা সেই খান হইতে হস্ত বাড়াইয়া সপত্র তাহার ফুল তুলিতেছিলেন। এখনকার শৈলবালা আর সে বালিকা

নাই। এ শৈলবালা আর সেই দিলীপের বাল্যসখী, তেজ-সিংহের নয়নানন্দবর্দ্ধক, কুটীরবাসিনী নবজাত কুসুমলতিকা নহে, কিম্বা রণক্ষেত্রের রোরুদ্যমানা বালিকাও নহে। আমরা যখন তাহাকে সেই পিতৃশোকাতুরা বালিকা দেখিয়াছিলাম তাহার পর আর দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সে এখন অপরিস্ফুট গোলাপকলিকা, আধ আধ ফুটিয়াই অতি মনোহর হইয়াছে। ফুল তোলা হইলে শৈলবালা প্রভাবতীকে সাজাইতে বসিলেন। প্রভাবতী বিংশতিবর্ষীয়া, ইহাঁর সৌন্দর্য্য শৈলবালার ন্যায় অর্দ্ধস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের মত নহে। ইহাঁর সৌন্দর্য্য চন্দ্রমার ন্যায় অতি মধুর। ইহার তেজ নাই অথচ উজ্জ্বল। ইহা যত দেখ, ততই দেখিতে ইচ্ছা করে, কিছুতেই চক্ষু ক্লিষ্ট হয় না। শৈলবালা বালিকাস্বভাব বশতঃ সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, প্রভাবতী ঈষৎ গম্ভীর। উভয়কে একত্রে দেখিলে কাহাকে অধিক সুন্দরী বলা যাইবে বাছিয়া ঠিক করা কঠিন। শৈলবালা এতক্ষণ সাজাইতে বসিয়াছেন, এখনও সজ্জা শেষ হইল না। তিনি প্রথমে এক একটী করিয়া সব ফুল গুলিন খোঁপার চতুর্দ্দিকে [illegible] দিলেন। ভাণ্ডার ফুরাইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মনোমত সাজান হইল না। বলিলেন "এখনও ভাল হয় নাই, যেমন খালি খালি দেখাচ্ছে"—আবার ফুল তুলিয়া প্রভাবতীর সমস্ত মস্তক ভূষিত করিয়া দিলেন। এবারও ঠিক মনোনীত হইল না। এবার ফুল তুলিয়া গাঁথিতে বসিলেন। ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া

প্রভাবতীর গলে হস্তে ললাটে পরাইয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার মনোমত হইল। এই গুরুতর কঠিন কার্য্য শেষ হইলে তিনি কথা কহিবার অবকাশ পাইয়া বলিলেন "এবার বেশ হয়েছে। আমি এসে অবধি এমন ক'রে এক দিনও সাজাতে পারি নাই।" তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভাবতী বলিলেন "তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে, রোজ রোজ কি আমাকে সাজাতে হবে। আর যে দিন না সাজ্‌ব, অমনি কাঁদ্‌তে বসবি। আজ আমি তোকে না সাজিয়ে ছাড়ব না।" শৈলবালা হাসিয়া বলিলেন "আমি কার জন্য সাজব? কে দেখ্‌বে?"

প্রভা। "কেন আমি?"

শৈল। "না তা হবে না, আমি তোমাকে সাজাব, আর দেখব?"

প্রভা। "না ভাই, তুই অমন করিস্ কেন বল দেখি? আপনি সাজবিনে আর আমাকে সাজাবি?"

শৈল। "বলব? না, বলব না।"

প্রভা। "আমার মাথা খাস বল।" শৈলবালা যথার্থ কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন "বলব? বলছি, এই এত দিন হোল আমার বিয়ে হলো না তাই মনের দুঃখে"।

প্রভা। "তোর সঙ্গে পারা ভার?"

শৈল। "অমনি রাগ? আচ্ছা এবার সত্য করে বলছি, আমি আগে কতবার বলেছি সব কি ভুলে গেছ?

প্রভা। "হাঁ সব ভুলে গেছি আবার বল ?"

শৈল। "ছেলেবেলায় দিলীপ আমাকে ফুল দিয়ে এই রকম করে সাজিয়ে দেখত, এখনকার মত হলে আমিও তাকে সাজাতেম। তাই তাকে সাজাতে পারিনে, তোমাকে সাজিয়ে দেখি।"

প্রভা। "ওঃ বুঝেছি—আমি তোর দিলীপ। তুই বুঝি আর তাকে ভুলবিনে। ছেলেবেলার ভাব কি এতই মনে থাকে? তা ভাই তুই এ কথাতো আমাকে আগে বলিস্ নি?

শৈল। "সে আমাকে সাজাত তাতো বলেছিলেম ?"

প্রভা। "হাঁ ঐ টুকু ব'লেছিলে বটে ?"

শৈল। "তবে আর সব আন্দাজে বুঝতে পারিলে না? আমি হ'লে আর ভেঙ্গে বলতে হ'ত না ?

প্রভা। "তোর সঙ্গে কি আমার তুলনা ? তা সে যাই হোক্, সে দিলীপ কোথাকার কে তার ঠিক নাই, তাকে মন দিস নে। আর সে কোথায় গিয়াছে, এত দিন আছে কি না তারই বা ঠিক কি? কিন্তু সে যদি আসে [illegible]লেও আমি তার সহিত তোর বিয়ে দিতে দেব না। তুই যে সুন্দরী, রাজা রাজড়ার সঙ্গে হলে তবে মানায়। তুই ছেলে মানুষ; ভালবাসা কাকে বলে এখনও বুঝিস নি, তাই সেই বাল্যসখা দিলীপকে ভাল বাসিস ব'লে মনে হয়। যখন যথার্থ ভালবাসা হবে তখন ভুল বুঝিতে পারবি" শৈলবালা

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "তাহার সহিত আমার বিবাহ দিতে তোমার ইচ্ছা নাই তাই ও কথা বলিতেছ। আর যে জন্য নাই তাহাও আমি জানি। দিলীপ অজ্ঞাতকুলশীল। কিন্তু দিলীপ অজ্ঞাতকুলশীল, আমিও কি সে বিষয়ে তাহার সমতুল্য নহি? সেই কারণে যদি তাহার সুপাত্রী না মিলে, তাহা হইলে আমারও সুপাত্র মিলিবার আশা নাই।"

শৈলবালা যাহা বলিলেন প্রভাবতী তাহা বুঝিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আচ্ছা ভাই তুই কি জন্মের কথা কিছুই জানিস্ না?"

শৈল। "ও কথা কতবার জিজ্ঞাসা ক'রবে? আমি এসে অবধি তো প্রত্যহ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করো"। শৈলবালা ঐ সকল কথা উড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন "এখন ওসব কথা যাক্। তোমাকে যে দেখাচ্ছে কি আর ব'লব? ইচ্ছা ক'রছে তোমার নামে একটা ছড়া বাঁধি।"

প্রভা। "এখন আর ছড়া বাঁধতে হবে না, একটা গান কর।"

শৈল। মনের মত গান তো একটাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

প্রভা। "সেই গানটা কর"। শৈলবালা বলিলেন "কোন্‌টা"?

প্রভা। "রঙ্গ দেখ? যেন বুঝতে পারলেন না? যেটা আমার কাছে রোজ রোজ গাস?" "আচ্ছা গাচ্ছি" বলিয়া শৈলবালা গান আরম্ভ করিলেন।

"সখী রে তু বোলো,
কাঁহে এত মন মজিলো,
যব দেখনু সো হাসি, পরাণ ভেল উদাসী,
স্বর শুনে হইনু পাগলো ॥
কি আছে সে আঁখিয়াতে সই পরাণ হারালো,
সখী রে তু বোলো,
কাঁহে মেরা এরসা ভেলো,
আপনা শুধায়ে সখী উত্তর না পাওয়লো ॥'

শৈলবালা ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া সপ্তমে তান চড়াইয়া দিলেন। তাঁহার সুমধুর ও পূর্ণ স্বরে উদ্যান, নদী, বৃক্ষ, পত্র, মধুময় হইয়া উঠিল। নৌকারাজি হেলিয়া দুলিয়া তাহার সহিত তাল দিতে লাগিল। তরঙ্গমালা উথলিয়া উথলিয়া তাহার তালে তালে নাচিতে লাগিল। মর্ম্মর শব্দে বৃক্ষপত্রগণ, শৈলবালার গীতের সহিত যোগ দিল। পুরস্কার স্বরূপ গন্ধবহ ধীরে ধীরে কুসুমগন্ধ হরণ করিয়া উদ্যানে ছড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে যেন আরো অধিক কিরণ বিস্তার করিলেন। ক্রমে শৈলবালার গীত শেষ হইল। অমনি সকলি যেন দুঃখে অধীর হইয়া শোভা-বিহীন হইয়া পড়িল। প্রভাবতী বলিলেন "কি মিষ্টই লাগল, আর একটা গান কর।"

শৈল। "আমি আর গাব না, এবার তোমার নামে একটা ছড়া বাঁধব। হাঁ একটা হয়েছে। প্রভাবতী বলিলেন

"যা ভাই আর রঙ্গ করিস নে।" শৈলবালা সে কথায় কাণ দিল না। সে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল ;—

"ফুলের হার, কি ধরে বাহার প্রভাবতীর গলে।
কি ছার পুরুষ জাতি, কামিনীর মন ভোলে॥"

প্রভা। "তোর ভাই রাত্দিন ছড়া কাটা।"

শৈল। "যার স্বামী এমন কবি, তার ছড়াতে অরুচি কেন? ও বুঝেছি, যে সর্ব্বদা সাগরে থাকে, আর বড় বড় তরঙ্গের সঙ্গে যার মন খেলিয়ে বেড়ায় তার মন কি নদী নালায় টলে? যেমন টলেও না তেমনি ভালও লাগে না। না ভাই, এও ঠিক হ'ল না। যে রাত্দিন কোকিলের স্বর শুন্তে পায় কাকের ডাক শুন্তে কি তার কখনও রুচি হয়? কিন্তু ছিঃ! এত বড় কবির কাছে থেকেও তুমি নিজে কবি হ'তে পার্লে না?"

প্রভা। "আমি না হই তুই তো কবির কাছে থেকে কবি হয়েছিস, সেই ভাল। কবির কাছে থেকে থেকে তোর আর ছড়া ছাড়া মুখ দিয়ে কিছু বেরোয় না।"

শৈল। "আরো কত ছড়া বাঁধব, এখন হয়েছে কি? এই দেখ না আর একটা বাঁধি।" শৈলবালা কথা কহিতে-ছিলেন, তাঁহার চক্ষু অন্যদিকে ছিল। তিনি কি দেখিতেছেন দেখিতে প্রভাবতীও সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখি-লেন কবিচন্দ্র আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভাবতী বলিলেন "তোর ছড়া এখন রেখে দে। দেখিস উহাঁর কাছে

যেন ওসব কিছু বলিস নে। তা হ'লে আমি তোর দিদীপের কথা বলে দেব।" শৈলবালা বলিলেন "ঐ দেখ এর মধ্যেই তোমার সখা আসছেন। একদণ্ড কি একেলা থাকতে পারেন?

দেখ লো চেয়ে, আসছে ধেয়ে তোমার প্রাণ সখা।
প্রভা বিনে চাঁদ কেনে লো রইতে নারে একা॥
তুই না থাকলে আঁধার কেন চাঁদের বদন ঢাকে।
বোঝা গেছে চাঁদের গরব যত নিয়ে তোকে॥
রবির কিরণ, নিয়ে যেমন, গগন চাঁদের শোভা।
চাঁদকে তেমনি তুই বুঝিলো ঢেলে দিস তোর আভা॥"

প্রভাবতী রাগ করিয়া শৈলবালার হস্ত চিবুক হইতে দূরে ফেলিলেন। শৈলবালার তাহাতে আরো আনন্দ হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—

"লাজ কেন লো সই!
চাঁদের শোভা আছে কিলো প্রভার প্রভা বই।"

প্রভাবতী এবার তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। শৈলবালা তাঁহার হস্ত হইতে মুখ ছাড়াইয়া না লইতে লইতে চন্দ্রপতি তাঁহাদের নিকট আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন অন্য দিনের ন্যায় চন্দ্রপতির মুখে হাসি নাই। তাঁহার বদন অতি বিষন্ন, তাঁহাকে এই প্রকার চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের হাস্যামোদ ঘুচিয়া গেল। শৈলবালা বলিলেন "কলঙ্ক কেন গো আজি নিষ্কলঙ্ক চাঁদে?" প্রভাবতী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন

"শৈলের সকল সময় ঠাট্টা করা অভ্যাস। তোমার মুখ দেখে আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কি অমঙ্গল সংবাদ দিতে আসছ?" চন্দ্রপতি বলিলেন "সত্য সত্যই আমি অমঙ্গল সংবাদ দিতে এসেছি।" প্রভাবতী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

চন্দ্র। "কল্য দিল্লী গমন করিব।"

প্রভা। "কেন?"

চন্দ্র। "মহারাজ লিখিয়াছেন যে, যবনেরা আবার দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিতেছে।" শৈলবালা বলিল "কেন? এই যে সেদিন তাহাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিলে। আমাকে তুমি যে বৎসর নিয়ে এলে, তার কয়মাস পরেই যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ হয়ে গেল?"

চন্দ্র। "সে পরাজয়ের অপমান এখনো ভুলতে পারে নাই, এবার অধিক সৈন্য সংগ্রহ ক'রে তাহারা প্রতিশোধ দেবে আশা করে এসেছে।" শৈলবালা বলিল "কে শোধ তুলবে দেখা যাবে। তাদের আরবার দয়া করে ছেড়ে দিয়েছ তাই অহঙ্কার হয়েছে। কোথায় সেই জন্য কৃতজ্ঞ হবে তা না আবার উপদ্রব কর্‌তে এসেছে।" চন্দ্রপতি বলিলেন "আমি কল্যই যাইব। আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিব না।" প্রভাবতী এতক্ষণ মৌনে কাঁদিতেছিলেন, কষ্টে অশ্রুজল নিবারণ করিয়া বলিলেন "তুমি স্বদেশ রক্ষার্থে যাইতেছ আমি তাহাতে বাধা দিব না। ঈশ্বর করুন আরবারের

ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইস। তোমার সঙ্গে কে যাবে?"

চন্দ্র। "বৃদ্ধ অনাথকে লইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পৃথিবীতে সকলি অস্থির, সুখ দুঃখ কি স্থির থাকিবে। এই এক ঘণ্টা কাল পূর্ব্বে উহাঁরা কেমন হাস্যামোদে রত ছিলেন। দুঃখ আসিয়া প্রবল ঝটিকার ন্যায় উহা উড়াইয়া দিল। উদ্যানে আসিবার সময় যেমন হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিলেন যাইবার সময় তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইল। পথে যাইতে যাইতে শৈলবালা প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরবারে চন্দ্রপতি যুদ্ধে যাইবার সময় তুমি তো এরূপ কাতর হও নাই। এবার এমন দেখিতেছি কেন?" প্রভাবতী বলিলেন "কে জানে জানি না। আরবার এবারকার মত অমঙ্গল ভাবনা মনে আসে নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দিল্লী-রাজান্তঃপুরে যেখানে রাজকন্যা উষাবতী, মন্ত্রীপুত্রের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই স্থানে প্রবেশ করি।

মুখে আনিও না। আমি কখন তোমাকে ও প্রকার ভাল-বাসিব না।"

বিজয়। "কেন? তবে কি তুমি আর কাহাকেও ভাল-বাস?"

উষা। "সে কথা জানিয়া তোমার কি হইবে?"

বিজয়। "তাহা হইলে ভালবাস বলিয়া আর অধিক তোমাকে বিরক্ত করিব না?" বিজয় রুদ্ধশ্বাস হইয়া স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উষাবতী অনিচ্ছা পূর্ব্বক অথচ ধীর ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন "হাঁ, আমি ভালবাসি"। এই এক কথায় বিজয়ের এতদিনকার আশা ভরসা সকলি যেন বিলুপ্ত হইল। কম্পিতস্বরে বলিলেন "কাহাকে?" এই প্রশ্নে উষাবতীর বদনমণ্ডলে একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ পাইল। বোধ হইল তিনি যেন মনে মনে বলিতেছেন 'তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধি-কার নাই, কাহারও অধিকার নাই, আমার প্রণয়ের সামগ্রী আমারই।' তিনি মনে মনে বলিলেন "বলিব না।"

বিজয় শুনিয়াছিলেন, চিতোরাধিপতি সমরসিংহের পুত্র যুবরাজ কল্যাণের সহিত রাজকন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, এই শুনিয়াই তিনি অতিশয় ভগ্নচেতা হইয়া রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজকন্যা কল্যাণের প্রতি অনুরাগী কি না জানিতে, এবং তিনি যদি কোনরূপে এ বিবাহে তাঁহার অমত করিতে পারেন, এই চেষ্টায় তিনি

আজ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার শেষ প্রশ্নে রাজকন্যাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আর অধিকক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আপনিই বলিলেন "যুবরাজ ইন্দ্রসিংহ এবং রণবীরসিংহ ইহাদের মধ্যে কি কেহ তোমার প্রণয়পাত্র?" ঊষাবতী পূর্ব্বকার ন্যায় মৌনই রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিজয় অধীর হইয়া বলিলেন "আমার নিকট ওকথা বলিতেও কি তোমার এত বাধা আছে?" ঊষাবতী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "না, উহাঁরা আমার প্রণয়-পাত্র নহেন। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না। ওসব বিষয়ের আর আমি উত্তর দিব না। যদি অন্য কোন কথা না থাকে, তো প্রস্থান কর?" কে তাহা নিশ্চয় জানিবার ইচ্ছায় তিনি রাজকন্যাকে শুনাইয়া আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন "উহাঁরা নহেন তবে কে? রণবীরসিংহ নহেন, ইন্দ্রসিংহ নহেন, তবে আর উহাঁর উপযুক্ত প্রণয়-পাত্র এখানে কে আছে? এক যুবরাজ কল্যাণ। তাঁহাকে কি তবে রাজকন্যা ভাল বাসেন?" কল্যাণের নাম শুনিয়া রাজকন্যা যেন একটু চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হইল। বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তরাগে রঞ্জিত হইল। দৃষ্টি আবার নিম্নে পতিত হইল, তাহাতে লজ্জার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মনের ভাব লুকাইবার জন্য তিনি গাত্রস্থিত ওড়না লইয়া নিঃশব্দে খেলিতে লাগিলেন। তাহা মস্তকে একটু টানিয়া দিলেন। বিজয় যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে

আশাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, তাহা বিশুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না। সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুত-পদ নিক্ষেপে একেবারে আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা বিজয়কে এই প্রকার করিতে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বিস্ময়ের কিছু হ্রাস হইলে প্রিয়-সখী গোলাপকে ডাকিলেন। গোলাপের বদন অতি বিষণ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে যেন কাঁদিতেছিল। কিন্তু রাজকন্যা অন্যমনা বশতঃ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন "তুমি মন্ত্রীপুত্রকে গুপ্ত দ্বার দিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিলে, কিন্তু যাইবার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আপনিই চলিয়া গিয়াছেন। আমি প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন মতে সম্মত হই নাই। নিতান্ত অনুরোধ করাতে ও এই শেষ প্রার্থনা করায় আমি শেষে সম্মত হইলাম। কি অভিপ্রায়ে আসিতে চাহিতেছেন জানিলে কখনই সম্মত হইতাম না। এখন দেখ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল কি না; আর গুপ্ত দ্বার বন্ধ করিয়া আইস।"

এই বলিয়া রাজকন্যা শয়ন করিতে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীতে সচরাচর দুই প্রকার প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের নাম অকৃত্রিম, অপর প্রকারের নাম স্বার্থপর প্রেম। যে ব্যক্তির প্রেম, প্রণয়ীজনের নিকট ভালবাসা প্রতিদান না পাইয়াও সহস্র নিষ্ঠুরতা উপহার পাইয়াও হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে তাহার প্রেমই অকৃত্রিম। যে ব্যক্তি প্রণয়ীজনের সুখসাধন নিমিত্ত আত্মসুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিতে পারে তাহার প্রেমই অকৃত্রিম। কিন্তু এ প্রকার উচ্চপ্রণয় অতি বিরল। আবার পরস্পরের প্রণয় যদি অটল হয় তাহাও অকৃত্রিম। এই প্রকারের অকৃত্রিম প্রণয় তত বিরল নহে। আর যে ব্যক্তির যত্নসঞ্চিত প্রেমও ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের ন্যায় এক কথায় ভাঙ্গিয়া যায়, যে আত্ম-সুখের জন্য ভালবাসে, তাহার প্রেম, প্রেম নামের যোগ্য নহে। সে যখন শুনে তাহার ভালবাসা অন্যের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তখন তাহার ভালবাসা ঘৃণা রূপে পরিণত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে আপনার জন্য ভাল-বাসিত, তাহার জন্য নহে। এ প্রেমের নাম স্বার্থপর প্রেম।

বিজয়ের ভালবাসা এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তিনি যখন শুনিলেন রাজকুমারী তাহাকে কখনই ভালবাসিবেন না তিনি অন্যের প্রতি আসক্তা, অমনি তাঁহার হৃদয় ঘৃণা ও

হিংসা আসিয়া অধিকার করিল। কেবল যে তিনি রাজচুনি লাভে বঞ্চিত হইলেন তাহা নহে। তাঁহার আর একটি উচ্চ-দিনের আশা সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। তিনি আশা করিয়া-ছিলেন যদি রাজকন্যার প্রেম হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি (পৃথ্বীরাজের পুত্র না থাকায়) ভবিষ্যৎ রাজাও হইতে পারিবেন। এখন দেখিলেন সে আশা বৃথা, তাঁহার স্থান কল্যাণ গ্রহণ করিবেন। রাজকন্যা ও কল্যাণকে তাহার দোষী মনে হইতে লাগিল। হিংসা ও ক্রোধে শরীর জলিয়া উঠিল, তিনি মনে মনে বলিলেন "তাহা কখনই হইবে-না। মরিব কিম্বা মারিব।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিজয় আপন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখি-লেন তাহার ভৃত্য তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। ভৃত্য বিজয়কে দেখিবামাত্র বলিল "মন্ত্রীমহাশয় আপনার নিমিত্ত অনেকক্ষণ হইতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। তাহা শুনিয়া বি-জয় আপন গৃহ হইতে পিতার গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার পিতা অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, কেশ শ্মশ্রু সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ, মুখশ্রী অতি গম্ভীর ও সদ্গুণপ্রকাশক, সেই অমায়িক বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র ভক্তি জন্মে। ইহাঁকে দেখিলে মনে হয়, যুবা বয়সে ইনি একজন সুন্দর পুরুষ ছিলেন। বিজয়ের মুখাবয়বের সহিত যদিও তাঁহার মুখাবয়বের অনেক সাদৃশ্য ছিল, তথাপি তাঁহার সদ্গুণ সকল বিজয়ে দৃষ্ট হইত না।

বিজয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, মন্ত্রী অমর

এক দীপালোকের সম্মুখে বসিয়া লিখিতেছেন, নিকটে
ক কাগজ পত্র। তিনি বিজয়কে দেখিয়া লেখা বন্ধ
না করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। যাহা
লিখিতেছিলেন তাহা সমাপ্ত হইলে বলিলেন "আমি সন্ধ্যা
কাল হইতে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি, তোমার
সহিত আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।" বিজয় ইহা শুনিয়া
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন "আমি বাটী আসিয়া আপনি
ডাকিয়াছেন শুনিবামাত্র এখানে আসিয়াছি, আপনার কি
আদেশ বলিলে পরিতৃপ্ত হই।" মন্ত্রী বলিলেন "কোন
কার্য্যোপলক্ষে কল্যই তোমাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে,
সকলি প্রস্তুত, এখন রাত্রি মধ্যে তুমি প্রস্তুত হইয়া লও।"
বিজয় হঠাৎ পরদিন যাইতে হইবে শুনিয়া আরো অধিক
আশ্চর্য্য হইলেন। অমরসিংহ কতকগুলি পত্র দেখাইয়া
বলিলেন "এই গুলি অতি প্রয়োজনীয়, এই গুলি নির্দ্দিষ্ট
স্থানে লইয়া যাইতে এক জন বিশ্বাসী ও উপযুক্ত লোকের
আবশ্যক। আগামী যুদ্ধোপলক্ষে সন্ধিবদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
করপ্রদ রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনাই ইহার উদ্দেশ্য।
মুসলমানেরা এ দেশে আসিয়াছে, জানিয়াও আমরা এত
দিন বিশেষ কিছু আয়োজন করি নাই। কারণ, আর
বারের অপমান ভুলিয়া গিয়া যদি সাহস করিয়া তাহারা এবার
যুদ্ধে আগমন করে, তাহা হইলে আমাদের সৈন্য দ্বারাই পরা-
ভূত করিতে পারিব মনে করিয়া আর বৃথা অন্য রাজার

সাহায্যের কোন আবশ্যক দেখি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, শত্রু হীনবল মনে করিয়া আয়োজনে উপেক্ষা করা উচিত নহে। অতি সামান্য যুদ্ধ হইলেও তাচ্ছিল্য করিতে নাই। বিশেষ, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ যেরূপ সহজ, যদি কোন ক্ষত্রিয় তাহাদের সহিত যোগ দেন, তবে তত সহজ হইবে না। আর বারে যখন কানুজাধিপতিকে পরাজয় করিয়া আসিয়া সেই অবশিষ্ট অল্প সৈন্য লইয়া যবন জয় করিতে পারিয়াছি, তখন এবারে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে আমাদের সমস্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু জয়চন্দ্রের সহিত আমাদের শত্রুতা আছে। তিনি দেশের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া ইহাদের সহিত যোগ দিতে পারেন, আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। এই প্রকার সকল দিক বিবেচনা করিয়া তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। আমাদিগের চারিদিকে শত্রুর চর, নির্ভয়ে এক পদ অগ্রসর হইবার যো নাই। সেই জন্য সামান্য দূত দ্বারা ইহা পাঠাইতে সাহস হয় না। তাহারা বিপদে পড়িলে কৌশলে কিম্বা বলে শত্রুহস্ত হইতে পলায়ন করিতে জানিবে না। শত্রুগণ যদি ইহা কোন মতে হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য-সিদ্ধি হইবে না। এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাহস প্রভৃতি যে সকল গুণের আবশ্যক, তাহা সকলি তোমাতে আছে। সেই জন্য মহারাজকে বলিয়া তোমাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত

সিংহ্যাছি। ইহাতে অনেক বিপদ সম্ভাবনা, দেখিও সাবধানে কার্য্য নির্ব্বাহ করিও। তুমি যদিও আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তথাপি স্বদেশের হিতের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। দেশের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইতেও স্বীকৃত হইয়াছি। যদি বৃদ্ধ হইয়া অপারগ না হইতাম, তাহা হইলে স্বয়ং যাইলে এ প্রকার কষ্ট হইত না।"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রকে বিদায় দিলেন। তাহাকে যতক্ষণ দেখা গেল, অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। একেবারে অদৃশ্য হইলে সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। আবার মন্দ চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। ভাবিলেন "যে কর্ম্মে পাঠাইলেম, তাহাতে মৃত্যুরই অধিক সম্ভাবনা। এই বিদায় হয় তো শেষ বিদায় হইল। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আর কেহই নাই, এই এক মাত্র পুত্র, তাহাকেও হয় তো এইবার হারাইবেন। যদি পুত্র ফিরিয়া না আইসে, তবে আর কাহার মুখ দেখিয়া তিনি জীবন ধারণ করিবেন? তাহা হইলে তাঁহার কি দশা হইবে?" আবার ভাবিলেন "ভাগ্যক্রমে যদি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়াই আইসে, যদি এসকল চিন্তা বৃথা হয়? না, তাহা কি হইবে? যদি হয়, তবে তাহাকে ভবিষ্যতে এমন বিপদজনক কার্য্যে আর পাঠাইবেন না।" স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিবে মনে করিতেও তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হইল। কিন্তু তাহা

অধিক ক্ষণ রহিল না। আবার মন্দ আশঙ্কা হইল। এইরূপ অধিক ভালবাসা স্থলে অল্প কারণে আশঙ্কা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। তিনি যখন এই প্রকার ভাবিতেছিলেন, তখন বিজয় কি করিতেছিলেন? তিনি প্রথমে নিদ্রায় সকল কুচিন্তা দূর করিবেন বলিয়া শয়ন করিলেন। কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। পিতার মহৎভাবযুক্ত মুখশ্রী দর্শনে ক্ষণকালের জন্য যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মনে পুনরুদ্দীপিত হইল। বিজয় সেই সকল চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যতই নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই রাজকন্যার সহিত কথোপকথন মনে পড়িয়া হিংসায় তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। শয্যা কণ্টকসম হইল। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের চতুষ্পার্শ্বে পরিচারণ করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে তিনি রাজকন্যা ও তাঁহার প্রিয়পাত্র কল্যাণকে শাস্তি দিবেন, তাহার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। কতকটা চিত্ত স্থির হইলে তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি যেন রাজকন্যার গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় গৃহের দ্বারদেশে কাহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন। মনের অস্থিরতা বশতঃ তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। ভাবিলেন "সে কে? গোলাপ না? সে ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিল? সে কি আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিল? তাহাই হইবে। সে যেন আপন মনে কি বলিতেছিল? আমি শুনিতে শুনিতে

আসিলাম। কি বলিতেছিল স্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। কেবল পুরুষজাতির নিন্দা করিতেছিল, এই মাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু তাহার নিন্দা করিবার কারণও আছে, কেন না আমি জানি, সে আমার প্রতি দৃঢ় অনুরাগিণী; আর তাহা জানিয়াও আমি তার ভালবাসায় সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এইবার কিন্তু তার প্রতি ভালবাসা ভাণ করিয়া আমার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার দ্বারা সম্পাদন করিয়া লইব।" এখন তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি আর গৃহে রহিলেন না, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া দ্রুতগতিতে রাজবাটীর সম্মুখে গমন করিলেন। প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজ-বাটির কোন্ কোন্ স্থানে প্রহরী নিযুক্ত আছে, কোন্ পথ দিয়া গমন করিলে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবেন, তাহা বিজয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সেই অনুসারে সাবধান হওয়াতে ও অন্ধকার বশতঃ প্রহরীরা কেহ দেখিতে পাইল না। গোলাপের গৃহ কোন্ স্থানে তাহাও বিজয় জানিতেন। উদ্যানে পঁহুছিয়া সেই দিকে চলিলেন। গোলাপ যে গৃহে বাস করিত, সে গৃহ দ্বিতল। তাহার নিম্নস্থ উদ্যানে দাঁড়াইয়া কি প্রকারে ঊর্দ্ধে উঠিবেন ভাবনা হইল। যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ও সকল কথা মনে আইসে নাই। বিজয়ের তুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্থির বুদ্ধি ছিল না। তিনি এখন কি প্রকারে কৃতকার্য্য হন ভাবিতেছেন, সহসা পদধ্বনি

শ্রুতিগোচর হইল ও এক মনুষ্যমূর্ত্তি নেত্রপথে পতিত হইল। বিজয় তাহাকে প্রহরী ভাবিয়া মনে মনে ভীত হইয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। মনুষ্যমূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন সে মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের। রমণী আরো অগ্রসর হইল। বিজয় গোলাপকে চিনিতে পারিলেন। গোলাপও নিদ্রা না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উদ্যানে আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, রাত্রের শীতল বায়ুতে শরীর শীতল হইলে চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করিবে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। বিজয় যাহার নিমিত্ত আসিলেন, বিনা কষ্টে তাহাকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। সহসা একজন পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া গোলাপ ভীত হইয়া চীৎকার করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তাহা না করিতে করিতে বিজয় বলিলেন "ও কি করিতেছ? তাহা হইলে আমি চোর বলিয়া ধৃত হইব।" স্বর শুনিয়া গোলাপ তাহাকে চিনিতে পারিল। বিজয় তাহার জন্য আসিয়াছে, তাহা যদিও গোলাপ জানিত না, তথাপি তাহাকে দেখিয়া তাহার আহ্লাদ হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল "এ কি, এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

বিজয় বলিলেন "তোমার জন্য।"

গোলাপ একটু দুঃখব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিল "এ তামাসা করিবার সময় নহে।"

বিজয়। "আমি তামাসা করিতেছি না, সত্যই বলিতেছি।"

গোলাপ। "আমার নিকট তোমার এমন কি প্রয়োজন আছে যে, সকালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রাত্রেই আসিয়াছ ?"

বিজয়। "আমি কাল সকালে এখানে থাকিব না।"

গোলাপ। "তবে কি প্রয়োজন আছে বল ?"

বিজয়। "এস্থান কথা কহিবার উপযুক্ত স্থান নহে আরো কিঞ্চিৎ দূরে চল।" দূরে আসিলে বলিলেন "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি,--বলিবে ?" এই কথায় গোলাপ বিরক্ত হইয়া বলিল "বুঝিয়াছি,. রাজকন্যার কথা। তাঁহার মুখ হইতে সব স্পষ্ট শুনিয়া আবার কি জান্‌তে এসেছ ? তিনি কল্যাণের প্রতি আসক্তা। তাঁহাকে পাইবার আশা ত্যাগ কর।" বিজয় দেখিলেন তাঁহার অনুমান সত্য হইয়াছে। রাজকন্যা কল্যাণকেই ভাল বাসেন। গোলাপের নিকট বিজয়ের আসিবার নানা কারণ ছিল। তাহার মধ্যে রাজকন্যা যথার্থ কল্যাণের প্রতি অনুরাগিণী কি না, ইহা জানিতেও ইচ্ছা ছিল, সে ইচ্ছা বিনা কষ্টে পূর্ণ হইল। তিনি এখন বলিলেন "না, রাজকন্যার কথা না। তোমার কথা।" গোলাপ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কি ! আমার কথা ?"

বিজয়। "হাঁ তোমার কথা, আজ তুমি তখন যাহা বলিতেছিলে, তাহা কি সত্য ?"

গোলাপ। "কখন ! কি বলিতেছিলাম ?"

বিজয়। "যখন আমি রাজকন্যার গৃহ হইতে চলিয়া

আসি, তখন তুমি বলিতেছিলে কে একজন আমার প্রণয়িনী হইতে চায়—সে কে? সে কি তুমি?" গোলাপ বুঝিতে পারিল তাহার কথা সকল প্রকাশ হইয়াছে। সে লজ্জায় অবনতমুখী হইল। ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল "সকল শুনিয়াছ, তবে আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

বিজয়। "তবে আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহাই কি ঠিক? তুমি কি আমাকে যথার্থ ভাল বাস?"

গোলাপ। "আমি ভাল বাসি কি না জানিয়া তোমার কি হইবে? তুমি তো আর আমাকে ভাল বাসিবে না? তোমার হৃদয় অন্যের।"

বিজয়। "না,—আমি তোমাকে ভাল বাসিব।" এই কথায় গোলাপের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মলিন হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের সঞ্চার হইল। দীপ জ্বলিয়াই নির্ব্বাণ হইল। সে বলিল "যে ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রাজকন্যার জন্য পাগল হইয়াছিল, সে কি প্রকারে এত অল্পক্ষণ মধ্যে অন্যকে হৃদয় দিবে? আর যদিও দেয় তবে তাহাও ক্ষণকালের জন্য। তুমি আজ আমাকে ভাল বাসিবে, কাল ঐ বলিয়া আবার এক জনের মন তুষ্ট করিবে।"

বিজয়। "তুমিও আমার প্রণয় গ্রহণ করিবে না? আমার কি দুরদৃষ্ট। আমার জন্য এতক্ষণ যে লালায়িত ছিল, আমার ভাল বাসা জানিয়া সেও আমার প্রতি নির্দ্দয়

হ[illegible]াকে ভাল বাসেন না, আর, আর এক জন [illegible]রাগিণী, ইহা জানিয়া আমি তাহাকে ভাল না বা[illegible]প্রকারে থাকিব? তোমাকে ভাল বাসিলাম বলিয়া [illegible]মি তোমার নিকট দোষী হইলাম।” সরলহৃদয়া গোল[illegible]তাহার চাতুরী বুঝিল না। সে বিজয়কেও আপনার ন্যায় সর[illegible] বোধে বিজয় যাহা বলিলেন, তাহাই বিশ্বাস করিল। [illegible]বোধ বালা আজ ধূর্ত্ততার ফাঁদে পড়িল। সে বলিল “তুমি যাহা বলিলে তাহা বিশ্বাস করিলাম। জানিলাম, আমার সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হইয়াছে। এখন অবধি আমি তোমার ক্রীত দাসী হইয়া থাকিব। যদি আমার কথায় কষ্ট হইয়া থাকে, তবে মার্জ্জনা করিবে।” এতক্ষণে বিজয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি হর্ষে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোলাপ ভুল বুঝিল। সে ভাবিল, তাহার জন্যই বুঝি বিজয়ের এত আহ্লাদ হইয়াছে। ঐ সময় এক প্রহরীর পদধ্বনি শুনিয়া তাহাদের হর্ষ ভঙ্গ হইল। গোলাপ বলিল “তুমি যাও, প্রহরী দেখিলে সর্ব্বনাশ হইবে।” বিজয় বলিলেন “তবে আমি চলিলাম। কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসি, তবে আবার সাক্ষাৎ হইবে।” এই কথা বলিয়া বিজয় চলিয়া গেলেন। প্রহরী নিকটে আসিয়া গোলাপকে দেখিয়া কিছু বলিল না, সে জানিত গ্রীষ্মকালে গোলাপ এক এক দিন রাত্রে এই উদ্যানে বেড়াইতে আইসে।

বিজয় গৃহে আসিয়া এবার পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত হইয়া

নিদ্রা গেলেন। তাঁহার শান্ত হইবার[illegible]জন আমার প্রণ[illegible]কে পাইয়া কি তাঁহার হৃদয় হইতে হিং[illegible]হইল? তাহা নহে। তিনি এখন প্রতিশো[illegible]দিতে পারিবেন এই আশাতেই পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত হ[illegible]ন। বিজয় এক ঘণ্টাকাল নিদ্রা না যাইতেই রাত্রি [illegible]র হইল। রাত্রে জানলা বন্ধ না থাকায় তাহা দিয়া গৃ[illegible] আলোক প্রবেশ করাতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। [illegible]দেখিলেন পূর্ব্বগগন উজ্জ্বল হইয়াছে, ও অল্প অল্প প্রভা[illegible]বায়ু ফুরফুর করিয়া তাঁহার অঙ্গে লাগিতেছে। সেই শীতল বায়ুতে ও নূতন আশায় শরীর ও মন পূর্ব্ব রাত্রি অপেক্ষা সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে দেখিয়া বিজয় পিতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই অমনি অশ্বারূঢ় হইয়া গম্য স্থানে যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ও দিলীপসিংহের নিকট আমরা অনেক দিন গমন করি নাই। আজ সেই কুটীরে গিয়া তাঁহারা কি

করিতেছেন একবার দেখিয়া আসি। রাত্রি দ্বিপ্রহর; গগন-মণ্ডলে অসংখ্য অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছে। কিন্তু চন্দ্রমা বিহীনে পৃথিবীর শোভা নাই। রজনী গভীর ও নিস্তব্ধ; পৃথিবী তিমিরাবৃত। [illegible] নিস্তব্ধতার মধ্যে এক একবার কেবল পেচকের কর্কশ কণ্ঠস্বর ও ঝিল্লীর ঝিঁঝিঁরব শ্রুত হইতেছে। তাহা ভিন্ন এখানে আর শব্দ নাই, আর গোল নাই। কিন্তু এই গভীর রজনীতেও কুটীরবাসীদিগের নিদ্রা নাই। কুটীরস্থিত একটি স্তিমিত প্রদীপের আলোকে দেখা যাইতেছে, কুটীর প্রান্তে সন্ন্যাসী রুগ্নশয্যায় শয়ান, নিকটে দিলীপ উপবিষ্ট। দিলীপের হস্তের নিকট রোগীর ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল মৃণ্ময় পাত্রে প্রস্তুত রহিয়াছে। রোগীর জ্বর ছাড়িতেছে, তিনি গাত্রের জ্বালায় ছট ফট করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে দিলীপের নিকট জল চাহিতেছেন। দিলীপ এখন দ্বাবিংশতিবর্ষীয় যুবাপুরুষ। তাঁহার মুখশ্রী পূর্ব্বের ন্যায় কোমল ও সুন্দরই রহিয়াছে। সংসারের কঠোরতা এখনও এই যুবাতে কিছুই লক্ষিত হয় না। আজ দিলীপের হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন, মুখ মলিন। সন্ন্যাসী পীড়িত হইয়া অবধি ইহাঁর মনে সুখ নাই। দিলীপ এখন কাঁদিতে ছিলেন ও রোগীকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রদীপ উত্তেজিত করিয়া দিতেছিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "জল," দিলীপ তাঁহার মুখে একটু জল দিয়া বলিলেন "এখন ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে, এখন একটুকু

খান।” এ ঔষধ সন্ন্যাসীর স্বহস্ত-প্রস্তুত। তিনি আপন রোগের আপনি চিকিৎসা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন “না আর খাইব না। ঔষধে আর কিছু করিতে পারিবে না। আর একটুক জল।” দিলীপ আর একটুক জল মুখে দিয়া আবার বলিলেন “পিতঃ! আপনি ওকথা বলিতেছেন কেন? আপনি ভিন্ন আপনার এই অনাথ সন্তানের আর কেহ নাই, তাহা কি আপনি জানেন না?”

সন্ন্যাসী। “আমি তোমার পিতা নহি। আর আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না। এত দিন তোমাকে লইয়া সন্তানের সাধ পূর্ণ করিলাম বটে, কিন্তু মরিবার সময় আর তোমার ভ্রম রাখিতে চাই না।”

দিলীপ। “আজ আপনি একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, পুত্রকেও আজ অপর বলিয়া বোধ হইতেছে।”

সন্ন্যাসী। “না,—আমি জ্ঞানশূন্য হই নাই। আজ তোমাকে সব খুলিয়া বলিব, তাহা হইলে আর তুমি ও কথা বলিবে না। আর কথা কহিতে পারিতেছি না, আর একটু জল।”

দিলীপ জল মুখে দিয়া বলিলেন “পিতঃ! ক্ষান্ত হউন, আর কথা কহিতে হইবে না। শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন।”

সন্ন্যাসী। “জল খাইয়া আমার শ্রান্তি দূর হইল, এখন বলিতে পারিব, শুন। তুমি মধ্যে মধ্যে কথা কহিয়া, বাধা দিয়া বিলম্ব করিলে আর বলিবার শক্তি থাকিবে না। চিতোর নগর আমার জন্মভূমি, আমি এক ধনাঢ্য বণিকের

সন্তান। পিতা বাণিজ্য করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। আমি তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়ের অধিকারী হইলাম ও বাণিজ্য চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার হস্তে তাহা উত্তমরূপে চলিল না। লাভ না হইয়া লোকসান হইতে লাগিল। ক্রমে পিতার ধনসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল তাহাও এই সঙ্গে গেল। আমি একবারে নিঃ-সম্বল হইয়া পড়িলাম। মহাজনে বাড়িঘর সকল বিক্রয় করিয়া লইল। আমরা অকূল পাথারে ভাসিলাম। জল জল আর বলিতে পারি না" দিলীপ জল মুখে দিয়া বলিলেন "না, আর বলিতে হইবে না। আপনি আমার পিতা নহেন বিশ্বাস করিলাম।"

সন্ন্যাসী। "না, আমার বলিতেই হইবে। তুমি বিশ্বাস কর নাই, আমাকে থামাইবার জন্য ওকথা বলিতেছ।" জল খাইয়া তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। কথা কহা তাঁহার পক্ষে উত্তরোত্তর কষ্টকর হইতে লাগিল। তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন—"তাহার পর সেই দুঃখের সময় আবার আমাদের দুঃখ ঘটিল। একমাত্র পুত্রকে হারাইলাম। গৃহিণী তাহার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি উন্মত্ত-প্রায় হইয়া সন্ন্যাসীবেশে নগরে নগরে বনে বনে বেড়াইতে লাগিলাম।" সন্ন্যাসীর জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে দিলীপের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তিনি সন্ন্যাসীর

মুখে আবার জল দিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "একদিন রাত্রে ঝড়ের পর আমি নদীতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে ছিলাম, দেখিলাম তীরে একস্থানে একটি মৃত বালক পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত বলিয়া সঙ্কুচিত না হইয়া আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলাম, ক্রোড়ে করিয়া দেখিলাম তাহার জীবন তখনো অবসান হয় নাই। তাহাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সজ্ঞান করিতে চেষ্টা করিলাম। ক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম। বালক জীবন প্রাপ্ত হইল। সেই বালক আমার এই দিলীপসিংহ! জল।" জলপান করিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "যে বস্ত্র পরিধান করিয়া তুমি জলনিমগ্ন হইয়াছিলে, তাহা আমি যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি। তোমার বংশ সপ্রমাণ করিতে তাহা কাযে লাগিতে পারে। তাহার পর, তোমাকে পাইয়া আমার আবার সংসারের প্রতি মমতা জন্মিল। আমি সেই-খান হইতে চলিয়া আসিয়া এইখানেই আছি। আজি জনমের মত চলিলাম।" সন্ন্যাসী এই বলিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল আর কথা কহিতে পারিলেন না। দিলীপ বলিলেন "আপনি আমার জন্মদাতা না হইয়াও আমার পিতা। এইকথা শুনিবার পূর্ব্বে আপনাকে যেমন পিতা-জ্ঞান করিতাম এখনো তাহাই করিব।" আহ্লাদে সন্ন্যাসীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন "বৎস, আমি একটি অতি অন্যায় করিয়াছি। আপন সুখের জন্য তোমার

যথার্থ পিতাকে তোমাহইতে বঞ্চিত করিয়াছি।” দিলীপ বলিলেন “আপনি তো আমার যথার্থ পিতা কে, জানিতেন না?”

সন্ন্যাসী। “জানিতাম না কিন্তু জানিবার উপায় ছিল, তোমার কণ্ঠের কবচে তোমার নাম অঙ্কিত ছিল। সেই নাম বলিয়া তোমার পিতার অনুসন্ধান করিতে পারিতাম। কিন্তু তোমাকে আমার কাহাকেও দিতে ইচ্ছা না থাকায় তাহা করি নাই। তোমার পিতাকে দিলে তুমি ইহা অপেক্ষা অনেক সুখী হইতে।” দিলীপ বলিলেন “আপনি তাহা কি প্রকারে জানিলেন?”

সন্ন্যাসী। “তোমার পিতা কে, তাহার আমি একবার আভাস পাইয়াছিলাম। জল জল।” দিলীপ জল মুখে দিলেন। সন্ন্যাসীর এবার সম্পূর্ণ জর ত্যাগ হইল। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট হইল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে কষ্টে বলিলেন “আরো আছে—নিকট”—দিলীপ বুঝিতে পারিয়া মুখের নিকট কর্ণ লইয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী কষ্টে বলিলেন “স্বর্ণ কবচে—তোমার যথার্থ নাম।” তাঁহার এবার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। তিনি জল পান করিয়া আবার বলিলেন “তুমি—চিতোর—”সন্ন্যাসীর কথা বন্ধ হইয়া গেল। কণ্ঠশ্বাস আরম্ভ হইল। যাহা বলিতে গিয়াছিলেন তাহা শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুদিয়া জল পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। অল্পক্ষণ

পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। দিলীপ দেখিলেন তিনি মৃত মনুষ্যের নিকট বসিয়া আছেন। প্রথম মনোবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, একেলা কি প্রকারে তাঁহার সৎকার করিবেন তাঁহার এই চিন্তা হইল। দিলীপ সন্ন্যাসীর মৃতদেহ বস্ত্র-দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া, শবদাহন নিমিত্ত একটা চিতা প্রস্তুত করিতে সেই রাত্রে কুটীরের বাহিরে গমন করি-লেন। পর্ব্বতের একটি প্রশস্ত স্থানে চিতার আয়োজন করিয়া সেখানে লইয়া যাইবার জন্য গৃহে আসিয়া শব তুলিতে গেলেন। অত্যন্ত ভার বোধ হইল, তুলিতে সক্ষম হইলেন না। আবার চেষ্টা করিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি অবশেষে নিরাশ হইয়া শবের নিকট একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া সেইখানে শয়ন করিলেন। মনের কষ্টে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে গভীর নিদ্রা আসিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিল। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিলেন পূর্ব্বরাত্রে যেখানে যে দ্রব্য ছিল আজও তেমনি রহিয়াছে, কিছুই স্থানান্তর হয় নাই। তিনি আবার শব উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, এবারও পূর্ব্বকার ন্যায় চেষ্টা নিষ্ফল হইল। ভাবিলেন, কিছু পরে নিকটস্থ গ্রামে সাহায্য যাজ্ঞা করিতে যাত্রা করিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যতাপে পথে চলা দুঃসাধ্য। যাহাদের কবল না চলিলে নহে, তাহারাই সূর্য্যকিরণকে তাচ্ছিল্য করিয়া পথে চলিতেছে। এমন সময় সেই পাহাড়পথ দিয়া কবিচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য অশ্বপৃষ্ঠে দিল্লী গমন করিতেছিলেন। রৌদ্রে তাঁহার সমস্ত কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, দেখিলেই মনে হইতে পারে পথকষ্টে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি শিলাতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিতে গেলেন। অনাথ দেখিল এই সুযোগে সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইতে পারে, সে বলিল "আরো কিছু দূরে একখানি কুটীর আছে, এখানে না নামিয়া সেই খানে যাইলে আপনি উত্তমরূপে বিশ্রাম করিতে পাইবেন। কবিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কোন্ দিকে!" অনাথ যে দিকে বলিল, তিনি সেই দিকে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি কুটীর দেখিতে পাইয়া সত্বর সেই কুটীরাভিমুখে আসিলেন। দ্বার মুক্ত দেখিয়া ভৃত্যের হস্তে অশ্বের রজ্জু দিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, এক জন মনুষ্য বস্ত্রাবৃত হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে কুটীরস্বামী জ্ঞানে তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা জন্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলেন। গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে

কুটীরে আশ্রয় লওয়া তাঁহার উচিত বোধ হইল না। তিনি বলিলেন "আমি পথিক, আপনার কুটীরে ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথায় কুটীরস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তিনি আর একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। তথাপি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখিলেন না। আবার বলিলেন "মহাশয়! এক জন পথিক শ্রান্ত হইয়া আপনার কুটীরে বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছে শীঘ্র উঠুন।" কেহই উত্তর দিল না। তাঁহার আপন স্বরে কুটীর ধ্বনিত হইল, তথাপি কুটীরস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তাঁহার স্বরে গৃহস্বামীর একটী অঙ্গও নড়িল না। পূর্ব্বকার ন্যায় নিস্পন্দই রহিল। কবিচন্দ্র এবার মনে মনে ভীত হইলেন। এ কি প্রকার ঘুম! এতো চিরনিদ্রা নয়? তিনি ধীরে ধীরে কুটীর-স্বামীর একটু মুখাবরণ খুলিলেন। হাত হইতে বস্ত্র আপনি পড়িয়া গেল! অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন তিনি এত-ক্ষণ মৃতের নিদ্রাভঙ্গ জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। এই সময়, অশ্বকে উত্তম স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া, অনাথ ঐ কুটীরে প্রবেশ করিল। দ্বারে পা দিবা মাত্র চন্দ্রশক্তি তাঁহাকে কুটী-রের বাহিরে যাইতে অনুমতি দিয়া আপনিও বাহিরে আসি-লেন। সে আশ্চর্য্য হইল। কবিচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটী রোরুদ্যমান যুবা পুরুষ সেই কুটীরাভিমুখে আসিতেছে। দিলীপ সন্ন্যাসীর সৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে নিকটস্থ গ্রামে গমন করিতেছিলেন। কিছু দূরে গিয়া এক

বার পশ্চাৎ অবলোকন করাতে কুটীরের দ্বারে অশ্ব ও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন। কুটীরে মনুষ্য দেখিয়া আর গ্রামে যাই-বার প্রয়োজন হইল না, দিলীপ এইখানেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। দিলীপকে দেখিয়া অনাথ বলিয়া উঠিল "এ কি সেই বালক এখন এত বড় হইয়াছে? এখানে না দেখিয়া অন্য স্থানে দেখিলে আমি চিনিতে পারিতাম না।" দিলীপও অনাথকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিলে অনাথ বলিল "সন্ন্যাসী কোথায়? তাঁহার শিষ্য কোথায়?" দিলীপকে দেখিয়া কবিচন্দ্র বলিলেন—'আপনি কি কুটীর স্বামী? তাহা হইলে আমাদের অপ-রাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমরা পথিক; রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি।" দিলীপ কবিচন্দ্রের কথায় কাণ না দিয়া অনাথকে বলিলেন "হায়! আজ সে দিন নাই তুমি যখন আমাদের তিন চারি জনকে একত্রে সুখে কালযাপন করিতে দেখিয়াছিলে—সে দিন নাই পিতার শিষ্য কন্যাকে লইয়া অনেক দিন এই কুটীর হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কাল পিতাও এখান হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। এখন আমিই একাকী এই কুটীরবাসী। এখন আমার কুটীর শূন্য, হৃদয় শূন্য। এই সকল বলিতে বলিতে তাঁহার গত শোক উথলিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা তিনজনে সন্ন্যাসীকে স্কন্ধে করিয়া দাহন করিতে

গমন করিলেন। বাহন করা হইলে বিশ্রাম করিতে আবার তিনজনে কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। যুবার সম্বন্ধে কবিচন্দ্রের কত কথাই মনে হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন "এমন সুন্দর পুরুষ রাজসভায় না থাকিয়া কুটীরস্বামী কেন? ইনি অবশ্য কোন ভদ্রকুলোদ্ভব হইবেন, ছদ্মবেশে এখানে আছেন। আমি অপরিচিত, বিশেষ বন্ধুত্ব না জন্মিলে পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে জিজ্ঞাসা করিলে হানি কি? কবিচন্দ্র তাঁহার ঔৎসুক্য গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাকে দেখিয়া ছদ্মবেশী পুরুষ বোধ হইতেছে। এ স্থান বোধ হয় আপনাদের যথার্থ বাসস্থান নহে? আপনারা কত দিন হইতে এই খানে বাস করিতেছেন?"

দিলীপ। "আমি বাল্যকাল হইতে এইখানেই আছি।"

চন্দ্র। তবে আপনার এইখানেই জন্ম হইয়াছিল?

দিলীপ। "না, এখানে আমার জন্ম হয় নাই, কিন্তু আমার জন্মস্থান কোথা তাহাও আমি জানি না।"

চন্দ্র। "কেন? আপনার পিতা সন্ন্যাসীর নিকট আপনি কিছু শুনেন নাই?"

দিলীপ। "তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিলাম তিনি আমার আপন পিতা নহেন। অসহায় অবস্থায় আমাকে পাইয়া এখানে আনিয়া সন্তানতুল্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন বিশেষ আর কিছু বুঝিতে পারিলাম

না।” কবিচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন “তবে সন্ন্যাসী আপনার যথার্থ পিতা নহেন ?”

দিলীপ। “না।”

চন্দ্র। “তবে আপনার যথার্থ পিতা কে ?”

দিলীপ। “তাহা আমি জানি না। আর জানিবার উপায়ও নাই। পিতা মৃত্যুকালে বলিতে গিয়াছিলেন কিন্তু জীবন শেষ হইয়া আসাতে আর বলিতে পারিলেন না।” দিলীপের কথায় কবিচন্দ্রের আর তাহার পরিচয় পাইবার আশা রহিল না। কবিচন্দ্র কিছু পরে বলিলেন “সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইয়াছে, এখন আপনি একাকী হইয়া পড়িয়াছেন ?” দিলীপ বলিল “হাঁ।”

চন্দ্র। “আপনাকে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি কিন্তু বলিতে কি—আপনার যদি আর কেহ এখানে না থাকে তবে আর এখানে কাহার জন্য থাকিবেন ?” দিলীপ বলিলেন “তাহা আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু কোথায় যাইব?” কবিচন্দ্র সহর্ষে বলিলেন “আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি সঙ্গে করিয়া দিল্লী লইয়া যাই।” যুবা তাহাতে সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে ?”

চন্দ্র। “আপনার যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। যদি যুদ্ধ করিতে পারেন তবে আগামী যুদ্ধে এক সেনাপতি হইতে পারিবেন।” যুবা আগামী যুদ্ধের ব্যাপার কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। কি প্রকারেই বা জ্ঞাত হইবেন;

হইয়া গিয়াছে, সে এখন পরস্ত্রী, তাহার প্রতি অনুরাগ এখন অধর্ম্ম।”

চন্দ্র। “তাহার আশ্রয়দাতার সহিত এখনো তাহার বিবাহের স্থিরতা নাই। অজ্ঞাতকুলশীলা বলিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিতে কর্ত্তৃপক্ষের মত নাই।”

যুবা। “তাহা হইলে কি হয়, শৈলবালার মত আছে তো? তাহা হইলেই যথেষ্ট।”

চন্দ্র। “না, তাহার ইচ্ছা নাই।” এই কথায় যুবা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্র সে কথা আর উঠাইতে না দিয়া বলিলেন “তবে আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন?”

দিলীপ। “হাঁ যাইব।”

চন্দ্র। “তবে সঙ্গে কি লইবেন লউন, আমার শ্রান্তি দূর হইয়াছে।” দিলীপ সন্ন্যাসীর কথামতে তাহার জল-নিমগ্ন বস্ত্র বাহির করিয়া, বাঁধিয়া লইয়া বলিলেন “যাহা লইবার তাহা লইয়াছি। আর তো এখানে লইবার মত কিছুই দেখিতেছি না। আর একটি প্রিয় বস্তু আমার আছে বটে, কুটীরের বাহিরে গিয়া তাহাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।”

কবিচন্দ্র বলিলেন “তাহা কি?”

দিলীপ “ভীম।”

চন্দ্র। “ভীম কে?”

দিলীপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার অশ্ব।"

সেই দিন রাত্রে উহাঁরা দুইজন ও ভৃত্য, পাহাড়ের নীচে পঁহুছিয়া একটি পান্থশালায় শয়ন করিয়া রহিলেন। পর দিন প্রাতে কবিচন্দ্র দিলীপকে বলিলেন "আমি দিল্লী যাওয়া আপাততঃ রহিত করিলাম। কাল রাত্রে সঙ্কল্প করিয়াছি এখান হইতে প্রথমে গুপ্তবেশে যবন-শিবিরের কি প্রকার অবস্থা সন্ধান লইয়া পরে দিল্লী গমন করিব। তাহাতে আমার কিছু দিন বিলম্ব হইবে। তুমি অদ্যই দিল্লী যাও। কবিচন্দ্রের নিকট হইতে যাইতেছ বলিলে পৃথ্বীরাজ তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। বরং তাঁহার নিকট তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক পত্র দিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহার ভৃত্য অনাথকেও তাঁহার যবন-শিবিরে গমনের ইচ্ছা বলিয়া আজমীর ফিরিয়া পাঠাইলেন।

তিন জনে তিন পথে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

শতদ্রু নদীর তীরে যবন-শিবির সন্নিবেশিত। মহম্মদ ঘোরি সভাসদবর্গে বেষ্টিত হইয়া কি প্রকারে দিল্লী আক্রমণ করিবেন তাহার পরামর্শ করিতেছেন।

এখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব, প্রখর কান্তির পরিবর্ত্তে নিস্তেজ স্বর্ণময় রশ্মি বিতরণ করিতেছেন। বায়ুও এখন বড় উষ্ণ নাই, তাহা ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে। এখন শ্রান্ত ক্লান্ত মানবগণ অধীর হৃদয়ে নিদাঘের সন্ধ্যাকাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহাদের পরামর্শ স্থির হইলে মহম্মদ ঘোরি বলিলেন "এবার যে কৌশল স্থির হইল বোধ হয় এবার আমরা রণজয়ী হইব। গতবার যুদ্ধে আমরা হিন্দুদের উত্তম রূপে চিনিয়াছি, সম্মুখ যুদ্ধে ও ন্যায় যুদ্ধে উহাদের পরাজয় করা সুহজ নহে। কিন্তু সেই জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করিলাম, তাহাতে এবার জয়ের আশা হইতেছে।" সভাসদবর্গ সকলেই মহম্মদঘোরির সহিত একমত হইয়া বলিয়া উঠিল "হাঁ হাঁ, আপনি যে কৌশল করিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয়ই রণজয় হইবে।" মহম্মদ ঘোরি বলিলেন "হিন্দুগণ যেরূপ নানাবিদ্যায় পণ্ডিত, গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাহারা যেরূপ বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়াছে, তেমনি সাংসারিক বিষয়ে অনেক সময় তাহাদের ঘোর মূর্খ দেখা যায়। ধূর্ত্ততা ও আবশ্যকমত মিথ্যা কথা দ্বারা যে কত উপকার পাওয়া যায় তাহা হিন্দুগণ এখনো বুঝিতে পারে নাই। প্রাণ-সত্বে তাহারা মিথ্যা বলিতে চাহে না, অন্য সকল দূরে যাউক, যুদ্ধেতেও ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন অন্য প্রকারে যুদ্ধ করিতে তাহাদের কখনও দেখা যায় নাই। অন্যায় যুদ্ধ ভিন্ন ন্যায় যুদ্ধে উহাদের কেহ কখন পরা-

জিত করিতে পারে নাই। বীরচূড়ামণি সেকন্দর সা, পারস্য প্রভৃতি নানা দেশ বিনা কষ্টে পরাজয় করিয়াও হিন্দুবীর পুরুরাজার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই। তিনিও তাঁহাকে অন্যায় সংগ্রামে পরাজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা যদি জয় করিতে পারি তো অন্যায় যুদ্ধে ও কৌশলে।" সভাস্থ সকলে বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! হিন্দুরা এরূপ নির্ব্বোধ! যুদ্ধেতেও তাহারা ধর্ম্ম রাখিয়া চলে! তবে তো আমাদের নিশ্চয়ই রণে জয় হইবে। আমরা তাহাদের মত নির্ব্বোধ নহি বলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।" মহম্মদ ঘোরি বলিলেন "আমাদের যে সকল বীর পূর্ব্বপুরুষেরা সাগর পারে গিয়া পশ্চিম দেশেও অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কোরাণের সত্য ধর্ম্ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই সকল বীরেরা হিন্দুর সহিত ক্রমান্বয়ে তিন শত বৎসর যুদ্ধ করিয়াও কি কৌশলে কি ধূর্ত্ততায় কোন রূপে ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন নাই। আমি যে কেবল গতবার পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছি, এমন নহে। হিন্দুদের সহিত প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার তিন শত বৎসর পরে প্রথম মামুদ গাজনি ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই অবধি এতদিন পর্য্যন্ত আর আমরা উহাদের পরাজয় করিতে পারিলাম না। সেই জন্য বলিতেছি, ধর্ম্মনিষ্ঠ অথবা নির্ব্বোধ হিন্দুদিগকে ন্যায়-

যুদ্ধে পরাজয় করা আমাদের সহজ হইবে না। কিন্তু হিন্দুদের অন্য বিষয়ে যত বুদ্ধিই থাকুক আমাদের কৌশলে কখনই পারিবে না। উহারা যেরূপ ধর্ম্মভীরু, আমরা অন্যায় যুদ্ধ করিলেও তাহারা ন্যায় যুদ্ধ ছাড়িবে না, সেই জন্য এবার আমাদেরই জয়ের সম্ভাবনা। সেই সকল আশাতেই আবার আমরা এখানে আসিয়াছি।"

এই সময় একজন প্রহরী আসিয়া মহম্মদঘোরিকে অভিবাদন করিয়া বলিল "একজন হিন্দু আসিয়া আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। আমরা তাহাকে চর বলিয়া ধৃত করিয়াছি।"

মহম্মদ। "যদি সে চর হয় তাহাকে বন্দী করিয়া রাখ, এখানে আনিবার আবশ্যক নাই।"

প্রহরী। "বন্দী বলিতেছে সে চর নহে।"

মহম্মদ। "চর হইলেই বা সে বলিবে কেন? আর চর হউক আর নাই হউক, আমাদের স্বার্থ সাধন জন্য হিন্দুমাত্রকেই বন্দী করা আবশ্যক। তুমি যাও, তাহাকে বন্দী করিয়া রাখ।"

এই শুনিয়াও প্রহরী না যাওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন কথা আছে?" প্রহরী বলিল "বন্দী বলিতেছে তাহাকে বন্দী করিলে আপনার মঙ্গল সম্ভব নাই।"

মহম্মদ ঘোরি সক্রোধে বলিলেন "কি! তাহাকে আমার

ভয় করিয়া চলিতে হইবে! তাহাকে বন্দী করিলে কি হইবে?"

প্রহরী। "সে বলিতেছে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ হইবে না?"

মহম্মদ। "যুদ্ধের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?"

প্রহরী। "সে বলিতেছে আমাদের যুদ্ধে জয় করাইয়া দিতে পারে।"

মহম্মদ। "কি প্রকারে?"

প্রহরী। "সে তাহা বলিল না। সে তাহা আপনার নিকট বলিতে চায়। যাহা বলিয়াছে তাহাও অনেক কষ্টে বলিয়াছে। না বলিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না বলায় অতটুক বলিয়াছে।"

মহম্মদ ঘোরি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। প্রহরী হিন্দুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইল। হিন্দু যে বিজয় ভিন্ন আর কেহ নহেন তাহা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। মহম্মদ ঘোরি বিজয়কে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?"

বিজয়। "আপনার উপকার করিতে আসিয়াছি।"

মহম্মদ। "আপনি হিন্দু হইয়া যবনদিগের উপকার করিতে আসিয়াছেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

আপনি উপকার কাহাকে বলেন বলুন?”

বিজয়। “আপনি জানেন দিল্লী জয় আপনার দুরাশা? গতবারে দৈব ক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন, এবার তাহা পারিবেন না, সেখানে যাইলে আর রক্ষা পাইবার সম্ভব নাই।”

মহম্মদ। “তাহাতে স্বীকৃত হইয়াই আমরা আসিয়াছি। আপনি কি আমাদের ভয় প্রদর্শন করিতে এখানে আসিয়াছেন?”

বিজয়। “না। আপনাকে যে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাহাকে আমি জানি, তাহাই বলিতে আসিয়াছি।”

মহম্মদ। “সে কে?”

বিজয়। “আমি।”

মহম্মদ। “আপনি! আপনি তবে কে?” বিজয় এই কথায় চিন্তিত হইলেন। তাঁহার পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিলেন “আমি কে আপনার তাহা জানিয়া কি হইবে। আমি যে হই না কেন, আমার সাহায্যে আপনি জয় লাভ করিতে পারিবেন।”

মহম্মদ। পরিচয় না জানিলে আপনার কত দূর ক্ষমতা কি প্রকারে বুঝিব? আপনার উপর যদি জয় পরাজয়ের জন্য নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে আপনার পরিচয় না জানিলে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি না।” বিজয় দেখিলেন পরিচয় না দিলে উপায় নাই, তথাপি মহম্মদ

ঘোরি কি বলেন, দেখিবার জন্য বলিলেন "কিন্তু যদি আমি পরিচয় না দিই?"

মহম্মদ। "তবে আপনি আমাদের বন্দী।" বিজয়ের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন "আমি কে আপনি শুনিতে চান? আমি দিল্লীশ্বরের অমাত্য-পুত্র বিজয়সিংহ।" পরিচয় শুনিয়া এক জন সভাসদ্ বলিয়া উঠিল "ঠিক ঠিক, মন্ত্রী-পুত্র বিজয়-সিংহই বটে, আমি ইঁহাকে চিনি। আর বার দূত হইয়া আমি যখন দিল্লীশ্বরের সভায় গমন করিয়াছিলাম, তখন উহাঁদের পরিচয় জানিয়া আসি। চিনি চিনি করিয়া এত ক্ষণ উহাঁর নাম মনে পড়িতেছিল না। এখন উহাঁর কথায় মনে পড়িল!" বিজয় যে যথার্থ মন্ত্রীপুত্র, সভাসদের কথায় তাহা প্রমাণ হইল। মহম্মদ ঘোরি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সাহায্য করিলে তাঁহাদের জয় লাভের সম্ভাবনা। তিনি সেই জন্য এখন বিজয়কে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। স্বভাবতঃ দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব দেখাইতে এবং অনুগ্রহ-প্রার্থীদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে যবনেরা যেরূপ পটু, আবার তেমনি তাহারা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট নত হইতে ও স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত অতি সামান্য ব্যক্তিরও মনস্তুষ্টি করিতে এত পটু যে ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই এরূপ কৌশলে তাহাদিগের নিকট পরাজয় মানিতে হয়।

বিজয় হইতে উপকার পাইতে পারেন দেখিয়া, মহম্মদ

ঘোরি এখন পূর্ব্বকার ন্যায় গর্ব্বিত স্বর ছাড়িয়া বিনীতস্বরে বলিলেন "আপনার পরিচয় পাইবার নিমিত্তই আমায় ঐরূপ কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমার নিকট আপনার বন্দী হইবার কোন ভয় নাই।" বিজয় এই কথায় মনে মনে হাসিলেন। এবার চতুরের নিকট চতুরতা। কিন্তু বিজয় মহম্মদ ঘোরির কপটতা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার বিনীত স্বরে সন্তুষ্ট হইলেন। যে প্রকারে হউক, মহম্মদ ঘোরির জয় হইল। বিজয় ভাবিলেন, মহম্মদ ঘোরি ঠকিলেন। মহম্মদ ঘোরি বলিলেন "আপনি আমাদের কি প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন।"

বিজয়। "আপনি বোধ হয়, মনে করেন নাই, একজন বিধর্ম্মী স্বার্থশূন্য হইয়া আপনার মঙ্গল চেষ্টায় এখানে আসিয়াছে?"

মহ। "না, আমি তাহা মনে করি নাই। আমাদের উপকার করিয়া আপনিও উপকার প্রত্যাশা করেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি।"

বিজয়। "তবে আপনারা যদি যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আমি কি আশা করিতে পারি?"

মহ। "আপনি কি আশা করেন?"

বিজয়। সিংহাসন।"

মহ। "তাহা হইলে আমাদের যুদ্ধে লাভ কি?

কেবল কতকগুলা লোকের রক্তপাত করাই কি আমাদের উদ্দেশ্য ?"

বিজয়। "না, আপনারা যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলে পূর্ব্ব অপমান শোধ দিতে পারিবেন ও তাহা ব্যতীত অনেক ঐশ্বর্য্য লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আর আমি না সাহায্য করিলে তাহার কোন আশা নাই।" মহম্মদ ঘোরি হাসিয়া বলিলেন "এবার আমরা হিন্দুসৈন্য অপেক্ষা কত অধিক সৈন্য আনিয়াছি দেখিয়াও আপনি ওরূপ বলিতেছেন কেন ? এত সেনাতেও আমরা আপনার সাহায্যব্যতীত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

বিজয়। "আপনাদের সহস্রগুণ অধিক সেনা থাকিলেও বীর হিন্দুসেনার নিকট আমার সাহায্য ব্যতীত জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। আপনি আমার সাহায্য না লইতে চান, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া বিজয় উঠিলেন। মহম্মদ-ঘোরি বলিলেন "আচ্ছা, আপনার কথাই যদি সত্য হয়, আমরা যদি আপনার সাহায্য লইতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে কি সিংহাসন ব্যতীত আর কিছুতেই তাহা দিবেন না ?"

বিজয়। "না" মহম্মদ ঘোরির মুখ এবার আরক্ত হইল, ললাট, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দেখিলেন নিতান্ত নরম হইলে এস্থলে চলিবে না। বলিলেন "কিন্তু আপনি ইচ্ছাক্রমে সম্মত না হইলে বিপাকে পড়িয়া আপনাকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। কারণ, এখন আপনি আমাদের

হস্তে পড়িয়াছেন, আমরা আপনার হস্তে নাই। আপনি আমাদের সাহায্য না করেন তো পৃথ্বীরাজকে বলিব, আপনি আমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাহা হইলে আর দেশে যাইতে পারিবেন না।' এখন বুঝিয়া দেখুন, আমাদের সাহায্য করা ভিন্ন আপনার আর উপায় নাই।"

বিজয় দেখিলেন সত্য সত্যই তিনি তাহাদের কবলে পড়িয়াছেন। পরের মন্দ করিতে গিয়া আপনিই ফাঁদে পড়িয়াছেন। ক্রোধ, হিংসা ও লোভের বশীভূত হইয়া এইখানে আসিবার অগ্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। মহম্মদ ঘোরি বিজয়ের পরিচয় প্রাপ্ত না হইলে একটু সাহস থাকিত, এখন তাহাও নাই। মহম্মদ ঘোরির প্রস্তাবে সম্মত না হইলে অনায়াসে এখন তিনি বিজয়ের কথা পৃথ্বীরাজের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। যে ভয়ে তাঁহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা ছিল না তাহাই হইল। তিনি এখন বিপাকে পড়িয়া বলিলেন "তাহাতে না হয় আমিই যাইব, আপনাদের তো কিছুই লাভের আশা নাই"। মহম্মদ ঘোরি কোন প্রকারে বিজয়কে আপন করে আনিতে না পারিয়া অগত্যা বলিলেন "তাহা সত্য বটে। আচ্ছা আপনি রাজা হইবেন। কি প্রকারে সাহায্য করিবেন বলুন?"

বিজয়। "যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে থাকিয়া কোনমতে তাহাদের যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রাখিব, আপনি সেই সুযোগে জয় করিতে পারিবেন।"

মহ। "এ উত্তম উপায় নহে;"

বিজয়। "তবে আমি উপায় স্থির করিয়া আজ হইতে ১৫ দিন পরে আপনাকে জানাইব। এখন আপনার কথায় বিশ্বাস কি?"

মহ। "আমি অঙ্গীকার করিতেছি"। বিজয় ভাবিলেন 'মুসলমানদের আবার অঙ্গীকার! কিন্তু যখন এখানে আসিয়াছি, তখন উহাদের হস্তে পড়িয়াছি। এখন উহাদের কথায় অবিশ্বাস দেখান যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় মহারাজের নিকট প্রকাশ করিবে। আমি দুই দিকু হইতেই মারা যাইব।" এই ভাবিয়া বিজয় বলিলেন 'অঙ্গীকার করুন।" মহম্মদঘোরি অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন 'যদি যুদ্ধে জয় হয় তো আপনি ভবিষ্যৎ রাজা হইবেন। কিন্তু যদি আপনি অঙ্গীকারচ্যুত হন, তাহা হইলে প্রাণপণ করিয়াও আপনাকে শাস্তি দিব, ও আপনার বিশ্বাসঘাতকতা রাজার নিকট প্রকাশ করিব।" মহম্মদঘোরি মুখে এই কথা বলিয়া মনে মনে বলিলেন "তুমি তোমার রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, সুযোগ পাইলে আমাদের প্রতিও করিবে, তোমাকে বিশ্বাস নাই। যুদ্ধে জয় হইলে রাজা হইবে আশা করিতেছ। যদি প্রাণদান করি তাহা হইলেই আশাধিক পুরস্কার, আবার তাহা হইতেও অধিক আশা!"

বিজয় বলিলেন, "আমি এখন রাজপুতানা হইতে দিল্লী

গমন করিতেছি। আজ হইতে পনর দিন পরে রাত্রে দিল্লীস্থ পর্ব্বতে আপনার লোকের জন্য অপেক্ষা করিব। যাহা উপায় স্থির করিব তাহাকে দিয়া আপনাকে বলিয়া পাঠাইব। ক্রমে আপনারা অগ্রসর হইতে থাকুন।"

মহম্মদ। "রাজপুতানার সকল রাজগণই কি সাহায্যার্থে আসিবেন?"

বিজয়। "এখন তাঁহারা লিখিয়াছেন আসিব। কিন্তু আমি কথায় কথায় তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাব জানাইয়াছি যে, তাঁহাদের সাহায্যে আমাদের তেমন প্রয়োজন নাই। তবে যত অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা যায় ততই ভাল, এই জন্যই আমরা তাঁহাদের সাহায্য যাচ্ঞা করিতেছি। আমার এই কথায় যখন তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, তখন যে আবার তাঁহারা স্বস্ব দেশ ত্যাগ করিয়া বৃথা দিল্লী আসিবেন, ইহা সন্দেহস্থল। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যাহাতে নিশ্চয় দিল্লী আসেন এই চেষ্টা করিতে আবার আমার তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইত, কিন্তু আমি জানি আপনি আমার কথায় সম্মত হইবেন, সেই জন্যই ঐরূপ করিয়া আসিয়াছি।"

মহম্মদ। "সকলেই আসিতে চাহিয়াছেন?"

বিজয়। "হাঁ। কিন্তু জয়চন্দ্র ও পত্তনরাজ আসিবেন না, তাঁহাদের নিকট আমরা সাহায্যও চাহি নাই।"

মহম্মদ। "জয়চন্দ্র তো যাহাতে দিল্লীশ্বরের অপমান

হয়, এরূপ করিতে আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন ও গোপনে গোপনে তিনিও আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।”

বিজয়। “হাঁ, তিনি মহারাজের শত্রু তাহা আমরা জানি।” এই বলিয়া বিজয় সেখান হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রিবর! দেখ, তুমি যাহাকে অধিক বিশ্বাস-পাত্র বোধ করিয়াছিলে সে কেমন বিশ্বাসের কার্য্য করিল!

বিজয় চলিয়া যাইলে একজন সভাসদ বলিল “আপনি উহাকে রাজ্য দিতে চাহিলেন, তাহা হইলে আর আমাদের দিল্লী অধিকার হইল কি?”

মহম্মদ ঘোরি বলিলেন “উহার সাহায্যে তো আমরা জয়লাভ করি, তার পর রাজ্যদান করা পশ্চাতের কথা। সে তো এখন উহাই বিশ্বাস করুক।”

এদিকে ঘটনা বশতঃ অদ্যই কবিচন্দ্র যবনশিবিরের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে শিবিরের অবস্থা দেখিতে-ছিলেন। হঠাৎ হিন্দুবেশধারী একজনকে যবনশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। সে কে? কি জন্য আসিয়াছে?—জানিতে উৎসুক হইলেন। তিনি শিবিরের নিকটে লুক্কায়িত ভাবে দেখিবার কোন স্থান আছে কি না সন্ধান করিয়া দেখিলেন শিবিরের পশ্চাৎ-ভাগে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। তিনি আস্তে আস্তে পর্ব্বত

হইতে নামিয়া অনেক কৌশলে ও অতি সাবধানে প্রহরী-দিগের হস্ত হইতে এড়াইয়া সেই বটবৃক্ষে উঠিলেন। তিনি যখন বিজয়কে যবনশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া-ছিলেন, তখনও অল্প সূর্য্যালোক ছিল। তাঁহার নামিতে নামিতে সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার হওয়াতে লুকাইয়া বট-বৃক্ষে উঠিবার তাঁহার আরো সুবিধা হইল। বটবৃক্ষের যে শাখাটি শিবির স্পর্শ করিতেছিল তিনি সেই শাখাটিতে উঠিয়া, তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ দিয়া অল্পে অল্পে তাম্বুর বস্ত্রে একটু ছিদ্র করিলেন। তাহাতে একটি চক্ষু দিয়া তিনি তাম্বু মধ্যস্থ সকল দেখিতে পাইলেন। মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন "বিজয় এখানে কেন?" বিদায়ের অগ্রে মহম্মদঘোরির সহিত বিজয়ের যে কথা হইল, তিনি কেবল তাহাই শুনিতে পাইলেন। কিন্তু-যাহা শুনিলেন তাহাতেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মনে করি-লেন শিবিরে গিয়াই তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দর্শিবে বোধে, আপাততঃ সে ইচ্ছা হইতে ক্ষান্ত রহিলেন। তিনি বৃক্ষ হইতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। মনের চাঞ্চল্য হেতু উঠিবার মত নিঃশব্দে নামিতে পারিলেন না। একটু পত্রের মর্ মর্ শব্দ হইল। উঠিবার সময় দৈবাৎ যেমন প্রহরীদিগের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে পারিয়াছিলেন, এবার আর তাহা হইল না।

বারম্বার ধূর্ত্ত যবনদিগের হস্ত কৌশলে এড়ান বড় সহজ নহে। শব্দ শুনিয়া একজন প্রহরী কিসের শব্দ অনুসন্ধান করিতে এইদিকে আগমন করিল। চন্দ্রপতির দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময় একটু জ্যোৎস্না ফুটিল। তাহার আলোকে প্রহরী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহার চীৎকার শুনিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া শীঘ্রই অধিক সংখ্যক সৈন্য আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। এত লোকের হস্ত হইতে পলায়ন অসম্ভব বোধে চন্দ্রপতি অসি নিষ্কোষিত করিলেন না। ভাবিলেন "এখন যদি আমি উহাদের মারিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি তাহা হইলে আমাকে বধ করিবে। আর আমার মৃত্যু হইলে বিজয়ের কু-মন্ত্রণা অপ্রকাশ্য থাকিবে। তাহা অপেক্ষা বন্দী হইলে কৌশলে পলায়ন করিতে পারিব ও পরে পৃথ্বীরাজকে সবিশেষ বলিতে পারি। অতএব এখন অসি নিষ্কোষিত করা কর্ত্তব্য নহে।"

এদিকে তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া মহম্মদ ঘোরির নিকট আনয়ন করিল। দ্বারদেশে বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিজয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ উথলিয়া উঠিল। হিতাহিত বিবেচনা রহিল না। আরক্ত নয়নে বলিলেন "পাষণ্ড! তুই রাজ্যলোভে দেশের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! ইহার ফল অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবি।" এই বলিয়া কটিস্থ তরবারিতে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন। প্রহরীরা

অমনি তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া কটি হইতে অসি খুলিয়া লইল।

কবিচন্দ্র বিজয়ের মন্ত্রণা শুনিয়াছেন তাহা তাঁহাকে না বলিলে তিনি বিজয়ের দ্বারা মহম্মদঘোরির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু সে পথও তিনি রুদ্ধ করিলেন। বিজয় বুঝিলেন কবিচন্দ্র সকল শুনিয়াছেন। যবনশিবিরে আসিবার মিথ্যা কারণ বলিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবেন না। কবিচন্দ্র মুক্ত হইলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। বিজয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পুনরায় মহম্মদঘোরির নিকট গমন করিলেন। উহাদের চুপে চুপে কি কথা হইল। কবিচন্দ্রকে অতি সতর্কের সহিত বন্দী করিয়া রাখিতে মহম্মদঘোরি প্রহরীকে আজ্ঞা দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তারকাশোভিত চন্দ্রের ন্যায় দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, সভাসদ-গণ বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সুঠাম, নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল ঈষৎ স্থূল, তন্নিম্নে ভ্রমরসংযুক্ত পদ্মকিশলয়বৎ দীর্ঘায়ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, দেখিলেই তাঁহাকে সরল ও চঞ্চল স্বভাবাপন্ন বলিয়া

বোধ হয়, কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সেই চঞ্চলতার মধ্যেও আবার দৃঢ়তার আভাষ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়তেজ ও সরলতায় মিশ্রিত হওয়াতে তাঁহার সুন্দর বদনে আর একটি অলৌকিক সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার বয়ঃক্রম এখনও অধিক হয় নাই, পঞ্চত্রিংশ মাত্র। হায়! এই অল্প বয়সেই তাঁহার সকল সুখে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

নিকটে আর একটি সিংহাসনে কুশাসনোপরি বীরচূড়ামণি যোগীন্দ্র সমরসিংহ আসীন। দেশে যবন আসিয়াছে অথচ পৃথ্বীরাজ যুদ্ধের তেমন বিশেষ কিছুই আয়োজন করিতেছেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, ইহা শুনিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া সসৈন্যে দিল্লী আগমন করিয়াছেন। আমরা সমরসিংহকে যখন শেষ দেখিয়াছিলাম, তাহার পর প্রায় আর বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কালের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাতেও এখন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। এখন আর তাঁহাকে যুবা পুরুষ বলিতে পারা যায় না, এখন প্রৌঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, এখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৮ বৎসর। কিরণসিংহ জলনিমগ্ন হইলে, মুকুট ত্যাগ করিয়া তিনি যে জটাধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই জটা এখন লম্বমান হইয়া মস্তক ছাড়াইয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে ও নিবিড় শ্মশ্রুরাশি ক্রমে সুদীর্ঘ হইয়া তাঁহার বিশালবক্ষ আবরণ করিয়াছে। কেশশ্মশ্রু কতক কতক পক্কও হইয়াছে। তাঁহার গলদেশে একছড়া পদ্মবীজ মালা;—নীলকণ্ঠ-

স্থিত কণ্ঠীহারের ন্যায় তাহা তাঁহার যোগীন্দ্রকণ্ঠে শোভিত হইতেছে। এখনও তাঁহার শারীরিক মানসিক তেজের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত এবা সেই গভীর দুঃখবশতঃ তখন অপেক্ষা তাঁহার মূর্ত্তিতে এখন অধিকতর গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইতেছে। এখন দেখিলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক ভক্তি জন্মে, অধিক ভয়ের উদ্রেক হয়, সেই জটা শ্মশ্রুধারী, পদ্মবীজমালাশোভিত, স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে সহসা একটি তেজস্বী ঋষি মূর্ত্তি মনে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি সমরসিংহ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন, কিন্তু যাহাতে সকলে তাঁহার সদ্গুণ সকল আরো সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়স্থ করিতে পারেন সেই জন্য কবিচন্দ্র তাঁহার গুণের বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমরা তাহা হইতে গুটিকতক কথা পুনরুল্লেখ করিব। কবিচন্দ্র এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন,—সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে মহাসাহসী অথচ বীর ও কৌশলনিপুণ ছিলেন। সভাস্থলে তিনি অতি বিজ্ঞ সুবিবেচক সদ্বক্তা ছিলেন, স্বভাবতঃ অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, সকল সময়েই, সকল বিষয়েই তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সামাজিকতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার অধীনস্থ করপ্রদ রাজগণ ও সৈন্যেরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত, এমন কি, পৃথ্বীরাজের সৈন্য, সামন্তেরাও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ভক্তি করিত। যুদ্ধযাত্রাকালীন তাঁহার ন্যায় শুভাশুভ লক্ষণ সকল কেহই নির্ণয় করিতে পারিত না; রণস্থলে

তাঁহার ন্যায় কেহই সৈন্য সাজাইতে পারিত না, অশ্ব ও অস্ত্র চালনায় কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিত না। যুদ্ধ যাত্রার অগ্রে ও পরে, অথবা যুদ্ধের সন্ধিস্থলে, সমরসিংহের শিবির, সকল সৈনিক পুরুষের সম্মিলনস্থান ছিল, এখানে সকলেই তাঁহার জ্ঞানে উপদিষ্ট ও তাঁহার বাগ্মিতায় পরিতুষ্ট হইয়া যাইত। কবিচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে রাজ্যশাসন, মন্ত্রী নির্ব্বাচন, রাজদূতপ্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সকলই সমরসিংহের রসনা নিঃসৃত, এবং তিনি গল্প বা উপন্যাসচ্ছলে যাহা কিছু নীতি বা ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান, বিশেষতঃ রাজপুতদিগের রাজভক্তি বিষয়ে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন, সে সকলি সমরসিংহ হইতে গৃহীত।" এই সকল গুণের সহিত সমরসিংহের আর একটি প্রধান গুণ ছিল, তিনি একেবারে অহঙ্কারশূন্য ছিলেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় রাজগণ স্ব স্ব প্রাধান্য লাভের জন্য কত বৃথা যুদ্ধে ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু সমরসিংহ স্বার্থলাভের নিমিত্ত ও বৃথা অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করিতে ওরূপ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অথচ যথার্থ আবশ্যক স্থলে ও পরের সাহায্য করিতে তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন সেরূপ কোন রাজাই করেন নাই।

পৃথ্বীরাজের সহিত সমরসিংহের অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি পৃথ্বীরাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রতি যুদ্ধে তাঁহারই আনুকূল্যে দিল্লীশ্বর জয়লাভ করিতেন, কোন বিপদ পড়িলে

অগ্রে তাঁহারই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিতেন,—এমন কি, এইবার যখন সমরসিংহ চিতোর হইতে দিল্লী আসিতেছিলেন তখন পৃথ্বীরাজ তাঁহার আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহার সম্মানার্থে পারিষদবর্গের সহিত সার্দ্ধতিনক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে গিয়াছিলেন। পথে পরস্পর দুই দলে সাক্ষাৎ হইলে পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ সমরসিংহের আগমনে আহ্লাদে জয় জয় নাদ করিতে লাগিল, তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিগুণ বল ও সাহস প্রাপ্ত হইল। শেষে দুই বন্ধুতে পরস্পর সানন্দ চিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন বলিয়া সমরসিংহ সেই খানেই তাঁহাকে কতকগুলি কোমল ভৎর্সনা করিলেন ও উপদেশ দিলেন, শেষে সকলে এক সঙ্গে দিল্লী আগমন করিলেন। আজ তাঁহারা সেইথান হইতে দিল্লী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

এখন সভার চারিপার্শ্বে ও সম্মুখে প্রজাগণ পৃথ্বীরাজের নিকট বিচারপ্রার্থনায় দণ্ডায়মান। ক্রমে বিচার শেষ হইল। প্রজাগণ ন্যায়বান রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে গেল। তখন সমরসিংহ, পৃথ্বীরাজ, সকলে আগামী যুদ্ধের পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাদিগকে যবনদূত আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। ইহা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সভায় আনিতে আদেশ করিলেন।

মহম্মদঘোরি এইবার দিল্লী আক্রমণার্থে আসিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইবার জন্য পৃথ্বীরাজের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন দিল্লীশ্বর তাঁহাকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার প্রত্যুত্তর লইয়া পুনরায় দূত আসিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা যদি কাহারো জানিতে ইচ্ছা হয়, সেই জন্য তাহা অগ্রে বলি। তিনি বলিয়াছেন 'মহম্মদঘোরি কেন ইচ্ছা করিয়া জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিবেন, তাঁহার যদি পূর্ব্বঘটনা স্মরণ থাকে, তবে এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি দয়া করিয়া তাহা হইলে তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিব, ও তিনি যে বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইতে আসিয়াছেন তাঁহাও ক্ষমা করিব।"

অদ্য দূত এই সকল কথার উত্তর লইয়া আসিয়াছে। দূত সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহম্মদঘোরি তাঁহার কথার কি উত্তর দিলেন তাহা পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত করযোড়ে বলিল "মহম্মদঘোরি বলিলেন 'তিনি কি করিবেন, তিনি তো সম্রাট নহেন। তিনি কেবল রাজকর্ম্মচারী মাত্র। সম্রাট তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রা[illegible] চা[illegible] করিয়াও তাহা করিতে হইবে'।" ইহা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ সগর্ব্বে বলিলেন "তবে যদি মহম্মদঘোরি ইচ্ছা করিয়া আপনাদিগের বিপদ ঘটাইতে চান, তবে আসিতে [illegible] কি আর একবার ক্ষত্রিয়তেজ দেখিয়া যাউন।"

পৃথ্বীরাজের কথা শেষ হইলে আর একজন সভার এক পার্শ্ব হইতে বলিয়া উঠিলেন "তাঁহাকে বলিও, আরবার আমরা যবনপরাজয়ের পর হিন্দুরীতি অনুসারে তাহাদিগকে দয়া দেখাইয়াছিলাম। সেই ন্যায়াচরণের কি এই ফল? আবার তাহারা আমাদের দেশে উৎপাত করিতে আসিয়াছে! এবার তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। এবার আর কাহারো দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে না।" যেখান হইতে সেই সকল কথা শ্রুত হইল, সেই দিকে সকলের চক্ষু পড়িল। পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিলেন "এই যে বিজয়! তুমি কখন আসিলে? যে কার্য্যে গিয়াছিলে তাহার কি হইল? তোমার সহিত ঐ অপরিচিত যুবা কে?" বিজয়কে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মন্ত্রীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইলেন। বিজয় বলিলেন "কার্য্যের কথা পরে বলিব, অগ্রে দূতকে যাহা বলিবার বলিয়া বিদায় করুন।" "তাহা সত্য বটে" বলিয়া পৃথ্বীরাজ দূতকে বলিলেন "তবে তিনি এখানে কবে আসিতে চাহেন?" দূত বলিল "অদ্য হইতে এক মাস পরে।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন "আচ্ছা, আমরা তাঁহারই ইচ্ছামত সম্মত হইলাম। তাঁহাকে গিয়া বল আমরা অপ[illegible] হইতে এক মাস পরে তাঁহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার জন্য [illegible] অপেক্ষা করিব।" [illegible]

দূত প্রস্থান করিলে বিজয় অগ্রে কার্য্যো[illegible]

করিয়া বলিলেন "এই যুবা চন্দ্রপতির নিকট হইতে মহা-রাজের নিকট আসিতেছিলেন, আমিও দৌত্যসমাধা করিয়া এখানে আসিতেছিলাম, পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে ইনি দিল্লী আগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে দুই জনে আলাপ হইল, সেই নিমিত্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" পৃথ্বীরাজ যুবাকে কবিচন্দ্রের সমাচার জিজ্ঞাসা করাতে দিলীপ যাহা জানেন তাহা বলিয়া কবিচন্দ্রদত্ত পত্র রাজহস্তে দিলেন। মহারাজ তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার বাসোপযোগী গৃহপ্রভৃতি দিতে আজ্ঞা করিয়া বলিলেন "এতদিন হইল, কবিচন্দ্র যবনশিবির হইতে ফিরিলেন না, আমার বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এই সময় কবিচন্দ্র থাকিলে অতি উত্তম হইত।"

মন্ত্রী বলিলেন "কবিচন্দ্রের জন্য আমাদের কোন ভয় করিতে হইবে না। তাঁহার মত লোকের কোন বিপদ হইবার আশঙ্কা নাই। যদিও কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে, কবিচন্দ্র যে প্রকারে হউক অতিক্রম করিয়া আসিবেন। উঁহার বুদ্ধি ও কৌশলের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

নবাগত যুবাকে দেখিয়া সমরসিংহ স্থিরনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এ সুন্দর যুবাপুরুষ কে? কোন্ ভাগ্যবান ইহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পায়? ইহাকে দেখিয়া কিরণসিংহকে মনে পড়িতেছে কেন? কিরণের সহিত কি ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে। কিরণ থাকিলে কি

এতদিনে এত বড় হইত! সে কি এমন সুন্দর দেখিতে হইত? কি পাপে তাহাকে হারাইলাম?—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চিন্তাস্রোত ভূতকালের দিকে প্রধাবিত হইল। গতঘটনা স্মৃতিপথে উদয় হইল। কিরণকে হারাইবার ভয়ঙ্কর দিন মনে পড়িল। সেই ঝড়, সেই বৃষ্টি, ক্রমে পাগলিনীর মৃতদেহ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন। মহিষীগণের ক্রন্দনধ্বনি আবার যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল। তখন সেই যোগীন্দ্র পুরুষও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি? আপনি সহসা এমন হইলেন কেন?" সমরসিংহের চমক ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন "ঐ যুবাকে দেখিয়া আমার কিরণের কথা মনে হইতেছে। তাহার বয়স্ক যাহাকে দেখি অমনি আমার তাহাকে মনে পড়ে। কিন্তু উহাকে দেখিয়া আজ আমি অধিক চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি।" সমরসিংহের কথায় পৃথ্বীরাজ যুবার দিকে চাহিলেন। তিনি তাহার মুখে সমরসিংহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহা বলিলে সমরসিংহ পাছে যথার্থই তাঁহার পুত্র মনে করেন এই ভয়ে তাহা প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন "গতানুশোচনা করিয়া আপনি কষ্ট পান কেন? যাহা পৃথিবীতে নাই তাহার আশা করিয়া কি হইবে? যদি কিরণের মৃত্যু না হইত, কেবল অদৃশ্য হইত তাহা হইলে আমিও এই নবাগত যুবাকে দেখিয়া কিরণ মনে করিতাম। কিন্তু কিরণ যখন নিশ্চয়ই জলনিমগ্ন হইয়াছে তখন আর তাহার আশা

কেন? মৃতমনুষ্য কিছু আর এখানে ফিরিয়া আসিবে না।” সমরসিংহ এই কথায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “তাহা সত্য। কিন্তু যদিও জানিতেছি তাহার আর আশা নাই, তথাপি এক একবার মনে হয় সে যেন মরে নাই—কোথাও আছে। তখন পাগলিনীর কথায় আমি হাসিতাম, এখন আমিও এক একবার তাহার ন্যায় মনে করি আমার কিরণ চুরি গিয়াছে, মরে নাই।” সমরসিংহ অন্যান্য কথা বলিয়া ও কথা নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা এবারকার যুদ্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন তাহার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইবে; তিনদিগ দিয়া তিনদল সৈন্য যবনদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং এক দল অমনি প্রস্তুত থাকিবে। যবনসেনাদিগকে তিন দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করাই যুদ্ধজয়ের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির হইল। সৈন্যদিগকে চারিভাগ করিলে চারিজন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি আবশ্যক। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ—এই তো দুই জন? আর দুই জন কে কে হইবে? অন্য রাজাগণও ত কেহ আসিয়া পৌছেন নাই। লাহোরের কর-প্রদ অধিপতি চাঁদপুন্দির ত ইতিপূর্ব্বেই মহম্মদঘোরির ভারতপ্রবেশের প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, আর পৃথ্বীরাজের প্রধান সেনাপতি অখিলসিংহও ত এখনো রুগ্নশয্যায়

শয়ান রহিয়াছেন। তবে বিজয় এইবার নির্ব্বিঘ্নে দৌত্য কার্য্য সমাধা করিয়া আসাতে সভাসদবর্গ সকলেই উহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও সকলেই বিজয়কে একজন যোগ্য লোক বলিয়া মনে করিতেছিলেন। সভাসদগণ উহার উপর কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন তাহা দেখাইবার সুযোগ পাইলেন, বিজয়কে ও যুবরাজ কল্যাণকে তাঁহারা আর দুইটি সেনাপতিপদে বরণ করিতে স্থির করিলেন।

যুবরাজ কল্যাণ সমরসিংহের সহিত দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় হইলেও সাহস ও বিক্রমে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের সমকক্ষ ছিলেন। কল্যাণ দিল্লী আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সমরসিংহের সহিত কল্যাণ ইহার পূর্ব্বে আরো দুই একবার দিল্লী আসিয়াছিলেন, তখন রাজকন্যা বালিকামাত্র। বালিকার সহিত আবার প্রণয় কি? কিন্তু তাহা না হউক, সুন্দরী বালিকাকে দেখিতে কাহার না ভাল লাগে? তাহার সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কাহার হৃদয়ে না ভালবাসার উদ্রেক হয়? রাজবালাকে দেখিয়া রাজপুত্রেরও মনে তখন কেবল সেই ভাবেরই উদয় হইত।

এবার রাজকন্যাকে দেখিয়া কল্যাণের হৃদয়ের সেই সকল বাল্যভাব প্রণয়রূপে পরিণত হইল। তিনি তাঁহাকে বিবাহ

করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সমরসিংহ গোপনে তাঁহাকে এই ইচ্ছা হইতে নিরস্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কল্যাণের গ্রহবৈগুণ্য সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিত। বিবাহ করিলে কিছুদিন পরে পাছে পুত্রবধূ বিধবা হইয়া কষ্টভোগ করে এই ভয়ে তাঁহার এখন কল্যাণের বিবাহ দিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কল্যাণ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। বলিলেন "রাজকন্যাকে না পাইলে তিনি উন্মত্ত হইতে পারেন, এমন কি, এই বিবাহ না হইলে হয় তো প্রাণেরও হানি হইতে পারে।" তখন সমরসিংহের পূর্ব্ব কথা মনে আসিল। কি প্রকারে কিরণসিংহকে হারাইয়াছিলেন মনে আসিল। পাগলিনীর ক্রোড়ে না দেওয়াই তাহাকে হারাইবার মূল কারণ। আপনাদিগের বুদ্ধিদোষে একজনকার অদৃষ্টলিপি ফলিয়াছে, কল্যাণের বিবাহে বাধা দিলে যদি মনের কষ্টে কল্যাণের প্রাণহানি হয় তাহা হইলে এবারও তাঁহারি বুদ্ধিদোষে তাহা ঘটিবে। অথচ বিবাহ করিলে সুখী হইয়া পরে বাঁচিতেও পারেন। বাঁচিবে না এমন কে বলিতে পারে? তাঁহার গুরুদেব, কল্যাণের ভাগ্য-নির্ণয় করিয়া বলিয়াছিলেন 'বিবাহের অগ্রে মরিবে।' বিবাহ হইলে সে গণনা মিথ্যা হইবে। তাহা হইলে মৃত্যু গণনাও মিথ্যা হইবার সম্ভব। সমরসিংহ এই সকল ভাবিয়া আর বিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন না। বরং তাঁহার মনে হইতে লাগিল একবার বিবাহ হইয়া গেলে কল্যাণের আর

মৃত্যুর ভয় থাকিবে না। তিনি সেই জন্য যাহাতে শীঘ্র বিবাহ হয় তাহার উদ্যোগী হইলেন। উষাবতীকে অনিচ্ছুক না দেখিয়া পৃথ্বীরাজেরও এ বিবাহে কোন অমত রহিল না। কিন্তু বিজয় থাকিতে এ বিষয়ের কিছু মতামত প্রকাশ করেন নাই। বিজয় আসিয়া শুনিলেন এই যুদ্ধশেষে উষাবতী ও কল্যাণের বিবাহ হইবে। তিনি ভাবিলেন "যুদ্ধে কল্যাণের প্রাণ রক্ষা হইলে তো?"

যখন তাঁহাদের যুদ্ধবিষয়ের পরামর্শ হইতেছিল তখন কল্যাণ সেখানে ছিলেন না। কল্যাণকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সভায় আনিতে পৃথ্বীরাজ বিজয়কে প্রেরণ করিলেন। বিজয় সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যখন এদিকে এই সকল ঘটনা হইতেছিল তখন যুবরাজ কল্যাণ কি করিতেছিলেন? তিনি যমুনাস্তম্ভের উপর হইতে রাজকন্যার সহিত যমুনার শোভা দেখিতেছিলেন। পৃথ্বীরাজ কন্যার যমুনাসন্দর্শন জন্য এই বৃহৎ ও চমৎকার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মুসলমানেরা দিল্লী জয়ের পর অবধি ইহার নাম 'কুতব

মিনর' রাখিয়াছে। এই যমুনাস্তম্ভে চল, কল্যাণকে দেখিতে পাইবে।

সন্ধ্যাকাল গতপ্রায়। রাজপ্রাসাদ হইতে নহবত শব্দ, দিল্লী-অধিষ্ঠাত্রী আশাপূর্ণাদেবীর মন্দির হইতে সন্ধ্যা আরতির শঙ্খধ্বনি, চতুর্দ্দিকস্থ জনকল্লোল এবং অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ হইতে পাখীদিগের কলরব মন্দীভূত হইয়া যমুনাস্তম্ভের শিখরদেশে উথলিয়া উঠিতেছে, অদূরে প্রকাণ্ড অথচ বিচিত্র জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদ, তদঙ্গস্থিত প্রভূত দীপমালা দিবাগমে মলিন জ্যোনাকিভাতির ন্যায় চন্দ্রকিরণে হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদের সমস্ত শুভ্র শিখরদেশ এই নিস্তব্ধ নিশাকালে দর্শকবর্গের হৃদয়ে একটী অপূর্ব্ব গভীর ভাবের উদ্ভাবন করিতে করিতে ঊর্দ্ধনেত্রে অসীম গগনমার্গে চাহিয়া আছে, সন্নিকট বিপদ বুঝিতে পারিয়াই যেন ঊর্দ্ধমুখে কাতরচিত্তে দেবোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আবার ওদিকে আকাশ ভেদী আয়সস্তম্ভ সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া পৃথ্বীরাজের গরিমা প্রচার করিতেছে, এবং তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রস্তরময় লোহিতদুর্গ নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘননীলময় মনোহর পাহাড়-শ্রেণী রজতমার্জ্জিত হইয়া আরো মনোহর হইয়াছে। দূরে যমুনা বহিয়া যাইতেছে, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া যমুনা আপন মনেই বহিয়া যাইতেছে। কল্যাণ যমুনার শোভা দেখিতে যমুনাস্তম্ভোপরি আসিয়াছেন, কিন্তু

রুই—তিনি তো যমুনার শোভা দেখিতেছেন না। রাজকুমারী মুখ নত করিয়া যুবরাজের পদপানে চাহিয়া আছেন, যুবরাজ তাঁহার মুখের শোভাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছেন। তাঁহার নিকট যমুনার শোভা হইতে রাজকন্যার মুখশোভা অধিকতর মিষ্ট লাগিতেছে। তিনি রাজকন্যার বদনমণ্ডলেই যমুনার শোভা দেখিতেছেন। যমুনার আবার শোভা কি?

আজ যমুনার শ্যামল জলে পূর্ণচন্দ্র যেরূপ ঢলঢল ঢল ঢল করিতেছে, আমাদের উষাবতীর মুখখানিও কি সেইরূপ লাবণ্যরাশিতে ঢল ঢল করিতেছেনা? তারকাখচিত যমুনালহরি অপেক্ষাও উষাবতীর মুক্তামণ্ডিত আলুলায়িত কেশরাশি যে বায়ুভরে হিল্লোলিত হইতেছে, তাহা কি আরও মনোহারী নহে? আবার রাজবালার প্রেমবিস্ফারিত লজ্জাবনত অথচ উজ্জ্বল চক্ষু, এবং তাহার কপোলস্থিত ঈষৎ প্রফুল্ল গোলাপকলিকার সহিত তুলনার সামগ্রী যমুনা কি দেখাইতে পারে? সে সকল শোভা দেখিয়া কুমারের যমুনার শোভা ভাল লাগিবে কেন? সে সকল শোভা দেখিয়া কুমারের মন আর তৃপ্ত হইতেছে না, যতই দেখিতেছেন ততই নূতন বোধ হইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু অবশ হইতেছে তথাপি চাহিয়া আছেন। কি! এত দেখিয়াও চক্ষু ক্লান্ত হইল না? এত দেখিয়াও সাধ মিটিল না! এত দেখিতেছ এখনো নূতন! নূতন কি ফুরাবে না? দেখিতে দেখিতে

এতই অজ্ঞান? দেখিতেছ না যমুনাস্তম্ভের দ্বারে কে দাঁড়াইয়া আছে? তোমাদের লুকাইয়া দেখিতেছে? তোমাদের কথা শুনিবার জন্য কাণ পাতিতেছে। তাহা না দেখ, মুখে কথা নাই কেন? কথা কহিতে কহিতে কি রাজকন্যাকে দেখিতে পাইবে না? এতক্ষণ আসিয়াছ—দুজনেই নিস্তব্ধ! এখনও মোহ ভাঙ্গিল না? এখনও কথার অবকাশ নাই! না, এই যে মোহ ভাঙ্গিতেছে? এইবার বুঝি কথা কহিতে যাইতেছেন। কল্যাণের মোহ ভাঙ্গিল। তিনি গভীর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "উষা! কি ভাবিতেছ? মুখ ম্লান কেন?" উষাবতী কল্যাণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কল্যাণের সেই মহৎভাবযুক্ত উন্নতললাট, সেই বৃহৎ ও উজ্জ্বল চক্ষু, সেই স্বতঃসহাস্য ওষ্ঠাধর, সেই বলিষ্ঠ ও সুগঠিত শরীর, দেখিয়া তিনি তাঁহার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। কল্যাণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "উষা, মুখ ম্লান কেন?" এবার উষাবতী ত্রস্তভাবে বলিলেন "না, কিছু ভাবিতেছি না। তুমি কি ভাবিতেছিলে?"

কল্যাণ। আমি ভাবিতেছিলাম, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম উর্ব্বাবতী যেন আমারই উষাবতী! রাজকুমারি! আমার এ স্বপ্ন কি কখনও ফলিবে?"

উষা। "তোমার তবে কবে বিশ্বাস হইবে? যুদ্ধের পর আমাদের বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে, এখনও তোমার বিশ্বাস হয় না।"

কল্যাণ। "মা, আমার মনে হয় এ রত্ন লাভ করিবার অগ্রেই একটা দুর্ঘটনা হবে। হয় ত যুদ্ধে আমার প্রাণবিনষ্ট হইবে, আর এ দুর্লভরত্নটি আমা হ'তে একজন ভাগ্যবানের হাতে পড়িবে।" ইহা শুনিয়া উষাবতী সজলনয়নে বলিলেন "তুমি ওরূপ মনে করিও না। যদি ঈশ্বর আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া তাহাই করেন, তাহা হইলে তো আমি বিধবা হইব। তুমিই আমার—" বলিতে বলিতে উষাবতীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, বিশাল চক্ষুদ্বয় যে অশ্রুতে ঈষৎ আরক্তিম হইল তাহা আর কল্যাণ দেখিতে পাইলেন না।

কল্যাণ। "তোমার পিতা যদি তোমাকে অন্তে সমর্পণ করেন তো তুমি কি করিবে?"

উষা। "আমি প্রাণত্যাগ করিয়া তোমার সহিত পরলোকে আবার মিলিত হইব। স্ত্রীলোকের ভালবাসা তোমরা পুরুষ হইয়া কি প্রকারে জানিবে? ভালবাসার নিকট আমাদের প্রাণ অতি তুচ্ছ পদার্থ।"

এই কথায় কল্যাণের হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্তও যেন একটি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি যেন মোহবশে উষাবতীর দক্ষিণ হস্তটি চুম্বন অভিলাষে স্বীয় ওষ্ঠাধরের নিকট টানিয়া লইলেন। অমনি রাজকন্যা চমকিত হইয়া হস্ত টানিয়া লইয়া বলিলেন "রাজকুমার!"—এই একটি কথায়, উষাবতীর হৃদয়ের গভীর প্রেমময় অভিমান, নির্দ্দোষ পবিত্র হৃদয়ের মর্ম্মময় কোমল তিরস্কার ব্যক্ত

হইল। কল্যাণ অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিলেন "সরলে! তোমার নিঃস্বার্থ প্রণয় দেখিয়া আমি একপ্রকার মোহে অভিভূত ছিলাম, যদি দোষ হইয়া থাকে তো ক্ষমা করিবে। তুমি পুরুষ জাতির উপর দোষারোপণ করিতেছিলে, কিন্তু এই আমি চতুর্ভুজা-দেবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহ আমার প্রণয় ভাগিনী হইবে না, কিম্বা কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না।" এই সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাহাদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিল। সে বলিল "মন্ত্রীপুত্র বলি-লেন মহারাজ আপনাকে সভায় ডাকিতেছেন।"

বিজয়ের নাম শুনিয়া রাজকন্যা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই রাত্রিকার কথোপকথন মনে পড়িল। বিজয়ের সক্রোধ পলায়ন মনে পড়িল। তাঁহার যেন হঠাৎ মনে হইল, বিজয়, কল্যাণের শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভীত হইলেন। রাজকন্যার সহসা এইরূপ ভাব দেখিয়া কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিলেন "একি?" রাজকন্যার একবার সমস্ত খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু লজ্জা হইল, পারিলেন না। বলিলেন "কিছু না।" যুবরাজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি দেখিলেন সভাগমনের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে যে এত শীঘ্র সময় গেল ঠিক পাইলেন না। দ্রুতপদে নামিতে আরম্ভ করিয়া তিনি উদ্যানে পঁহুছিলেন। যাইতে যাইতে একটী

লতায়ৎেের নিকট রাজকন্যার নাম শুনিতে পাইলেন, অমনি সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, চরণ যেন অমনি অবশ হইয়া আসিল, তিনি শুনিলেন "রাজকুমারী কি পাষাণ! যুবরাজ তাঁহাকে এত ভালবাসেন, তিনি তাঁহাকে না বেসে, আর একজনকে ভালবাসেন। মরি কি রুচি! অমন সুন্দর পুরুষকে ছেড়ে কি না বিজয়কে ভাল বাসেন! কিন্তু রাজপুত্র কি সৎপুরুষ, রাজকন্যার মিথ্যা প্রণয়ের কথাতেই ভুলে গিয়াছেন। আহা, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আর রাজকুমারীর কি একটু মায়াও হয় না। ছিঃ ছিঃ, বড় লোকেরা বড় নির্দ্দয়।"

এই সকল কথা শুনিয়া কল্যাণের হৃদয় কণ্টকিত হইল। শিরায় শিরায় রক্তরাশি অনল-প্রবাহে বহিতে লাগিল, ক্রোধে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এখন চরণে পুনরায় বলপ্রাপ্ত হইলেন, তিনি সভায় না যাইয়া মঞ্চমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোলাপ শশব্যস্তে বলিল "একি, যুবরাজ এখানে কেন?" কল্যাণ তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন "তুমি আপনি আপনি কি বলিতেছিলে?'

গোলাপ। "না, কই আমি তো কিছু বলি নাই।"

কল্যাণ সক্রোধে বলিলেন "কি? কিছু বল নাই! তুমি রাজকন্যার পবিত্র হৃদয়ে দোষারোপ করিতেছিলে—আবার কিছু বল নাই! পাপীয়সি, তুই জানিস না কাহার নির্ম্মল চিত্তে কলঙ্ক আরোপ করিতেছিলি।" এই বলিয়া ক্রোধভরে

অসি দেখাইয়া বলিলেন "তুমি স্ত্রীলোক তাই নিস্তার পাইলে, আর কেহ হইলে এখনি এই অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতাম।"

গোলাপ। "যুবরাজ, আপনি যখন রাজকন্যাকে ভাল বাসেন বলিয়া আজ নরহত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না—তবে কি ভালবাসার জন্য মনের তাপে রাজকন্যার নিন্দা করা আমার পক্ষে এতই অন্যায় হইয়াছে ?

কল্যাণ। "রাজকন্যার নিন্দায় সহিত তোমার ভাল-বাসার সম্পর্ক কি ?"

গোলাপ। "আমি যাহাকে ভালবাসি, তিনিও তাহাকে ভাল বাসেন, রাজকন্যাই আমার পথের কণ্টক স্বরূপ।"

কল্যাণ। "কি ? তিনিও তাহাকে ভাল বাসেন ?" তোমার একথা বলিতে সাহস হইল ?" গোলাপ বলিল "আমি এক দিন স্বকর্ণে রাজকন্যার সহিত বিজয়ের প্রেমা-লাপ শুনিয়াছি।"

কল্যাণ। "আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না।"

গোলাপ। "আমি যদি প্রমাণ দিতে পারি, তবে আমার কি উপকার করেন ?" এই বলিয়া কল্যাণের পদতলে পড়িয়া, তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়া বলিল, "যুবরাজ, আপনি এইখান দিয়া সভায় যাইবেন জানিয়া, আমি আপনাকে শুনাইবার নিমিত্তই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলাম। আপনি ইহার প্রতিকার না করিলে আর উপায় নাই।"

কল্যাণ। "এখনো আমার বিশ্বাস হইতেছে না। যদি সত্য হয় তো তোমার উপকার চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমার প্রমাণ অগ্রে শুনিতে চাই।"

গোলাপ। "বিজয়ের অঙ্গুলীতে আপনি উষা-নাম খোদিত একটী অঙ্গুরী দেখিতে পাইবেন। সেইটি রাজকন্যার প্রণয়োপহার।"

কল্যাণ। "তাহা থাকিতে পারে, তাহাতে কি হইল! রাজকন্যার সহিত বাল্যকালাবধি তাঁহার বন্ধুত্ব আছে—তিনি ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে তাহা দিয়াছেন।"

গোলাপ। "যদি কেবল সুহৃদ ভাবিয়াই দিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাই বলিবেন। আর যদি অন্য মনে দিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার নিকট লুকাইতে চেষ্টা করিবেন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্য মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

কল্যাণ। "যদি তিনি না জানেন, বিজয় যদি কোন মন্দ অভিপ্রায়েই তাহা চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার আমাকে বলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি কি সেই জন্য তাঁহাকে অবিশ্বাস করিব?"

গোলাপ। "বিজয়ের তাহা করিবার আবশ্যক কি?"

কল্যাণ। "তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি যাহাই বল, আমি স্বচক্ষে না দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।"

গোলাপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল "যদি যুবরাজ

সি ...েও বিশ্বাস না করেন তবে কাজে কাজেই, সর্ত্ত্য সপ্রমাণ ই...রিতে আপনাকে আমার এক দিন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ...দেখাইতে হইবে। তাহা না হইলে আমিই দোষী হইব। তবে আজ আমি যাই, যে দিন সুবিধা দেখিব সেই দিন যুবরাজকে বলিব।" এই বলিয়া গোলাপ প্রস্থান করিল। কল্যাণের মনে আগুণ জ্বলিল, তিনি কতই ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন "তাহাও কি কখন হইতে পারে? অমন পবিত্র হৃদয়ে কখনও অত পাপ সম্ভবে না, বোধ হয় গোলাপের সহিত রাজকন্যার কোন শত্রুতা জন্মিয়াছে। আর যদি সত্যই হয়? উঃ! মনে করিতে গেলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সত্য হইলে না জানি কি হইবে। তাহা হইলে আমার জনমের সুখ ফুরাইল, এই যুদ্ধে যে প্রকারে হউক প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু তাহা কখনই সত্য নহে, স্বচক্ষে না দেখিলে আমি কখনই বিশ্বাস করিব না। ক্ষণকালের জন্যও যদি সেই পবিত্র হৃদয়ের প্রতি আমার সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই দোষী। নিশ্চয়ই রাজকন্যার সহিত গোলাপের কোন গূঢ় শত্রুতা আছে।"

তাঁহার আর কোন সন্দেহই রহিল না, ক্ষণকালের জন্য যাহা হইয়াছিল তাহা শরৎকালের মেঘের ন্যায় উড়িয়া গেল, তিনি হৃষ্ট চিত্তে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ সেই দিনই তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। সভায় আসিয়া দিলীপকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন।

তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি যেন সমরসিংহের মুখ দেখিতে পাইলেন। তিনি দুই মুখের আশ্চর্য্য রূপ সাদৃশ্য দেখিলেন। সেই সাদৃশ্য দেখিয়াই হউক কিম্বা যে কারণেই হউক, দিলীপের প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে দুই জনের মধ্যে ঘোর বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল।

কিন্তু দিলীপের পরিচয় না পাওয়াতে তাহার সেই সাদৃশ্যের যথার্থ কোন কারণ আছে কি না তাহা কল্যাণের নিকট অপ্রকাশ্য রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গত পরিচ্ছেদে আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তাহা এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে।

বিজয় রাজসভা হইতে কল্যাণের গৃহে আসিয়া শুনিলেন "তিনি সেখানে নাই, রাজকন্যার সহিত যমুনাস্তম্ভে গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তিনি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিতে করিতে যমুনাস্তম্ভের উদ্যানে পঁহুছিয়া, এক জন মালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজকন্যা যমুনাস্তম্ভের উপর আছেন, তাঁহার সঙ্গে সহচরী কে আসিয়াছে?" মালী বলিল 'গোলাপ।'

বিজয়। "গোলাপ কোথায়? তিনি কি তাঁহাদের সঙ্গে আছেন?"

মালী। "না। তিনি ঐখানে বেড়াচ্ছেন।" মালী যেদিকে দেখাইয়া দিল সেই দিকে গিয়া বিজয় গোলাপকে দেখিতে পাইলেন। বিজয়কে দেখিয়া গোলাপ প্রফুল্ল মনে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল "এতদিনে বুঝি আমাকে মনে পড়িল? তুমি আমাকে ভালবাস না, তাহা হইলে এতদিন গিয়াছিলে একখানাও পত্র লিখিতে।" বিজয় যদিও গোলা-পের সহিত প্রণয়ালাপের জন্য আসেন নাই, তথাপি এখন সেই ভাণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন। ভাবিলেন "প্রেমের ছলনা দ্বারা গোলাপকে সম্যকরূপে হস্তগত করিতে না পারিলে, রাজকন্যা ও কল্যাণের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারি-বেন না। তাহা না পারিলেও তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। বিজয় সেই জন্য আসিবার যথার্থ কারণ অগ্রে না বলিয়া বলিলেন "তুমি আমাকে বৃথা দোষী করিতেছ। দেখিতেছ না, যে এখানে আসিয়াই ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, তোমাকে দেখিতে উর্দ্ধশ্বাসে আসিতেছি। ছিঃ! স্ত্রীলোকেরা বড় নিষ্ঠুর। একজনকে ভাল বাসিতাম, সে কেমন আমাকে পরিত্যাগ করিল, আর এখন যাহাকে ভালবাসি, সে আবার আমি যাহাতে কষ্ট পাই, তাহা করিতেই কৃতসংকল্প।" বিজয় জানিতেন যে গোলাপ তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসে, এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি আর একজনকে ভালবাসিতেন।

বলিলেও গোলাপের কষ্ট ও ঈর্ষা হইবে। বিজয় গোলাপকে কষ্ট দিবার নিমিত্তই ও কথা বলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। গোলাপ বলিল "এখনো বুঝি তুমি রাজকন্যার ভালবাসা ভুলিতে পার নাই? তাহা পারিবে কেন? যে দ্রব্য একবার পাওয়া যায় তাহার আর গৌরব কি? আমার ভালবাসা পেয়েছ বোলেই আর তাহাতে আদর নাই। রাজকন্যার প্রেম অপ্রাপ্য তাই স্পৃহনীয়?"

বিজয়। "না। আমি আর তাঁহাকে ভালবাসি না।"

গোলাপ। "তবে কাহাকে ভালবাস?"

বিজয়। "তাহা কি তুমি জান না, যে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? হায়! একবার প্রেমে প'ড়ে ফাঁদে প'ড়ে ছিলাম, আবার কেন ভাল বাসিলাম? মনকে এত বোঝাই, বোঝে না। তুমি যাহা বলেছ এক রকমে তাহা ঠিক; যখন দুর্লভ তাহা পাইতেই ইচ্ছা হয়! আমি জানিতেছি তুমি আমার পক্ষে দুর্লভ তাই তোমাকেই মন চাহিতেছে?"

গোলাপ। "আজ আমাকে এত ঠাট্টা কেন? আমি তোমার ভালবাসার অগ্রে যেচে মন দিয়াছি, এখন আমি তোমার নিকট দুর্লভ! বরঞ্চ বল, তুমি আমাকে আর ভাল বাস না, তাই ও প্রকারে ভুলাইতেছ?"

বিজয়। "হাঁ, এখন আমি জান্‌ছি যে তোমার ভালবাসা আমার। কিন্তু পরস্পর ভালবাসা থাকিলেই কি মিলন হয়?"

গোলাপ। "না, তাহা হয় না বটে, পিতা মাতার মত

চাই। কিন্তু তোমার যদি আমার প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে তোমার বৃদ্ধ পিতা আমাদের বিবাহে কখনও অসম্মত হইবেন না। আমি কিছু নীচ কূলোদ্ভব নহি, আমি চন্দ্রপতির ভগিনী—তাহা তোমার পিতা জানেন।"

বিজয়। "না, পিতা অসম্মত হইবেন না তাহা আমি জানি।"

গোলাপ। "তবে কে? তুমি?"

বিজয়। "আমি তোমাকে পাইতে পাগল, আমার অমত?"

গোলাপ। "তোমার কথা বুঝে ওঠা আমার মত স্ত্রীলোকের দুঃসাধ্য।"

বিজয়। "তুমি জান, প্রতিজ্ঞা রক্ষা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়?

গোলাপ। "তুমি কি তবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আমাকে বিবাহ করিবে না? তবে আমাকে ভালবাসার আশা দিলে কেন? যখন তোমার ভালবাসা জানিতে পারি নাই তখন তো তাহা দুর্ল্লভ মনে ক'রে এখনকার অপেক্ষা মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম?"

বিজয়। "না, না, তাহা নহে। আমি তাহা প্রতিজ্ঞা করি নাই। তোমার ভালবাসা জানিবার অগ্রে, আমি এক দিন মনের কষ্টে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে, যে স্ত্রীলোক আমার একটী কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিবে, তাহাকে ভালবাসি

আর নাই বাসি, সে যদি আমাকে চায় তো বিবাহ করিব। সে ব্যতীত আর কেহ আমার হইবে না।"

গোলাপ। "তাহা কি এতই কঠিন যে আমি পারিব না? তোমার জন্য অন্য স্ত্রীলোকে যত কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে, আমি তাহাপেক্ষা শতগুণেপারিব।"

বিজয়। "তাহাতে কোন কষ্ট নাই।" গোলাপ এই কথা শুনিয়া সহর্ষে বলিল "কষ্ট নাই—তবে কি কথা বলিতেছ না কেন? কষ্ট থাক্ আর নাই থাক্, তুমি যাহা বলিবে তাহা আমি এখনি করিব।" গোলাপের এইরূপ সরলতা দেখিয়া বিজয়ের পাষণ্ড-অটল হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইল। এই নির্ব্বোধ বালাকে কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্মে রত করিতেছেন মনে করিয়া একবার যেন তাঁহারও কঠিন অন্তঃকরণে একটু দয়া হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা তিরোহিত হইল। আবার হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া গোলাপ ভীত হইয়া বলিল "কি কথা, বলিতে ভয় পাইতেছ কেন?———কোন অন্যায় কর্ম্ম না কি?" গোলাপের অন্যায় কর্ম্মে এত আশঙ্কা দেখিয়া বিজয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য আরো দৃঢ় হইলেন, গোলাপ তাঁহার কার্য্য করিতে সম্মত হওয়ায় ক্ষণকাল তাহার প্রতি যে দয়া হইয়াছিল তাহা রহিল না। তিনি মন্দলোকের স্বভাব অনুসারে গোলাপের শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পারিলেন না। গোলাপকে পাপকর্ম্মে রত করিতে কৃতসংকল্প

হইয়া বলিলেন "আমিতো বলিয়াছিলাম তুমি পারিবে না।"

গোলাপ। "আচ্ছা, কি বলই না শুনি, শুনিয়া বুঝি পারিব কি না? কিন্তু আমি মনে করি নাই তোমার মত লোকের কোন পাপ ইচ্ছা সম্ভবে?"

বিজয় একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "অগ্রে কি শুন, তার পর পাপ কি আর কিছু বিচার করিও।"

গোলাপ। "বল, শুনিতেছি।"

বিজয়। "যে রাত্রে রাজকন্যা আমাকে প্রেমাশার নিরাশ করিলেন সেই রাত্রে মনের কষ্টে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তিনি যাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আমাকে তুচ্ছ করিলেন তাহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটাইব, ও তিনি যেমন আমার সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, আমিও তাহা করিব।"

গোলাপ দুঃখিত হইয়া বলিল "তবে তোমার আর সে দুঃখ যায় নাই। আমার হৃদয় পাইয়া এখনো সুখী হও নাই?"

বিজয়। "না, আমি সেই রাত্রের কথা বলিতেছি। তোমার প্রণয়ে আবার সুখী হইব, তখন তো তাহা আশা করি নাই।"

গোলাপ। "তবে যদি এখন সুখী হইয়া থাক তো ও ইচ্ছা ত্যাগ কর।"

বিজয়। "কি, আমি প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইব!—ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইব? এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, সর্ব্বস্ব

জলাঞ্জলি দিতে পারি, এমন কি, তোমার অমূল্য প্রেমের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তবুও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইতে পারি না। তোমার মুখে আমি ও কথা শুনিতে আশা করি নাই।" গোলাপ থতমত খাইয়া বলিল "কিন্তু আমি রাজকুমারীর বিচ্ছেদ কি প্রকারে ঘটাইব?"

বিজয়। "তাহা আমি শিখাইয়া দিব, আমি যখন যাহা বলিব তোমার তাহা করিতে হইবে।" গোলাপ আর কিছু মতামত প্রকাশ না করিয়া বিজয়ের মনের ভাব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া বলিল "আচ্ছা, কি করিতে হইবে বল?"

বিজয়। "প্রথমতঃ রাজকন্যার যদি কোন মূল্যবান দ্রব্য তোমার নিকট থাকে তবে আমাকে তাহা দিতে হইবে।"

গোলাপ। "হাঁ, তাঁহার নামখোদিত একটী অঙ্গুরী আমার নিকট আছে। এক দিন, রাজকন্যার শয্যায় তাহা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, আমি তাহা আমার নিকট রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই অবধি সেইটা তাঁহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি মনে করিয়া দিলে ভাল হইল। সে যাই হউক, তুমি তাহা লইয়া কি করিবে?" বিজয় তখন চুপে চুপে অঙ্গুরী লইয়া কি করিবেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে গোলাপের কি করিতে হইবে, সকল বলিলেন। গোলাপ তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীত ও কোমল মন সে কর্ম্ম করিতে বিরত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিজয়ের পদ গ্রহণ করিয়া বলিল "আমি উহা

করিতে পারিব না। রাজকন্যা আমাকে এত ভালবাসেন, এত বিশ্বাস করেন, আমি কি প্রকারে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিব? তুমি আর যাহা করিতে হয় বল এখনি করিতেছি।” বিজয় সক্রোধে বলিলেন “এই না তুমি বলিতেছিলে ‘আমি যাহা বলিব এখনি করিবে’? আমার ভালবাসার তোমার কি এই প্রতিদান; হায়! বৃথা কেন বলিতেছি। জানিলাম তুমি আমাকে ভাল বাস না। তাহা হইলে এইটুকু করিতে পারিতে। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তাই বলিলাম, নহিলে বলিতাম না। তবে আমাদের এই পর্য্যন্ত, আমি চলিলাম।” গোলাপ নীরবে কাঁদিতে লাগিল, কিছুই উত্তর করিতে পারিল না, বিজয়ের ভালবাসার কারণ এখন তাহার বোধগম্য হইল। সে বুঝিল বিজয় তাহাকে ভালবাসেন না। আর ইহাও বুঝিল যে বিজয়ের মত লোককে তাহারও ভালবাসা উচিত নহে। কিন্তু বুদ্ধি ও কারণ দ্বারা ভালবাসা যদি ন্যূনাধিক করা যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটনা ঘটিত না।

একজন কবি বলিয়াছেন ‘সে প্রেমই নয়, যে প্রেম সুখে দুঃখে, যশে, অপযশে সমান না থাকে? আমি জানি না, জানিতে চাহি না, যে আমার প্রণয়িণীর হৃদয়ে কোন দোষ আছে কি না; কিন্তু আমি এইমাত্র জানি যে, সে যাই হোক না কেন, আমি তাহাকে ভালবাসি।’

গোলাপ সকল জানিয়া শুনিয়াও বিজয়ের প্রতি ভাল-

বাসা মন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিল না। তাহার সরল ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় বিজয়কে পাইবার জন্য আরো ব্যগ্র হইতে লাগিল। অথচ রাজকন্যার অনিষ্ট ভিন্ন তাহাকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই, তাহাতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক। আত্ম সুখের জন্য রাজকন্যাকে চিরকালের জন্য দুঃখে ফেলিবে ইহাও মনে করিতে পারিল না। কি যে করে কিছুই স্থির নাই, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা সকল লোপ প্রাপ্ত হইল। একবার ভাবিল "না, রাজকন্যার অনিষ্ট করিয়া কখন সুখী হইব না।" আবার যখন দেখিল তাহা না করিলে জন্মশোধ বিজয়কে পাইবার আশা ছাড়িতে হইবে, তখন ভাবিল "আচ্ছা, যদি বিজয়ের কথানুযায়ী কার্য্য করি, তাহা হইলে কি রাজকন্যা চিরকালের জন্য অসুখী হইবেন? তাহার তো কোন কারণ দেখিতেছি না। বিজয় বলিতেছেন রাজকন্যার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলে তিনি আমার হইবেন। তাহাই কেন করি না? শেষে আমাদের বিবাহের পর রাজকন্যা ও কল্যাণকে সব খুলিয়া বলিলেই হইবে। তাহা হইলে তাঁহারাও তো পরে সুখী হইবেন। তবে যতদিন না আমাদের বিবাহ হয় ততদিন মনে কষ্ট পাইবেন বটে, কিন্তু সে অল্পদিন! পরে তো আবার সুখী হইবেন? আমিও বিজয়কে পাইয়া সুখী হইব, তাঁহারাও হইবেন। আর তাঁহারা দুজনেই যেরূপ উদারচরিত, আমি যে কারণে এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা শুনিলে, আমার

অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ও একবার বিবাহ হইয়া গেলে বিজয়ও কিছু আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। বিজয়ই বা কি প্রকারে জানিবেন আমি রাজকন্যা ও কল্যাণের নিকট সকল বলিয়াছি। তাঁহারা কিছু আমার অমঙ্গল হইবে জানিলে বিজয়কে তাহা বলিবেন না।”

আপনার ইচ্ছামত হইলে মন শীঘ্রই বোঝে। সে এই প্রকারে মনকে বুঝাইয়া অবশেষে তাহা করিতে সঙ্কল্প করিল। বিজয় এতক্ষণ তাহার কোন উত্তর না পাইয়া যাইতে উদ্যত হইলে গোলাপ অশ্রুজল নিবারণ করিয়া তাহাকে থাকিতে বলিয়া বলিল “আমি এখন বুঝিলাম তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্যই আমাকে ভালবাসা দেখাইয়াছিলে? আমাকে ভালবাস বলিয়া নহে। আচ্ছা, তুমি যাহা বলিলে, আমি যদি তাহা করিতে সম্মত হই তাহা হইলে যথার্থই কি আমার হইবে?”

বিজয়। “এই আমি চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তাহা হইলে আমার গোলাপ আমারই হইবে।” গোলাপ সহর্ষে বলিল “আচ্ছা, তবে তোমার জন্য আমি এ প্রকার পাপ করিতেও প্রবৃত্ত হইলাম, এখন আমাকে শেষে ত্যাগ করিও না।”

শুনিয়া বিজয় আহ্লাদে মত্ত হইলেন। তিনি গোলাপের মনে এতক্ষণ যে কষ্ট দিলেন, তাহা অপনীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। সরলা গোলাপ তাহাকেই ভুলিল। গোলাপ শান্ত হইয়াছে দেখিয়া বিজয় বলিলেন "রাজ-আজ্ঞাক্রমে আমি কল্যাণকে ডাকিতে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু তোমার সহিত কথায় কথায় তোমাকে এতক্ষণ তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

গোলাপ। "তবে আমি যাই, বলিয়া আসি।"

বিজয়। "চল, আমিও যাই, তাঁহারা কি কথা কহিতেছেন শুনিব।"

গোলাপ। "আমাকে দিয়া যাহা করাইতেছ কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত থাকিবে না? চল. ইহার অপেক্ষা. যখন অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি তখন ইহাও পারিব।"

বিজয় লুকাইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই সুখকর প্রেমালাপ শুনিবামাত্র তাঁহার অতি কষ্ট হইল। তিনি একটা দুইটা কথা শুনিয়া আর অধিক শুনিতে পারিলেন না। প্রত্যেক কথাতেই যেন তাঁর হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। গোলাপকে লইয়া নামিয়া আসিলেন। নীচে আসিয়া বলিলেন "আমি যাহা বলিলাম তাহা করিবার এখন উত্তম সুযোগ দেখিতেছি। রাজাজ্ঞা জানাইতে যুবরাজের নিকট আমি আর একজনকে প্রেরণ করি। তুমি ঐ মঞ্চের ভিতর যাও। যখন দেখিবে যুবরাজ ঐ মঞ্চের নিকট দিয়া সভায় যাইতেছেন তখন আমি

যাহা যাহা বলি, উচ্চৈঃস্বরে বলিও, যেন তিনি শুনিতে পান।"

যাহা যাহা করিতে বিজয় শিখাইয়া দিলেন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল বলিয়া বিজয় সভায় আসিলেন। এই সকল ঘটনা লিখিতে যত সময় লাগিল, কার্য্যস্থলে বিজয়ের তাহার অর্দ্ধেক সময়ও লাগিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীতে ঘোরতর যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হইতেছে। কল্যাণ সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁহার আর কিছু করিবার অবকাশ নাই। কেবল সৈন্যবিন্যাসে ও যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতেই ব্যস্ত। আমরা যে দিনকার কথা বলিয়াছি, সেই দিন অবধি এত দিন পর্য্যন্ত আর একদিনও তাঁহার রাজকন্যার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। অদ্য তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চঞ্চল হইলেন। অল্পক্ষণের নিমিত্ত যুদ্ধ-সজ্জার ভার তাঁহার সহকারী দিলীপসিংহকে দিয়া তিনি রাজকন্যার নিকট যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একবার দিলীপসিংহ এই খানে আসিয়াছিলেন। আবার ঐ কথার জন্য তাঁহাকে

এখানে আহ্বান করা উচিত বোধ না করিয়া তিনি উহা বলিতে স্বয়ং তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

দিলীপও এই সময় আর এক কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন 'দিলীপের জলনিমগ্ন বস্ত্রে দিলীপের বংশ সপ্রমাণ হইতে পারে।' কিন্তু দিল্লী আসিয়া গোলেমালে দিলীপ এত দিন ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ তাহা মনে পড়িয়া সেই বস্ত্র দেখিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি কৌতূহলচিত্তে জলনিমগ্ন পরিচ্ছদ বাহির করিয়া, তাহার এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা, চতুর্দ্দিক, ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা আশা করিয়াছিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরিচ্ছদের কোন স্থানে কোন রূপ চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হইল না। পূর্ব্বেও আত্মপরিচয়ে যেমন অজ্ঞাত ছিলেন, এখনও তেমনি রহিলেন। তাহার মনে হইল "ইহাতে কি প্রকারে বংশ সপ্রমাণ হইবে?' তিনি একবার, আর বার, পুনর্ব্বার কাপড়খানি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই আশা পূর্ণ না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া দিলেন। অমনি দুই তিন খণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ বস্ত্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িল। তাঁহার হৃদয় অমনি নাচিয়া উঠিল। ইহাতে বুঝি তাঁহার পরিচয় আছে! কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ তাহা দেখিতে পান নাই! তিনি ত্রস্তে উঠিয়া কাগজ উঠাইয়া লইলেন এবং এক খণ্ড পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"মহামহিম প্রবলপ্রতাপ কুমার তেজসিংহ মহিমার্ণবেষু।

আপনার ভ্রাতষ্পুত্র মহারাজ জয়চন্দ্র আপনার সেই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দচেষ্টা করিতেছেন। সাবধান থাকিবেন।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী——"

এ কি? ইহার অর্থ কি। ইহাতে তাঁহার পরিচয় কোথায়।

দিলীপ এই পত্রে যাহা দেখিতে আশা করিয়াছিলেন, কিছুই পাইলেন না। তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া আর এক খণ্ড তুলিয়া লইলেন। পড়িলেন——

"মহামহিম প্রবলপ্রতাপ……তেজসিংহ……

জয়চন্দ্রের ক্রোধ এখনো যায় নাই। তিনি আপনাকে নির্ব্বাসন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যদি জয়চন্দ্রের ক্রোধের সময় … … … ইচ্ছা — … তবে আপনার কন্যা শৈলবালাকে আমার নিকট রাখিয়া আপনি পলায়ণ করুন। শ্রী * * *"

শৈলবালার নাম পড়িয়া দিলীপ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে পড়িল যেদিন সন্ন্যাসী তাঁহাদের কুটীরে শৈলবালা ও তাঁহার পিতাকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ন্যাসীর হস্তে তিনি এইরূপ কয়েক খণ্ড কাগজ দেখিয়াছিলেন। বালিকার পিতা যখন সেই পত্রখণ্ডগুলিন জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় যথার্থ ই সন্ন্যাসী সেই গুলিন তুলিয়া আনিয়াছিলেন। এখন বৈরাগ্যে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য

হইয়া যাহা নিক্ষেপ করিতেছেন পরে তাহা তাঁহারি কাজে লাগিতে পারে এই ভাবিয়া সন্ন্যাসী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বালিকার পিতা তাহা দেখিতে পান নাই। সন্ন্যাসী সেই পত্র পড়িয়াছিলেন কি না সন্দেহস্থল, কেন না মৃত্যুকালে সে কথার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিম্বা তখন তাঁহার ও কথা স্মরণ ছিল না এমনও হইতে পারে। দিলীপ আত্মপরিচয় সন্ধান করিতে গিয়া শৈলবালার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন "অজ্ঞাত কুলশীলা শৈলবালা কি তবে কুমার তেজসিংহের কন্যা ? আমার শৈলবালা কি তবে সত্যই রাজবংশীয়া ? দিলীপ এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় কল্যাণ তাঁর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। কল্যাণকে দেখিয়া দিলীপ ত্রস্তে সেই পত্রগুলিন লুকাইলেন। গৃহে আসিয়া কল্যাণের সেই ভূমিপতিত বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। রাজপরিচ্ছদ এখানে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। পাগলিনী যখন কিরণকে লইয়া যায় তখন কল্যান ৫।৬ বৎসরের। তখনকার ঘটনা কল্যাণের প্রায় কিছুই মনে ছিল না। যাহা ছিল তাহাও ছায়ামাত্র। তবে বড় হইয়া তাহা সবিশেষ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার চিনিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সেই পরিচ্ছদ দেখিবামাত্র তাঁহার মনে হইল তিনি যেন ঐ পরিচ্ছদ কোথাও দেখিয়াছেন। তিনি দিলীপকে বলিলেন "এ কাহার ?"

দিলীপ। "শুনিয়াছি আমার বাল্যকালের।"

কল্যাণ। "তুমি রাজপরিচ্ছদ কোথায় পাইলে? আমার যেন মনে হইতেছে আমি পূর্ব্বে ইহা কোথাও দেখিয়াছি। তোমার সম্বন্ধে আমার একটী সন্দেহ হইয়াছে। আর তোমার সহিত যখনি আমার সাক্ষাৎ হয়, তোমার কথায় সেই সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়। সে যাহা হউক, তোমার বাল্যকালের বস্ত্র আজ ভূমিতে পতিত কেন?"

দিলীপ। "সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন ঐ বস্ত্রে আমার পরিচয় পাইব সেই জন্য উহা আনিয়া দেখিতেছিলাম। কিছুই না পাইয়া বিরক্ত হইয়া ফেলিয়া দিয়াছি।" কল্যাণ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। দিলী-পের নিকট তিনি যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তাঁহাকে কিরণ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। উত্তরোত্তর তাহা দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। কিন্তু যত দিন না কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তত দিন তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করি-বার ইচ্ছা ছিল না। কেন না, যদি শেষে দিলীপ কিরণ না হন তাহা হইলে সমরসিংহ আশা পাইয়া নিরাশ হইলে আরো অধিক কষ্ট পাইবেন। কল্যাণ বলিলেন "তুমি যে সে দিন বলিতেছিলে, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন তোমার কণ্ঠের কবচে তোমার যথার্থ নাম আছে, তাহা কই আমাকে দেখাইলে না?"

দিলীপ। "কাজে কর্ম্মে আর সময় পাইয়া উঠি নাই। এক

সময় তাহা দেখাইলেই চলিবে।" দিলীপের এখন ইচ্ছা ছিল না যে কল্যাণ অধিকক্ষণ এখানে থাকেন। তাঁহার এখন সেই পত্রের দিকে মন পড়িয়াছিল। কখন কল্যাণ যাইবেন, তিনি আবার সেই পত্র পড়িবেন, তাঁহার শৈলবালার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, এই নিমিত্ত তিনি অধীর হইতেছিলেন এখন কবচ দেখাইলে কল্যাণ পাছে শীঘ্র না যান, সেই জন্য কবচ দেখাইলেন না। কল্যাণেরও এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারও রাজকন্যাকে দেখিতে মন ছুটিতেছিল। পরস্পর উভয়েরি মন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। কল্যাণও এখন কবচ দেখিতে না চাহিয়া যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে সেই অবশিষ্ট পত্রখণ্ড লইয়া সানন্দচিত্তে দিলীপ পড়িতে লাগিলেন। পত্রপাঠে বুঝিলেন, শৈলবালার পিতা, কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের সম্পর্কে পিতৃব্য, দুই জনে কোন বিবাদ হওয়াতে জয়চন্দ্র তেজসিংহকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই রূপ অপমানিত হইয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় তিনি ছদ্মবেশে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই রূপ স্থলে তাঁহার যে পরিচিত লোককে মুখ দেখাইতে লজ্জা করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? দিলীপ পত্রগুলিন বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষু আনন্দলহরীতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, শৈলবালার শৈশবক্রীড়া সকল তাঁহার মনে আসিতে লাগিল,

তাহাকে আর একবার দেখিতে তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি মনোবেগ সম্বরণ করিবার জন্য আবার সেই পত্র গুলিন্ আদ্যোপান্ত পড়িতে লাগিলেন কিন্তু জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার পিতৃব্যের বিবাদের কারণ পত্রে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

এদিকে কল্যাণ দিলীপের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজ-কন্যার গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে গোলাপকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার আর এক কথা মনে পড়িল, তিনি সগর্ব্বে বলিলেন ' কই, রাজকন্যা দুশ্চরিত্রা তাহার প্রমাণ দিতে পারিলে না ?" গোলাপ বলিল "আপনি আমাকে এত বিদ্রূপ করিবেন না। আমার দেখাইতে হইবে না, সত্যই নিজের সত্যতা আপনাকে দেখাইবে, তাহা নহিলে আজ আপনি আসিলেন কেন ? আজ বিজয়ের এখানে আসিবার কথা আছে, আপনি আসিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানাইব না, তাহা হইলেই তিনি গৃহে প্রবেশ করিবেন।" এত মিথ্যা কথা বলিতে গোলাপের ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, চক্ষে জল আসিল, কিন্তু রাজপুত্র তাহা দেখিতে পাইলেন না। গোলাপের কথায় কল্যাণের হৃদয় যেন একটু বিচলিত হইল। বিজয়ের নাম শ্রবণে যমুনাতটে রাজকন্যার যে ভাবান্তর হইয়াছিল সহসা তাহা মনে পড়িল। বারম্বার ঘর্ষণে কাষ্ঠে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ইহা

স্পর্শমাত্র। এখনো জ্বলিল না। স্ফুলিঙ্গে কোন ফল হইল কি না এখনো প্রকাশ পাইল না। কল্যাণ মনে মনে বলিলেন "তবে গোলাপ যা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? সে দিন উষাবতী সেই জন্যই কি আমার সম্মুখে বিজয়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন" তিনি গোলাপকে বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়, যদি বিজয় আজ এখানে আসে, তাহা হইলে হয় তো বিশ্বাস করিব।" কল্যাণ সেখান হইতে রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, রাজকন্যা করপল্লবে মুখপদ্ম লুক্কায়িত করিয়া পালঙ্কোপরি শুইয়া আছেন। রাজপুত্র নিঃশব্দে নিকটে আসিলেন। রাজকন্যা তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কল্যাণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মনে রাজকন্যার প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। আপন মনে বলিলেন "ছিঃ, আমি কি পাপিষ্ঠ!" রাজপুত্রের স্বর শুনিয়া উষাবতী চমকিয়া মুখ হইতে হস্তোত্তোলন করিলেন। যুবরাজ এবার তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, তিনি রোদন করিতেছেন।

যদি কেহ কখনও এরূপ দেখিয়া থাকেন, তিনিই মনে করিয়া দেখুন, সুন্দরী যুবতীর বদনমণ্ডল নিঃশব্দ রোদনে কি প্রকার মনোহর হয়? ইহা কি রমণীগণের হাস্যপূর্ণ বদন হইতে অধিকতর মিষ্ট নহে? সুন্দর গোলাপ যখন

নীহার বিন্দুতে অবনত হইয়া পড়ে, তখন কি তাহা না? রমণীয় হয় না? সূর্য্যের প্রখর উজ্জ্বল রশ্মির পরিবর্ত্তে স্বর্ণহীনকান্তি চন্দ্র অপরিস্ফুট প্রশান্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকেন, তখন কি পৃথিবী আরো অধিক শোভিত হয় না? দিবার শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল গগনপ্রান্ত দিয়া যখন মধ্যে মধ্যে এক একবার কৃষ্ণবর্ণ মেঘ চলিয়া যায়, তখন কি সেই উজ্জ্বলতার আরো শ্রীবৃদ্ধি হয় না?

উষাবতীর স্ফীত আরক্তিম নয়নপল্লব নীহারসিক্ত গোলাপের ন্যায় অল্পে অল্পে বারিবিন্দুতে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণ হইলে ক্রমে তাহা কপোল ভাসাইয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন নিঃশব্দে মৃদু নির্ঝর ছুটিতেছে। তাঁহার সুচিক্বণ কেশজাল পুষ্পবেষ্টিত মোহন কবরী রূপে আবদ্ধ নাই, আলু থালু হইয়া মুখে বক্ষে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থান অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্পন্দনহীন ও অশ্রুসিক্ত চক্ষু অবনত, শরীর স্তম্ভিত, ওষ্ঠাধর মুদ্রিত, ক্ষণে ক্ষণে কেবল এক একবার তাহা অল্প অল্প স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। রাজপুত্র তাঁহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। মনে হইল, এমন সুন্দর বুঝি আর তাঁহাকে কোন দিন দেখেন নাই। তিনি কিছু পরে মুগ্ধের ন্যায় বলিলেন "উষা! কাঁদিতেছ কেন?" রাজকন্যা কথা কহিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারও কথা সরিল না, আরক্তিম বদনখানি ধীরে ধীরে আপনা হইতে নত

পড়িল—বিষন্ন মুখটি সরমরাগে শোভিত হইল যুবরাজ সোহাগের অভিমান ভরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার যেন কি বলিতে গেলেন, কিন্তু আবার বাধিয়া গেল পারিলেন না। কি জন্য কাঁদিতেছেন, বলিতে কিসের যে এত লজ্জা নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। রাজপুত্র প্রেমমাখা মধুময় স্বরে আবার প্রশ্ন করিতে করিতে উষার হাতটি ধরিয়া গৃহের পার্শ্বস্থ একটী শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত বারণ্ডায় গমন করিলেন। এই সময় একজন পুরুষ হঠাৎ রাজকন্যার গৃহের বারণ্ডার দ্বারে আসিয়া কল্যাণকে দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রদৃষ্টে মেষের ন্যায় পলায়ন করিল। রাজপুত্র বিজয়কে চিনিতে পারিলেন। এই বার চেষ্টা সফল হইল, কাষ্ঠে অগ্নি ধরিল, হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে একবার প্রলয়বিপ্লবে বিলোড়িত হইয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন বিদ্যুৎ ক্ষরিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, ক্রোধে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইল, তিনি বেগে রাজকন্যার হস্ত ছুড়িয়া ফেলিলেন। রাজকন্যা আপন দুঃখে ব্যস্ত থাকিতে বিজয়কে দেখিতে পান নাই, হঠাৎ কল্যাণের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। রাজকন্যা এতক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখেন নাই, এইবার তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার সেই আরক্তিম মুখ দেখিয়া ভীত হইলেন। কল্যাণ বলিলেন "পাপীয়সি! তুমি কেন কাঁদিতেছিলে এখন বুঝিলাম?

সেই জন্ত বুঝি আমাকে উত্তর দিতে পারিলে না? হঠাৎ কি বলিয়া উত্তর দিবে বুঝি যোগাইলনা। আমি যেমন নির্ব্বোধ! আমি ভাবিতে ছিলাম বুঝি আমিযুদ্ধে যাইব বলিয়াই কাঁদিতেছিলে? অন্যের জন্য ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।” উষাবতী এবার না কথা কহিয়া থাকিতে পারিলেননা। অতি কাতর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন “তোমার জন্যই কি কাঁদি নাই?”

কল্যাণ। “দুশ্চরিত্রা হইলে কপটতা তাহাদের অলঙ্কার স্বরূপ! তুমি আমার জন্ত কাঁদিতেছিলে? তাই বিজয়ের নাম শুনিয়া সে দিন তোমার ভাবান্তর হইল?”

উষা। “আমি দুশ্চরিত্রা—ইহা তোমার মুখ হইতে বাহির হইল, আর আমাকে সজীব থাকিতেও তাহা শুনিতে হইল?” রাজকন্যার মস্তকে বজ্র পড়িল। রাজপুত্র যে তাহাকে সন্দেহ করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন, কেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কল্যাণ বলিলেন “হাঁ, তুমি সতী, তাই বিজয়কে প্রণয়োপহারস্বরূপ অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিলে? তুমি সতী, তাই তাহাকে ভালবাসিয়াও আমাকে স্বামীরূপে বরণ করিতেছিলে? পাপীয়সি! তুমি কেবল দুশ্চরিত্রা হইয়াও ক্ষান্ত ছিলে না। কুহকিনীর ন্যায় মিথ্যা প্রণয়পাশে আমাকে বদ্ধ করিয়াছ। তুমি দুশ্চরিত্রা জানিয়াও আমি সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। জন্মের মত আমার সুখ বিলুপ্ত হইল। উঃ, আমি কি মুগ্ধ

হইয়াছিলাম—গোলাপের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করি নাই, স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না।” কল্যাণের কথায় রাজকন্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে গেলেন “স্বচক্ষে কি দেখিয়াছ? আর আমি কখনই বা বিজয়কে অঙ্গুরী দিয়াছি?” রাজপুত্র আর অধিক কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন “থাক্, থাক্—যাহা করিয়াছ যথেষ্ট হইয়াছে? আর মিথ্যা বলিয়া পাপ বাড়াইতে হইবে না। চাক্ষুষ প্রমাণ না পাইলে তোমার কথা বিশ্বাস করিতাম। আমি তোমাকে কিছু বলিব না। তোমার হৃদয়ই তোমাকে নরকযন্ত্রণা দিবে। আমি চলিলাম। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। সুখের বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম, জনমের মত বিদায় লইলাম। তোমার এক সময় ইহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যদি মনে ভয়—অনুতাপ কর, প্রায়শ্চিত্ত কর।” এই বলিয়া রাজপুত্র বারণ্ডা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। রাজকন্যা এতক্ষণ মৌনে কাঁদিতেছিলেন। এবার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মূর্চ্ছিত হইয়া সেই শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত বারণ্ডায় পড়িয়া গেলেন। রাজপুত্র তাহা দেখিতে পাইলেন না। গোলাপ এতক্ষণ দ্বার হইতে লুকাইয়া সব দেখিতেছিল, রাজকন্যাকে পড়িতে দেখিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল, আর সে আপনার সুখ ইচ্ছা করিল না। কল্যাণকে সব খুলিয়া বলিতে তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু এখন সে সময় নাই। তাঁহাকে

বলিতে গেলে রাজকন্যার মূর্চ্ছাভঙ্গ কে করে? গোলাপ শীঘ্র-গতি রাজকন্যার চেতনা সম্পাদন করিতে গেল। ভাবিল রাজ-কন্যাকে সুস্থ করিয়া তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া পরে কল্যাণকে বলিবে। সে বারণ্ডায় আসিয়া দেখিল শীতনীহার-কুঞ্চিত কমলের ন্যায় রাজকুমারী এলাইয়া পড়িয়াছেন। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কপালে ওষ্ঠে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরি-তেছে। গোলাপ জল আনিয়া রাজকন্যার মুখে চক্ষে সিঞ্চন ও বায়ু সেবন করাতে তাঁহার একবার জ্ঞান হইল, কিন্তু পরেই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন গোলাপ মনে মনে ভীত হইল। সে আর রাজকন্যার অবস্থা গোপনে রাখিতে সাহসী হইল না। জনৈক পরিচারিকা দ্বারা রাজমহিষীর নিকট তাঁহার অসুখ সংবাদ প্রেরণ করিয়া, আপনি ক্রোড়ে করিয়া তাঁহাকে পালঙ্কে আনিয়া শয়ন করাইবার নিমিত্ত তুলিল। কিন্তু এ আবার কি? বিন্দু বিন্দু রক্তধারা অমনি রাজকুমারীর কপালে গড়াইয়া পড়িল। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল কেশজাল রক্তে ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। সে আরও ভীত হইল। বুঝিল, রাজকুমারী পাষাণে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে আস্তে আস্তে শোণিত ধৌত করিয়া পালঙ্কে আনিয়া শয়ন করাইল।

এ দিকে দাসী সেই সংবাদ লইয়া রাজমহিষীর গৃহে উপস্থিত হইল। মহিষীর বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর হইবে। তাঁহাকে এখন প্রৌঢ়যৌবনা বলিলেই হয়। তিনি রূপে আলো করিয়া

বসিয়া আছেন; সম্মুখে একজন সভাসদ আগত যুদ্ধের বন্দোবস্ত জ্ঞাত করাইতেছে। তিনি দাসীকে দেখিয়া তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল "রাজকন্যার অসুখ হইয়াছে, আপনাকে সেখানে যাইতে হইবে।" ঊষাবতী তাঁহার একমাত্র সন্তান, কন্যার কিছু হইলে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইতেন। তিনি অসুখ হইয়াছে শুনিবামাত্র সভাসদকে বিদায় দিয়া রাজকন্যার গৃহে আসিলেন। দেখিলেন রাজকন্যা মৃতবৎ শুইয়া আছেন, গোলাপ সজ্ঞান করিতে চেষ্টা করিতেছে। মহিষী গোলাপকে তাঁহার অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোলাপ নিরুত্তর, মুখে কথা নাই। বিচারালয়ে অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় গোলাপ ভীত হইল। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, কথা ফুটিল না। কেবল তাহার নীরব দরবিগলিত অশ্রুধারা রাজমহিষীর কথার উত্তর দিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া পরিচারিকাগণ এই সময় কথা কহিবার সুযোগ বুঝিয়া ঐ বিষয়ে আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ অতি কষ্টে চক্ষে দুএক ফোঁটা জল আনিয়া তাহা মহিষীকে দেখাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল, কেহ যন্ত্রণ দ্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মহিষী [illegible] পড়িতে পাইতেছেন কি না, সন্দেহ করিয়া তাঁহার পাদে [illegible] আপ-বসিল, সকলেই রাজকুমারীর পীড়ার এক এক [illegible] বলিতে করিতে লাগিল, শেষে এক জন প্রবীণা [illegible] তাঁহাকে

বলিল—"না, না, ওসব কথা কিছু নয়। আজ কল্যাণ এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের কথা হয়ে থাক্‌বে? তিনি যতক্ষণ ছিলেন কথায় বার্ত্তায় ভাল ছিলেন, তিনি গেলে যুদ্ধের কথা মনে তোলপাড় করেছেন, বিপদ আশঙ্কা মনে এসেছে, ছেলে মানুষ ভয় পেয়েছেন, কাজেই সেই জন্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।" সকলেই বলিয়া উঠিল "এই ঠিক।" রাজমহিষীরও এই কথা মনে লাগিল। তাহা ভিন্ন তিনি আর অন্য কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি সকলকে নিস্তব্ধ হইতে আজ্ঞা দিয়া চিকিৎসক আনিতে প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক আসিয়া দেখিলেন এখনো জ্ঞান হয় নাই, সেই সমভাবেই আছেন, কিন্তু অজ্ঞানাবস্থাতেই জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। রাজকন্যা কোথায়, কি প্রকারে কতক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, চিকিৎসক আসিয়া সকল শুনিলেন। প্রস্তরাঘাতে মস্তক রক্তাক্ত হইয়াছিল শুনিয়া চিকিৎসক মস্তক উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বলিলেন "মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তাহাই আর চেতনা হইতেছে না। [illegible] সেই জন্যই জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। মস্তকের যেরূপ [illegible] দেখিতেছি সাংঘাতিক হইবার সম্ভব। আমি একেলা [illegible]ৎসা করিতে সাহস করি না।"

এ[illegible]পনীয় ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজচিকিৎসক উপস্থি[illegible]াৎ অন্যান্য চিকিৎসক আনিতে প্রস্থান করিলেন। এখন প[illegible]হিষী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বুঝি

একমাত্র কন্যা রত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কন্যার শুশ্রূষা করিতে বসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণ গৃহে আসিয়া প্রথমতঃ আশু মৃত্যুর উপায় ভাবিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবন উত্তরোত্তর এরূপ ক্লেশকর হইয়া উঠিতে লাগিল যে এই আসন্ন যুদ্ধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও তাঁহার নিকট একযুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অথচ তাহা ভিন্ন আর অন্যরূপ সম্মানজনক মৃত্যুর উপায় না দেখিয়া অগত্যা যুদ্ধ পর্য্যন্ত কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে মৃত্যুর উপায় এক প্রকার স্থির হইলে তখন তাঁহার অন্য অন্য কথা মনে হইতে লাগিল। একে একে পিতা, মাতা (বিমাতা,) চিতোর, সকলই মনে আসিল। সেই সুখময় জন্মভূমি, সেই রম্য পাহাড়াবৃত চিতোরনগরী, আর সেখানে যাইতে হইবে না, শেষ দেখা দেখিয়া আসিয়াছেন। মরিবার জন্যই স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিমাতা কমলদেবী—তিনি কল্যাণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাঁহার সহিত জন্মশোধ সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া-

ছেন। তাঁহার মধুরস্নেহময়-মিষ্টস্বর আর কখন শুনিতে পাইবেন না। বাল্যকাল হইতে কল্যাণ মাতৃহীন, কিন্তু কমলদেবীর গুণে মাতৃহীন কাহাকে বলে তাহা কল্যাণ জানিতেন না। কমলদেবীই তাঁহার মাতা ছিলেন। তাঁহাকেই আপন মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মৃত্যুকালে একবার তাঁহার সহিত শেষ দেখা হইবে না। মরিবার পূর্ব্বে একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারিবেন না। পিতা সমরসিংহ, তাঁহার স্নেহপূর্ণ পুত্রবৎসল পিতা, সেই পিতাকে এইবার জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে। পিতার স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তি তিনি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার মধুময় উপদেশ আর কখন তাঁহার কর্ণ শীতল করিবে না। কল্যাণ সমরসিংহের নয়নানন্দ-বর্দ্ধক, বার্দ্ধক্যের আশা, জীবনের সুখ, কিরণ হারাইয়া অবধি কল্যাণই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি মরিলে তাঁহার পিতার হৃদয় শূন্য হইবে। কি প্রকারে সমরসিংহ তাহা সহ্য করিবেন? কল্যাণের মৃত্যু হইলে পুত্রবৎসল পিতা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন। পিতার কথা মনে করিয়া কল্যাণের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। হায়! তিনি যখন চিতোর হইতে আসিতেছিলেন, তখন কে মনে করিয়াছিল যে তিনি এমন ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিবেন। যখন রাজকন্যার প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, তখন কে মনে করিয়াছিল যে পরিণামে এই হইবে! তখন চারিদিকে সুখ, আশা, প্রেম, রাজকন্যা,

এই দেখিয়াছিলেন। যদি যুদ্ধে মরেন, ত সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, রাজকন্যার মুখ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার মৃত্যুতে রাজকন্যার কাতরতা ও ক্রন্দন ভাবিয়া আপনিও তাঁহার দুঃখে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে মরিবেন—এই মনে করিয়াছিলেন। কে জানিত যে মৃত্যুকালে স্নেহময়ী রাজকন্যা না দেখিয়া বিষধরী ভুজঙ্গিনী দেখিতে দেখিতে, জীবন সুখকর মনে না করিয়া ঘৃণাকর মনে করিতে করিতে, রাজকন্যাকে প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন না করিয়া পাপীয়সী বলিয়া তিরস্কার করিতে করিতে, প্রেমাশ্রুর স্থানে বৈরাগ্যাশ্রু ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন? তিনি যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিবেন এই বা কে জানিত? হয় ত যুদ্ধে যবনপরাজয় করিয়া জয় জয় নাদের মধ্য দিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিবেন। জয়পতাকা উড্ডীয়মান করতঃ পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, পতি পত্নীতে, সাশ্রুনয়নে আনন্দিতচিত্তে পরস্পর আলিঙ্গন করিবেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন। যুদ্ধ শেষে তাঁহাদের বিবাহ হইবে। পৃথ্বীরাজ উষাবতীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন, হর্ষউথলিত চিত্তে, আশাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। উষাবতী, প্রেমময়ী উষাবতী, রমণীরত্ন উষাবতী, তাঁহার হইবেন! উষাবতীর মুখে আনন্দ বিভাসিত হইবে। কল্যাণেতে তিনি সকল সুখ দেখিবেন। বিবাহ করিয়া নববধূ লইয়া কল্যাণ আবার চিতোর যাত্রা করিবেন। বধূ দেখিয়া বিমাতার

আহ্লাদের সীমা রহিবে না। এই সকল কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছিল।

হায়! এখন সেই সকল আশা সমূলে ছিন্ন হইল, কল্যাণের সুখপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে সমরসিংহ অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবেন ও তাঁহার আশা ভরসা সকল বিলুপ্ত হইবে এই ভাবিয়া এক একবার কল্যাণ মৃত্যু বিষয়ে বিচলিত হইতে লাগিলেন। অন্য অন্য নানা কথার সহিত তাঁহার মনে হইল—তাঁহার মৃত্যু হইলে চিতোরাধিপতি কে হইবে? কেন না, তিনি শুনিয়াছিলেন সমরসিংহ তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতাকে রাজ্য দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা রাজা হইবার উপযুক্ত নহেন। তিনি মরিলে তবে চিতোরের দশা কি হইবে? সমরসিংহ তো এখন প্রৌঢ় হইয়াছেন, আর অধিকদিন রাজ্যভার স্বহস্তে রাখিতে সক্ষম হইবেন না, এবং বারম্বার শোক পাইতে পাইতে শীঘ্রই অধিক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারেন। কল্যাণ মরিলে তবে রাজ্য কে দেখিবে? তিনি অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন "মরিলে সুখী হইব, কিন্তু মৃত্যুর পরেও আবার বিঘ্ন! আঃ—কিরণ যদি থাকিত, তবে এ সকল বাধা কিছুই থাকিত না, নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে মরিতে পারিতাম, পিতার জন্যও ভাবিতে হইত না, চিতোরের জন্যও ভাবিতে হইত না। কিরণ থাকিলে আমার মৃত্যু, পিতারও তত কষ্টদায়ক হইত না। কিরণের প্রতি তাঁহার স্নেহ, আশা, ভরসা

সকল সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন। কিরণ থাকিলে পিতা তাঁহাকে রাজা করিতেও কিছু আপত্তি করিতেন না।” কিরণের কথা মনে হইতে হইতে তাঁহার দিলীপের কথা মনে হইল। দিলীপের কথায় আবার তাঁহার কবচের কথা মনে পড়িল। এই সময় দিলীপসিংহ এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যদিন দিলীপকে দেখিলে কল্যাণ হাসিয়া আহ্বান করিতেন, অদ্য তাঁহাকে বিষণ্ণ ও কথা কহিতে না দেখিয়া দিলীপ সঙ্কুচিতভাবে গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কল্যাণ কিছু পরে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিয়া বলিলেন “কি?—কোন প্রয়োজন আছে? আমি এখনি তোমার নিকট যাইব মনে করিতে ছিলাম, সেই কবচ দেখিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।” দিলীপ বলিলেন “আপনার নিকট আমার অন্য প্রয়োজন নাই, সেই কবচ দেখাইতেই আসিয়াছি।” দিলীপ গলদেশ হইতে স্বর্ণহারযুক্ত কবচ উন্মোচন করিয়া কল্যাণের হস্তে দিলেন। কবচাঙ্কিত নাম পড়িয়া কল্যাণ আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, কিরণ নাম খোদিত একটী রক্ষাকবচ কিরণের গলে থাকিত এবং সেই জন্যই দিলীপের কবচ দেখিতে তিনি ওরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন “এ কবচ সন্ন্যাসী কোথা পাইয়াছিলেন?”

দিলীপ। “আমার গলে?”

কল্যাণ। "আচ্ছা, সন্ন্যাসী কোন্ দেশে তোমাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন তাহা কি তুমি জান? আমি তোমার মুখে অন্য অন্য সকল কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ঐ কথা শুনি নাই।"

দিলীপ। "তিনি বলিয়াছিলেন, চিতোরে।"

কল্যাণ। "চিতোরে?" দিলীপ বলিলেন "হাঁ—"

কল্যাণ। "সন্ন্যাসীর মুখে তুমি তোমার বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছ, আমাকে সে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই।"

দিলীপ। "সন্ন্যাসী এক দিন ঝড়ের পররাত্রে চিতোর-নগরের নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তীরে আমাকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া তুলিয়া সজীব করিয়া আমাকে সেই অবধি সন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তখন অবধি আমার গলে এই কবচ ছিল। সন্ন্যাসী মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন 'এই কবচে তোমার যথার্থ নাম আছে।' শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। 'তুমি চিতোর'—শেষে এই টুকু বলিয়া তাঁহার জীবন ত্যাগ হইল। এখানে আসিয়া কবচে কি লিখিত আছে, তাহা এক দিন আমি পড়িয়া দেখিয়াছিলাম। কিন্তু জলনিমগ্ন বস্ত্র দেখিয়া আমি যেমন আত্মপরিচয় পাইলাম, ইহাতেও তেমনি পরিচয় পাইয়াছি। ইহাতে লিখিত আছে 'কিরণ সিংহ।' কিন্তু কিরণসিংহ দেখিয়া আমি কি প্রকারে পরিচয় পাইব।

পিতার নাম থাকিলে বরং আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। আমার আর পরিচয় পাইবার আশা নাই। আমার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত যদি আপনার কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে আপনিও তাহা পরিতৃপ্ত করিবার আশা ত্যাগ করুন।” কল্যাণ আর অধিক ক্ষণ তাঁহার আনন্দ গোপন রাখিতে পারিলেন না। দিলীপ যে কিরণসিংহ তাহাতে আর তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। তাঁহার নিরাশ ভগ্ন হৃদয়েও একটু আশার সঞ্চার হইল, সেই গভীর দুঃখের মধ্যেও একটু আনন্দ উদয় হইল। তিনি বলিলেন “তোমার পরিচয় আমি জ্ঞাত হইয়াছি। আমার কৌতূহল নিবারিত হইয়াছে। পরিচয় পাইবে না মনে করিয়া তোমার আর নিরাশ হইতে হইবে না। আমি তোমাকে তোমার পরিচয় প্রদান করিব। তুমি যে আমার বন্ধু হইতে নিকটতর, তাহা অদ্য আমি জানিতে পারিলাম। এত দিন যাহা আমি মনে মনে সন্দেহ করিতাম, কিন্তু নিতান্ত দুরাশা জ্ঞানে যে সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিতাম না, সেই সন্দেহ আজ সত্য হইল, এত দিনের দুরাশা আজ সফল হইল। আমি সর্ব্বদাই এই আশা করিতাম, এই ইচ্ছা করিতাম, যেন এই হৃদয়বন্ধু, এই প্রিয়সখা দিলীপ আমার সেই স্নেহের ধন কিরণসিংহ হয়। সত্য সত্যই আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল, জানিলাম, যথার্থই তুমি আমার কনিষ্ঠ, তুমি আমার কিরণ, এস, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া এত দিনের সাধ পূর্ণ করি।” কল্যাণ

স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সবিশেষ খুলিয়া বলিলেন। দিলীপ আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে বাকশক্তিহীন হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। কল্যাণ আবার বলিলেন "এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমি কিরণকে পুনঃপ্রাপ্তি ইচ্ছায় ব্যাকুল হইতেছিলাম, সেই জন্য দেবী চতুর্ভুজা আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। আমি ভাবিতেছিলাম আমি মরিলে চিতোরের দশা কি হইবে, পিতার শোক নিবারণের কি হইবে, তাই চতুর্ভুজা তোমাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।" দিলীপ কল্যাণের কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আত্মপরিচয় পাইয়া যে আহ্লাদ হইয়াছিল, সহসা কল্যাণের মুখে তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া অমনি তাঁহার হৃদয়ে সে আহ্লাদ মিশাইয়া গেল, আর প্রকাশ পাইল না। কল্যাণ বলিলেন "আমার কথায় আশ্চর্য্য হইও না। যাহা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।" দিলীপ আরো আশ্চর্য্য হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কল্যাণের কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। কল্যাণ বলিলেন "পিতার মৃত্যুর পর আমি রাজ্যাধিকারী তাহা বোধ হয় তুমি জান। আজ আমার সেই স্বত্ব তোমাকে দান করিলাম। তুমিই আজ অবধি চিতোরের যুবরাজ। তুমিই ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবে।"

কল্যাণের কথার অর্থ কিরণসিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এক বার মনে করিলেন "কল্যাণ কি তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন? তাঁহাকে পরীক্ষার্থে ঐরূপ বলিতেছেন?" কিন্তু আবার যখনি তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই যৌববদন অস্বাভাবিক গম্ভীর ও বিষাদাঙ্কিত দেখিলেন, অমনি তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল, হৃদয় ব্যথিত হইল, সহসা মনে হইল কল্যাণ কোন গভীর ব্যথা পাইয়া ঐরূপ বলিতেছেন। মনে করিতেও তিনি সিহরিয়া উঠিলেন, তিনি মন হইতে উহা দূর করিতে গিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন "না না না—তাহা হইতে পারে না—ভগবতি—এ স্বপ্ন—" কল্যাণ অমনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ভ্রাতঃ! স্বপ্ন নহে। আমি সত্যই মরিব।" দিলীপ চমকিয়া উঠিলেন, মনের কথা মনেই মিশাইল, শেষ করিতে পারিলেন না। কল্যাণ বলিলেন "আশ্চর্য্য হইও না, আমি এই যুদ্ধে মরিব। তুমি চিতোরে যাও, যুদ্ধে থাকিও না। যদি দুই জনে যুদ্ধে মরি, তবে পিতার উপায় কি হইবে? চিতোরেরই দশা বা কি হইবে?" কিরণসিংহ এবার মনে করিলেন যুদ্ধে যদি প্রাণ বিনষ্ট হয়, এই চিন্তাই বুঝি আজ তবে কল্যাণকে এত বিচলিত করিয়াছে, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আপনি যদি উহা ভাবেন, তবে আপনি চিতোর গমন করুন। আমিই যুদ্ধে যাইব, আমিই এইখানে থাকি।—কিন্তু আপনার আজ মৃত্যুভয় কেন

আসিতেছে? আপনি যে বীরপুরুষ, আপনার ও চিন্তা কেন?”

কল্যাণ। “না, আমি মৃত্যু ভয় করিতেছি না, মৃত্যু ইচ্ছা করিতেছি।

কিরণ। “কি! যুবরাজ কল্যাণ আজ মৃত্যু ইচ্ছা করিতেছেন? যিনি পিতার স্নেহে পরম সুখী, যাঁহার নামে প্রজাগণ অহ্লাদে মত্ত হয়, শৌর্য্যে বীর্য্যে যিনি জগত প্রশংসনীয়, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, যিনি সকল সুখেই সুখী, তাঁহার আজ জীবনে বৈরাগ্য উপস্থিত, ইহা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলেন? যুবরাজ! ও কথা বলিয়া আর আমাকে ব্যথিত করিবেন না।”

কল্যাণ। “তোমার যদি আমার প্রতি একটুও ভালবাসা থাকে, তবে আর আমার বাঁচিবার সাধ করিও না, মরিলেই আমি সুখী হইব। কিরণসিংহ! আজ একজন পথের ভিখারীও আমা হইতে অধিক সুখী, কালও আমি সুখী ছিলাম, কালও তুমি আমাকে সুখী বলিতে পারিতে, কিন্তু আজ হইতে আমাকে আর কেহ সুখী-বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিবে না।” এই কথা বলিয়া কল্যাণ থামিলেন, অমনি দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি ভূমে পড়িল, কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন “তুমি কি কাহাকেও কখন ভাল বাসিয়াছ? যদি ভাল বাসিয়া কখন নিরাশ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারিবে; কিন্তু দেখি

আশাপূর্ণা করুন, তাহা যেন না হয়।" সেই বীরনেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে দেখিয়া কিরণের হৃদয় যেন দলিত হইল, তিনি বুঝিলেন, নিতান্ত গভীর দুঃখ না হইলে কল্যাণের ওরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত না। তিনি বলিলেন "আপনি ভাল বাসিয়া কি প্রকারে নিরাশ হইলেন। মহারাজ তো আপনাকেই জামাতা করিবেন। তবে কি রাজকন্যা আপনার যথার্থ প্রণয়পাত্রী নহেন?" কল্যাণ ভগ্নহৃদয়ে বলিলেন "হাঁ, সেই পাপীয়সীই আমার যথার্থ প্রণয়িণী, তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী জানিয়াও আমি ভুলিতে পারিতেছি না।" দিলীপ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি! রাজকন্যা বিশ্বাসঘাতিনী? ইহা আপনি কি প্রকারে সম্ভব জ্ঞান করিলেন?" এই কথায় রাজপুত্রের শোণিত আবার উষ্ণ হইয়া উঠিল, বহুকষ্টে এত ক্ষণ কথঞ্চিৎ চিত্তকে শান্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আর সমভাবে রাখিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, হাঁ সেই পাপীয়সী—সেই বিশ্বাসঘাতিনী—সেই দুশ্চারিণী—না—থাক থাক, জ্ঞান শূন্য হইয়া কাহার নাম উচ্চারণ করিতেছি, তাহার নাম করিলেও মুখ কলঙ্কিত হয়, আর না, সে কথা আর তুলিও না। দিলীপ আশ্চর্য্য হইলেন, কিছু না বুঝিয়া-অথচ দারুণ ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রাজকন্যার সম্বন্ধে কল্যাণকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। নিতান্ত কাতরচিত্তে কল্যাণকে মৃত্যুইচ্ছা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছু-

তেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না দেখিয়া, অগত্যা দিলীপ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। দিলীপ বলিলেন "তবে আমি যুদ্ধের পূর্ব্বেই চিতোর যাত্রা করিব। কিন্তু আমাকে আপনার একটি অনুমতি দিতে হইবে। আমি অগ্রে এখান হইতে কবিচন্দ্রের উদ্ধার জন্য যাইতে ইচ্ছা করি। তাঁহার উদ্ধারের পর তখন চিতোর যাইব।"

কল্যাণ। "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি যুদ্ধের সময় এখানে না থাক, এই আমার প্রধান ইচ্ছা। চন্দ্রপতির উদ্ধার জন্য যাইলে তো আর তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, আর তাহা হইলেই পিতা সুখী হইবেন। পিতা সুখী হইবেন জানিলেই আমি সুখে মরিতে পারিব। তবে আমাদের এই জন্মশোধ সাক্ষাৎ হইল?"

দিলীপ সজলনয়নে বলিলেন "না, আজ আপনি ও কথা বলিতে পারেন না। যখন যাইব, তখন—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিলীপ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কষ্টে অশ্রুজল নিবারণ করিয়া সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণ-প্রমুখাৎ সেই দিনই সমরসিংহ তাঁহার অপহৃত বালক কিরণসিংহের পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। অনেক দিন পরে আজ সহসা তাঁহার সেই গম্ভীর যোগীন্দ্র মুখমণ্ডলে আনন্দ বিভাসিত হইল। তিনি কিরণকে তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। কম্পিত কলেবরে স্পন্দিত হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কল্যাণ দিলীপকে লইয়া আসিলেন। দিলীপকে দেখিয়া বিস্ময়ে সমরসিংহের চক্ষের পলক পড়িল না, স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, কথা ফুটিল না, নীরবে, স্পন্দনহীনলোচনে প্রস্তরপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ কি! এই দিলীপ কি তাঁহার কিরণ-সিংহ? এই কি তাঁহার সেই অপহৃত বালক? সেই জন্যই কি দিলীপকে প্রথম দেখিবামাত্র তাঁহার কিরণকে মনে পড়িয়াছিল? সেই জন্যই কি তাহাকে দেখিয়া তাঁহার সন্তানস্নেহ জন্মিয়াছিল? এই সুন্দর নেত্ররঞ্জক যুবাপুরুষ কি সত্যই তাঁহার কিরণ? তাঁহার সেই তিন বৎসরের শিশু কি এখন এত বড় হইয়াছে? সত্য সত্যই কি আবার তাঁহার কিরণ তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। তিনি কি আবার

আশাতীত ফল পাইবেন? দিলীপকে দেখিয়া এই প্রকার চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া কিরণের এত দিনকার জীবনবৃত্তান্ত কল্যাণ আস্তে আস্তে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি প্রকারে সন্ন্যাসী নদীতীরে কিরণকে প্রাপ্ত হইয়া আপন সন্তান-রূপে পালন করিয়াছিলেন, প্রথমে তাহা বলিলেন। ক্রমে দিলীপের সহিত সন্ন্যাসীর মৃত্যুকালের কথোপকথন, তাঁহার জলনিমগ্ন পরিচ্ছদ বৃত্তান্ত, যে স্বর্ণকবচে দিলীপের যথার্থ নাম কল্যাণ জ্ঞাত হইলেন, সেই স্বর্ণকবচের কথা, সকল বলিলেন। সমরসিংহের এই বার চমক ভাঙ্গিল। এতদিন যে দুঃখে তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আজ তাহা তিরোহিত হইল, সেই গম্ভীর রাজর্ষিও আজ ক্ষণকালের নিমিত্ত হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা গোপন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি হর্ষ-বিহ্বলচিত্তে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাকে চুম্বন করিলেন, ক্রোড়ে বসাইলেন, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার কপোল ভাসিয়া গেল। তাঁহার যে কতদূর আনন্দ হইল লেখনীর দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই।

ক্রমে সমরসিংহ শান্ত হইলে নানা কথার পর কল্যাণ কিরণসিংহকে (আমরা এখন এই নামেই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত দিলীপকে উল্লেখ করিব) যুদ্ধের পূর্ব্বেই চিতোর পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন

"কিরণ এখনও উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা করে নাই, উহাকে এই যুদ্ধমধ্যে রাখা উচিত নহে। উহাঁকে চিতোর প্রেরণ করুন। আমরা যদি দুই জনেই এই যুদ্ধে মরি, তাহা হইলে আপনি অতিশয় মনোবেদনা পাইবেন। আর চিতোরের রাজাই বা কে হইবে? কিন্তু কিরণকে চিতোর প্রেরণ করিলে আপনার আর সে ভয়ে ভীত হইতে হইবে না।" এই কথা সমরসিংহের মনে লাগিল। এত কষ্টের পর কিরণকে পাইয়াই আবার যদি যুদ্ধে হারান, কিরণ সিংহাসনে বসিয়া চিতোরের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিবে, তাঁহার হৃদয়ে এই যে গূঢ়তর আশা তাহাও যদি আবার উন্মূলিত হয়, এই ভাবিয়া সত্য সত্যই তিনি চিন্তিত হইলেন। তিনিও কল্যাণের সহিত একমত হইলেন। কিরণকে শীঘ্র চিতোর প্রেরণ করাই স্থির হইল। কিরণসিংহ চিতোর যাইবার পূর্ব্বে চন্দ্রপতির উদ্ধার সাধন করিতে সমরসিংহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কল্যাণ বুঝাইয়া বলায় সমরসিংহ তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কিরণ-সিংহ চন্দ্রপতির উদ্ধার নিমিত্ত যাইতে অনুমতি পাইলেন।

কিরণ দিল্লি আসিয়া অবধি এত কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও শৈলবালাকে ভুলিতে পারেন নাই। কবে যুদ্ধ শেষ হইবে, কবে তিনি আজমীরে শৈলবালার উদ্দেশে গমন করিবেন, এই চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহাকে চিন্তিত করিত। সকলেরই দিন কাটিয়া যাইত, তাঁহার দিন আর ফুরাইত না।

শৈলবালার কথা মনে করিতে তাঁহার কত কথা মনে আসিত। প্রথমে যখন শৈলবালা তাঁহাদের কুটীরে আসিয়াছিল তখন তাঁহার বয়স চারি বৎসর। তখনকার তাহার সেই বাল্যভাব, তাহার সেই আধ আধ মধুর স্বর মনে পড়িত, তখন তাঁহারা দুই জনে কত প্রকার শৈশব ক্রীড়া করিতেন, তাহা মনে পড়িত। শৈলবালা যখন কোন কারণ বশতঃ কাঁদিত, তিনি তাহাকে কি প্রকারে ভুলাইতেন, তাহা মনে পড়িত। অন্য কিছুতে না থামিলে তিনিও কাঁদিতেন, তখন সে বলিত "না, আর আমি কাঁদিব না, তুমি চুপ্ কর।" শৈলবালা শান্ত হইলে তাঁহারা দুজনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতেন, তাহাকে কত মন্দির দেখাইতেন; সে অধিক চলিতে পারিত না, শ্রান্ত হইলে তাহাকে কোলে করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন একটা হরিণ তাড়া করায় শৈলবালা কেমন ভীত হইয়াছিল, কিরণ তাহা দেখিয়া শৈলবালাকে একাকী ফেলিয়া সেই হরিণটীকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। শাস্তি দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সেখানে শৈলবালা নাই। শৈলবালা ক্রীড়াচ্ছলে কোথাও লুকাইয়া আছে, এই ভাবিয়া কিরণ তাঁহার ক্রীড়ার স্থানাদি কত অন্বেষণ করিলেন, কোথাও শৈলবালা নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বরে পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, দিলীপ শ্রান্ত হইয়া একটী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি

আশ্চর্য্য! দেখিলেন, পঞ্চমবর্ষীয়া শৈলবালা মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তিকে এক মনে ডাকিতেছে। কিরণ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "এ কি শৈলবালা! তুমি এখানে! আর আমাকে এতক্ষণ এত কষ্ট দিলে!" কিরণের স্বর শুনিয়া বালিকা চমকিয়া কাঁদিতে কাদিতে তাঁহার গলদেশ ধরিয়া কত আদর করিল। তাঁহাকে দেখিয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিল। পাছে তাঁহাকে সেই বিকটশৃঙ্গ হরিণ আঘাত করে এই ভয়ে সে ভীত হইয়াছিল। সে বলিল "আমি শুনিয়াছি মহাদেবকে বলিলে কোন বিপদ ঘটে না, তাই মহাদেবের নিকট বলিতে আসিয়াছিলাম।" আবার যখন শৈলবালা আর একটু বড় হইল, তিনি তাহাকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেন, তাহাও মনে পড়িত। বাল্যকালের প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার মনশ্চক্ষুর নিকট নৃত্য করিত। তিনি আহ্লাদে অজ্ঞান হইতেন। সেই সকল কথা মনে করিতে করিতে তাঁহার মনে হইত, তিনি যেন সেই তখনকার দিলীপ হইয়া শৈলবালার সহিত খেলা করিতেছেন, তিনি যেন তখনি তাহাকে ফুল দিয়া সাজাইতেছেন, আহা, কেমন মনোহর দেখিতে হইয়াছে, তিনি মনে মনে সেই বনদেবীর রূপে মোহিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—হঠাৎ মোহ ভাঙ্গিয়া যাইত,—শৈলবালা কোথায়! তিনি একেলা বসিয়া আছেন। শৈলবালা এখানে নাই, আজমীরে আছে, কিম্বা যদি অবিবাহিতাই থাকে, তাঁহাকে

কি মনে আছে? রাজবংশীয়া শৈলবালার কি অজ্ঞাত কুলশীল দিলীপকে এখন মনে থাকিবে? অট্টালিকাবাসিনী শৈলবালা এখন কি সেই কুটীরবাসী দিলীপকে বিবাহ করিতে চাহিবে? তবে তাঁহার এ দুরাশা কেন? তিনি আজমীর হইতে মন ফিরাইতে পারেন না কেন? বাল্যকালের কথা স্মরণ করিতে যেমন আহ্লাদ হইত, এই সকল কথা মনে করিয়া তেমনি বিমর্ষ হইতেন। আজ আপনার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া সে চিন্তা কতকটা যেন শমিত হইল। মনে যেন একটু আশা হইল। মনে করিলেন "যদি শৈলবালার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে আমার পরিচয় জানিলে তাহার আর অমতের কোন কারণ নাই। আর যদি বিবাহ হইয়া থাকে, তবে, আশা! তুমি আর আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে না। এই শেষ সাক্ষাৎ। সুখ! তুমি কখনও তোমার অমৃত ক্রোড়ে আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না, এই শেষ বিদায়।" শৈলবালা বিবাহিত কি অবিবাহিত জানিতে কিরণের মন অস্থির হইতে লাগিল, তাহার বিবাহের উপরই তাঁহার সকল সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সুখের জন্য তিনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রে সেখানে যাওয়া উচিত বোধ করিলেন না। অগ্রে চন্দ্রপতির উদ্ধার জন্য যাওয়া তাঁহার উচিত বোধ হইল। চন্দ্রপতিকে উদ্ধার করিয়া চিতোর গমনের পূর্ব্বে তিনি আজমীর যাইবেন এই স্থির করিলেন।

পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি সকলে সেই দিনই কিরণসিংহকে পুনঃ-

প্রাপ্ত হওয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। ক্রমে তাহা সহরময় প্রচারিত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরাজ রাজবাটীর একটী প্রকোষ্ঠের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন, মুখকান্তি অতি মলিন, নানা দুর্ভাবনায় হৃদয় পরিপূর্ণ, তিনি চিন্তাকে মন হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না বলিয়া বিরক্ত হইয়া বাতায়ন হইতে সরিয়া গেলেন। কিছু পরে মন্ত্রীকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রী আসিলে রাজা বলিলেন "যুদ্ধের কিছু পূর্ব্ব হইতে স্থানেশ্বরে আমাদের গমন করা উচিত, আর এক সপ্তাহ মধ্যে আমি সসৈন্যে সেইখানে যাইতে ইচ্ছা করি। শিবির সংস্থাপন করিতে সেখানে তুমি লোক প্রেরণ কর। সেখানে গিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত আমরা প্রস্তুত হইয়া থাকিব। পীড়িতা কন্যাকে লইয়া মহিষীও আমার সহিত গমন করিবেন।" ঊষাবতী পীড়িত বলিয়া পৃথ্বীরাজ এই যুদ্ধের সময়ে তাঁহাদিগকে স্থানেশ্বরে লইয়া যাইতে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে মহিষীর কাতরোক্তিতে তাঁহাদে

অগত্যা সম্মত হইতে হইয়াছিল। মহিষী বলিলেন কন্যার নিমিত্ত একে তিনি এখন অত্যন্ত অসুখী আছেন, এই সময়ে মহারাজ তাঁহাদিগকে এইখানে রাখিয়া গেলে, মহারাজের অমঙ্গল ভাবনায় তাঁহার হৃদয় আরো ব্যথিত হইবে, মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিলে তবু একটুকু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। শিবিকা ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া গেলে উষাবতীরও বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং স্থান-পরিবর্ত্তনে তাঁহার উপকারও হইতে পারে। মহিষী এইরূপ বলাতেই পৃথ্বীরাজ অবশেষে সম্মত হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ আবার বলিলেন "চন্দ্রপতির উদ্ধার জন্য কি উপায় করিলে? তোমরা তাঁহার জন্য আমাকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছিলে, এতদিন সেই জন্য দেখিলাম; কিন্তু এখনও যখন তাঁহার কোন সংবাদ নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি বন্দী হইয়াছেন। শীঘ্র তাঁহার উদ্ধার জন্য এখন একটা উপায় স্থির কর। এবার চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের লক্ষণ, উষাবতী পীড়িত, তাহার বাঁচিবার আশা নাই, সেনাপতি অখিলসিংহ শয্যাশায়ী, চন্দ্রপতির দেখা নাই, তিনি বাঁচিলেন কি মরিলেন, তাহারই বা নিশ্চয় কি? এবার যুদ্ধে সকলেই নিরুৎসাহী। উষাবতী পীড়িত হওয়াতে কাহারও মনে সুখ নাই। আমি যদি এমন সময় কিছু ভগ্নোৎসাহ হই, তবে কি হইবে? মনে অসুখ থাকিলেও প্রকাশ করা উচিত নহে। আমরা ক্ষত্রিয়, নিস্তেজতা আমাদের পাপ, শোকতাপে ব্যাকুল

হওয়া আমাদের অকর্ত্তব্য। তুমি সৈন্যগণকে একত্রে সমাবেশ করাও, আমি এখনি সৈন্যসজ্জা দেখিতে যাইব।” পৃথ্বীরাজের আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে মন্ত্রী চলিয়া গেলেন।

এ দিকে কিরণসিংহ চন্দ্রপতির উদ্ধারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ সেই দিনই দিল্লী ত্যাগ করিলেন। কল্যাণ ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মৃত্যুর পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না ভাবিতে লাগিলেন। পিতার জন্য এবং চিতোরের জন্য যে গুরুতর ভাবনা ছিল কিরণকে চিতোরে প্রেরণ করিয়া সে চিন্তা হইতে তিনি এখন নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু আর একটি চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি গোলাপকে বলিয়াছিলেন “রাজকন্যা বিজয়ের অনুরাগী, এইরূপ প্রমাণ দিতে পারিলে তিনি গোলাপের উপকার করিবেন। সে তো তাহা প্রমাণ করিয়াছে, এখন তিনি কি প্রকারে তাহার উপকার করিবেন? একবার বাক্যদান করিয়াছেন, তাহা পালন না করিলে ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য কার্য্য করা হইবে। ক্ষত্রিয়-মুখনির্গত বাক্য মিথ্যা হইবে, ইহা তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন? কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহার উপকার করিবেন? বিজয়ের সহিত গোলাপের যদি বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার যথার্থ উপকার করা হয়। কিন্তু বিজয় তাহার প্রতি অনুরাগী নহে, তাহাকে বিবাহ করিবে কেন? আর যদিই বা করিতে চায়, তিনি

তাহা কি প্রকারে দিবেন। বিজয়কে মন্দ লোক মনে করিয়া কল্যাণ তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন, বিজয়ই চাতুরী পূর্ব্বক রাজকন্যাকে দুশ্চরিত্রা করিয়াছে এই মনে করিয়া তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহাকে মন্দ লোক বলিয়া জানেন, যাহাকে শত্রুজ্ঞান করেন, যাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাকে তিনি গোলাপের সহিত কি প্রকারে বিবাহ দিবেন? বিজয়ের সহিত কোন কারণে একদিনের জন্যও মিত্রভাবে একত্র হওয়া তাঁহার পক্ষে অপ-মান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গোলাপের উপকার করি-বার কোন উপায় না পাইয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। এই সময় গোলাপ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাজকন্যার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া, আপনাকে তাহার কারণ ভাবিয়া গোলাপ মনে মনে অতিশয় যাতনা পাইতে-ছিল। সে নিজে তাহার হত্যাকারী এই কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। রাজকন্যাকে সকল খুলিয়া বলিলে কিছু যাতনার লাঘব হয়, কিন্তু তিনি ত অজ্ঞান, তাহা কি প্রকারে হইবে? অগত্যা কল্যাণের নিকট দোষ স্বীকার করিবে স্থির করিয়া গোলাপ অদ্য এইখানে আগমন করিল। এখানে আসিয়া, কল্যাণের পদগ্রহণ করিয়া বলিল "আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" রাজপুত্র হঠাৎ গোলাপের মুখে এইকথা শুনিয়া বিস্ময়ে বলি-লেন "তুমি আমার কি করিয়াছ?

গোলাপ। "আমি কি করিয়াছি? আমি মিথ্যা বলিয়া চির কালের জন্য আপনাদিগের সুখ হরণ করিয়াছি। রাজপুত্র বলিলেন 'তুমি আমার সুখ হরণ করিলে বলিয়া আজ ক্ষমা চাহিতেছ, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহি। আমি অমৃতভ্রমে বিষ খাইতে যাইতেছিলাম, তুমি তাহা দেখাইয়া দিলে। যদিও তাহা অমৃত হইল না বলিয়া আমি নিরাশ-সাগরে ভাসিলাম, তথাপি বিষপান হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম বলিয়া আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তোমাকে আর ক্ষমা করিব কি, বরং তোমার কথায় প্রথমে বিশ্বাস করি নাই বলিয়া আমিই ক্ষমার প্রার্থী।"

গোলাপ। "আপনি এখন আর আমার কথায় অবিশ্বাস করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয়ে যাতনা দিবেন না। যথার্থই আমি দোষী, আমি আত্মসুখের জন্যই এ প্রকার জঘন্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে সুখের জন্য এই কার্য্য করিলাম, সে সুখ এখন কোথায়? যাতনায় হৃদয় পুড়িয়া উঠিতেছে। আমি যেমন আপনাকে চিরকালের জন্য অসুখী করিলাম, আমিও সেই সঙ্গে আর কখনও সুখী হইতে পারিব না।" এই বলিয়া কি জন্য যে সে ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সকলি বলিল। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কল্যাণ বিচলিত হইলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহার পূর্ব্বে যে বিশ্বাস হৃদয়ে এত দূর দৃঢ়মূল হইয়াছে, যে বিশ্বাস এত দূর কষ্টের কারণ হইয়াছে

যে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে জীবন অসহ্য করিয়া তুলিতেছে, সেই বিশ্বাস গোলাপের এখনকার কথায় সহসা কি প্রকারে দূরী-ভূত হইবে? তিনি বলিলেন "গোলাপ! আমি বালক নহি। তুমি যাহার দ্বারা শিক্ষিত হইয়া আজ এই রূপ বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি—বৃথা—কেন—আর—" গোলাপ কাতর চিত্তে বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! ক্ষমা করুন, ও বিশ্বাস মন হইতে দূর করুন। রাজকন্যা ইহার কিছুই জানেন না, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যদি আমার কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন, আর তা কেনই বা করিবেন—কি করিয়াই বা আবার এই পাপীয়সীর মুখ-নির্গত বাক্যে বিশ্বাস করিতে বলিব,—না—যুবরাজ! আমার কথায় আর বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না,—এই পত্র গুলিন দেখুন, ইহা হইতে সকল বুঝিতে পারিবেন।" এই বলিয়া যুবরাজের হস্তে গোলাপ কতক-গুলি পত্র প্রদান করিল, সে গুলি বিজয়ের; বিজয় তাহা গোলাপকে লিখিয়াছিলেন। কল্যাণ একখানা পড়িলেন।—

"প্রাণাধিকা গোলাপ!

শুনিতেছি আজ যুবরাজ কল্যাণ রাজকন্যার নিকট যাইবেন। যদি সত্যই গমন করেন, তুমি আমাকে বলিয়া পাঠাইও, ও গুপ্তদ্বার খুলিয়া রাখিও, আমিও সেখানে এক বার যাইব। আমাকে রাজকন্যার গৃহে না দেখিলে যুব-রাজের মনে অন্য কোন প্রকারে সন্দেহ জন্মিবে না।

গোলাপ! আমি আশাপূর্ণার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,

তুমিও প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের এই মনোরথ পূর্ণ করেন। এইবার যেন রাজপুত্রের হৃদয়ে অনল জ্বলিয়া উঠে; আজ হইতে যেন তাঁহাদের চির বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়. রাজকন্যা যেমন আমাকে প্রণয়ে নিরাশ করিয়াছেন, আজ হইতে তিনিও যেন তাঁহার প্রণয়ে নিরাশ হন। যাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, সে যেন জন্মে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে না চায়। তাহা হইলেই, গোলাপ, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, আর তোমাকে লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিব।

তোমারি চরণাশ্রিত বিজয়সিংহ।"

কল্যাণ যতগুলি পত্র পড়িলেন, সকলি এই মর্ম্মের। পড়িতে পড়িতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বিজয়ের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তথাপি এত যাতনার পর এই সুখজনক কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। সকলি তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দেহে শোণিত যেন স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি জীবন্ত কি মৃত আপনিই বুঝিতে অক্ষম হইলেন।

গোলাপ বলিল—"যুবরাজ!" কল্যাণ [illegible] চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার ভাবনা ভঙ্গ হইল, তিনি ভাবিতেছিলেন— "তাহা কি হইবে? সত্যই কি উষাবতী নির্দ্দোষ? তবে কি আমিই রাজবালার নিকট অপরাধী? আমার উষাকে তবে কি আবার আমার বলিতে পারিব?" তিনি হর্ষ-কম্পিতস্বরে বলিলেন "গোলাপ! সত্যই কি দেবতারা

আমার প্রতি প্রসন্ন? সত্যই কি আমার উষা নির্দোষ? কিম্বা এ স্বপ্ন দেখিতেছি?"

গোলাপ। "যুবরাজ! সন্দেহ দূর করুন, আর আমি আপনার যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে পারি না।"

যুবরাজ এবার সহর্ষে বলিলেন "তবে বিনা দোষে অবিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া আমিই উষার নিকট দোষী। আমি এখনি গিয়া তাঁহার পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি যেরূপ কোমল-প্রকৃতি অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। তুমি অপরাধ করিয়াছ বটে, কিন্তু আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ইতি পূর্ব্বে একবার তোমার কথায় যেমন কষ্ট পাইয়াছিলাম আজ তেমনি সুখী হইলাম।"

গোলাপ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে রাজকন্যা যে পীড়িত তাহা আপনি জানেন না, কাল আপনি তাঁহার নিকট হইতে আসা অবধি তিনি অচৈতন্যাবস্থায় আছেন। আপনি তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবেন না। ভগ্নহৃদয়েই হয় তো তিনি স্বর্গারোহণ করিবেন। হায়! আপনারা যদি পুনরায় সুখী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে এখনো আমার সুখের আশা থাকিত।" গত কল্য কল্যাণ আসিবার পরে যাহা যাহা হইয়াছিল, গোলাপ তখন সকল বলিল। রাজকন্যার সাংঘাতিক পীড়ার বার্ত্তা বলিলে কল্যাণ

অতিশয় কষ্ট পাইবেন, এই ভয়ে পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, কিরণ, সকলেই কল্যাণের নিকট তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। গোলাপ বলিবার অগ্রে সেই জন্য কল্যাণ তাহা শুনিতে পান নাই। বলিতে বলিতে কষ্টে গোলাপের মুখভঙ্গি বিকৃত হইল, চক্ষু বিস্ফারিত ও ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। আনুপূর্ব্বিক শেষ হইলে বলিল "রাজকুমারী হয় তো আর বাঁচিবেন না—হায়, হায়! আর তাঁহার হন্তারক কে?" বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল "এই পাপীয়সী।" এই বলিয়াই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাজপুত্র বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে দুর্গ, ওদিকে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ, সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তসীমায় অভ্রভেদী আয়স স্তম্ভ জগন্নাথ একত্রিত অসংখ্য সৈন্যদের আজ ভরসা প্রদান করিতেছে। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়সৈন্য স্তব্ধ, গম্ভীর এবং উৎসুকভাবে সেই বিশাল প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজপুত রীতি অনুসারে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে দেবী আশা-পূর্ণার পূজা সমাপন করিয়া আসিয়া তাহারা স্থানেশ্বরে যাত্রা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূজার চিহ্নস্বরূপ সকলের কণ্ঠে

জবাফুলের দীর্ঘ মালা লম্বিত এবং কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র শোভা পাইতেছে। আজ সহস্র সহস্র তরবারি উন্মুক্ত, এবং সহস্র সহস্র শাণিত তীর রক্তপান করিবার জন্য লালায়িত। যোদ্ধাদিগের শিরস্ত্রাণে, লৌহবর্ম্মে, বর্ষার অগ্রভাগে, ও কোষোন্মুক্ত কৃপাণে, তরুণ সূর্য্যের প্রশান্ত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া বিভাসিত হইতেছে। অসীম প্রান্তর, ভয়ানক স্থির, ভয়ানক গম্ভীর, দেখিলেই রক্ত-রাশি যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মাঝে মাঝে অশ্বগণ মাত্র স্থির থাকিতে না পারিয়া অস্থিরভাবে খুর দ্বারা পৃথিবী খনন করিতেছে, ও হ্রেষাধ্বনিতে নিস্তব্ধতার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। প্রান্তরের সেই গম্ভীর ভাব দেখিলে প্রচণ্ড ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া মনে হয়, যেন মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে রসাতলে দিবে, প্রচণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, এখনি প্রচ্যুত হইয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইবে।

চারি শ্রেণীতে সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮০০০ করিয়া সৈন্য, এই দুই দল পৃথ্বীরাজের ও সমরসিংহের অধীনে, তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০০০, তাহা কল্যাণের অধীনে, চতুর্থ শ্রেণীতে ১০০০০, ইহার সেনানায়ক বিজয়সিংহ। প্রত্যেক শ্রেণী আবার দুই দলে বিভক্ত, অশ্বারোহী ও পদাতিক। অশ্বারোহী সৈন্যের পৃষ্ঠে ঢাল, হস্তে বর্ষা ও কটিবন্ধে কৃপাণ লম্বিত রহিয়াছে। পদাতিক সৈন্য আবার

দুই প্রকারের; দুই দলেরই কটিতে কৃপাণ কিন্তু এক দলের হস্তে বর্ষা, অপর দলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ। এই রূপে সৈন্যগণ সজ্জিত ও বিভক্ত হইয়া প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আছে, মাঠের অপর প্রান্তে অসংখ্য হস্তী, উষ্ট্র, বলদ, শিবিকা, শকট, খাদ্য-দ্রব্য ও অস্ত্রপূর্ণ শকটশ্রেণী, ও তাহার আনুসঙ্গিক রক্ষক দল, কামান ও কামানের গোলার শকট, সজ্জিত রহিয়াছে। রাজধানীতে অল্পই লোক আছে, প্রায় সমস্ত নগরবাসী প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্বে জনতা করিয়া রহিয়াছে, অবশিষ্ট লোকেরা কেহ অট্টালিকার উপরে, কেহ যমুনাস্তম্ভে, কেহ রাজপ্রাসাদ-শিরে, একত্রিত হইয়া সৈন্যসমাগম দেখিতেছে। সহসা ঘোটকের দ্রুতপদ-নিক্ষেপ শ্রুত হইল, সহসা জনতা ভিন্ন হইয়া গেল, সহসা "জয় পৃথ্বীরাজের জয়", "জয় সমরসিংহের জয়" ধ্বনি চতুষ্পার্শ্বের লোকদিগের মধ্যে সমুত্থিত হইল, সেখান হইতে রাজপ্রাসাদ শিখরে, এবং রাজপ্রাসাদ শিখর হইতে যমুনা-স্তম্ভে, যমুনা-স্তম্ভ হইতে নভোমণ্ডল, নভোমণ্ডল হইতে দিগন্ত আলোড়িত করিয়া তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই জয়ধ্বনির মধ্য হইতে চারি জন বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সেনাপতি পূর্ণবেগে আসিয়া সহসা চারি শ্রেণীর সম্মুখে চারি জন দাঁড়াইলেন, রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সৈন্যদের অশ্বদের নগর-বাসীদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, উৎসাহতরঙ্গে যেন সমস্ত প্রান্তর উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

মধ্যশ্রেণীর সম্মুখে যে ঐ অশ্বারোহী সেনাপতি দাঁড়া-

ইয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে হীরকমণ্ডিত উষ্ণীষ, কর্ণে মুক্তাময় স্বর্ণ কুণ্ডল, ভুজদ্বয়ে বীর বলয়, এবং সমস্ত শরীর লৌহ বর্ম্মে আবৃত রহিয়াছে। তাঁহার পৃষ্ঠে ঢাল ও শরপূর্ণ তূণ, কটিতে শাণিত কৃপাণ, এক হস্তে বর্শা অপর হস্তে অশ্ব-রজ্জু, দেখিলেই মনে হয় যেন কুমার কার্ত্তিকেয় আজ অসুর-সমরে বীরবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলের নিম্নস্থিত নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফুরিত হইতেছে, তাঁহার জ্বলন্ত মুখশ্রীতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় বীরদর্প প্রদীপ্ত হইতেছে, তিনি এক একবার এক এক সৈন্যশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং এক এক কটাক্ষে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার অশ্ব পর্য্যন্তও আরোহীর আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করিয়া অস্থির ভাবে বল্‌গার অধীনতা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছে,—এই যোদ্ধৃ পুরুষই পৃথ্বীরাজ। তাঁহার পীড়িতা কন্যার জন্য এখন তাঁহার আর সে শোক ভাব নাই, এখন যবনবিজয়ের জন্য একমাত্র শৌর্য্য ভাবই তাঁহাতে দৃষ্ট হইতেছে। পৃথ্বীরাজের দক্ষিণ দিকে ঐ সমরসিংহ, তাঁহার উন্নত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত, তাঁহার দৃষ্টি স্থির অথচ হৃদয়ভেদী, এ দৃষ্টি প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর-তম দেশ পর্য্যন্তও যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলে, হৃদয় অভি-ভূত করিয়া দেয়, তাঁহার প্রত্যেক কটাক্ষে যেন এক একটী অব্যক্ত আদেশ প্রচার হইতেছে এবং সে কটাক্ষের এমনি

মোহিনী শক্তি যে সকলকেই তাহার আদেশের অধীন করিয়া ফেলে। তাঁহার রণবেশ অতি সামান্য, শিরে শিরস্ত্রাণ, দেহ বর্ম্মাবৃত, কিন্তু কর্ণে কুণ্ডল নাই, ভুজদ্বয়ে বীরবলয়ও নাই, কেবল এক হস্তে একখানি শাণিত কৃপাণ বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিত হইতেছে এবং অপর হস্তে তিনি ঢাল ও অশ্ব-রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার ঈষৎপক্ক বিশাল শ্মশ্রু বায়ুতে হিল্লোলিত হইতেছে, এবং সুদীর্ঘ জটাজাল শিরস্ত্রাণ ছাড়াইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়াছে। যোগীভাব এবং বীরভাব মিশ্রিত হওয়াতে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে একটী প্রশান্ত প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, যেন ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ একত্র মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মহান ও গম্ভীর, দৃঢ় ও অটল ভাব দেখিলে তাঁহাকে দেব হিমালয় বলিয়া মনে হয়। পৃথ্বীরাজের বামপার্শ্বে যুবরাজ কল্যাণ পৃথ্বীরাজের ন্যায় রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে আপন অধীনস্থ সৈন্য শ্রেণীর উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখের ভাব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রদীপ্ত অনলে আহুতি প্রদান করিলে যেমন তাহা ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আবার দ্বিগুণতর প্রভাবে জ্বলিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ কখন বিষাদে মলিন, আবার পরক্ষণেই বীররসের জাজ্বল্য প্রতিমারূপে প্রদীপ্ত হইতেছেন। তাঁহার নিবিড় অন্ধকারময় কেশজাল স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার মুখের উভয় ভাবেরই গরিমা বৰ্দ্ধিত

হইতেছে। চতুর্থ শ্রেণীর সৈন্যাধ্যক্ষ বিজয়সিংহ। এমন
কেহ সূক্ষ্মদর্শী আছে যে সে এখন তাঁহার হৃদয়দ্বার উদ্ঘা-
টিত করিয়া তাঁহার অন্তরের লুক্কায়িত ভাব বুঝিতে সমর্থ
হয়? তাঁহার ঐ যে অন্ধকারময় ভ্রূকুটী, ঐ যে বিষম
ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎহাস্যকুঞ্চিত ওষ্ঠাধর, ঐ যে কাঠিন্য-ভাব-
পূর্ণ মুখমণ্ডল, দেখিলেই কি মনে হয় না তিনি কোন
ভয়ানক কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু সে ভয়ানক কার্য্য
কি? কাহারো সাধ্য নাই যে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়;
সকলেই মনে করিতেছে যবননিধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে
আজ তাঁহার মূর্ত্তি ঐ রূপ ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

এই চারি জন সেনাপতি চারি শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়া-
ইলেন। পৃথ্বীরাজ কি সঙ্কেত করিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক
নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কোলাহল স্তব্ধ, জয়ধ্বনি স্তব্ধ, রণবাদ্য
স্তব্ধ, সকলি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পৃথ্বীরাজ সেই নিস্তব্ধতাকে
কাঁপাইয়া, সৈনিকগণের হৃদয় কাঁপাইয়া, শ্রোতাদিগের হৃদয়
কাঁপাইয়া, বলিতে লাগিলেন—"সৈন্যগণ! ক্ষত্রিয়বীরগণ!
যে দুরন্ত যবনেরা দৃশদ্বতীকূলে গতবৎসর আমাদের ক্ষত্রিয়-
বীর্য্যের তেজস্বিতা—আমাদের ক্ষত্রিয়-খড়্গের তীক্ষ্ণতা অনু-
ভব করিয়া গিয়াছে, যাহারা সেই দারুণ পরাজয়ের কলঙ্কে
আজিও কলঙ্কিত, যাহাদের সেনাপতি এই মহম্মদঘোরিকে
আমরা দুই দুইবার বন্দী করিয়া আনিয়াছিলাম, এবং কেবল
ক্ষত্রিয় ক্ষমাগুণেই যাহাকে অক্ষত ভাবে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে দিয়াছিলাম, সেই দুরাত্মা যবনগণ আবার ম্লেচ্ছপদ-স্পর্শে আমাদের আর্য্যস্থল কলঙ্কিত করিতে আসিয়াছে! সৈন্যগণ! যদি তোমরা আর্য্যনামের গৌরব রাখিতে চাও, যদি ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত হইতে চাও, যদি যবন-পদ-দলিত হইতে বাসনা না থাকে, যদি তোমাদের প্রাণসম স্ত্রীপুত্র কন্যাদিগকে নিষ্ঠুর যবনপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি, হিন্দুমঠমন্দিরের প্রতি তোমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, যদি দেবী আশাপূর্ণার আশা পূর্ণ করা তোমাদের গৌরব মনে হয়—তবে আর বিলম্ব করিও না, পাষণ্ডদিগকে এমন শাস্তি দাও যেন তাহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে কখন আর সাহসী না হয়। তোমাদের মধ্যে কি কেহ——" পৃথ্বীরাজের কথা আর শুনা গেল না—সহসা চতুর্দ্দিক যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল, সৈন্যগণের উৎসাহধ্বনিতে, অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দে, অশ্বের হ্রেষারবে, জনতার 'জয় জয়' নিনাদে পৃথ্বীরাজের স্বর ডুবিয়া গেল। কোলাহলের কিছু উপশম হইলে পৃথ্বীরাজ আবার বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কি কেহ এমন ভীরু আছে, কেহ এমন অক্ষত্রিয় অনার্য্য আছে, যে তাহাকে আজ উত্তেজনা বাক্যে উত্তেজিত করিতে হইবে? যবন পরাজয়ই যখন তোমাদের উদ্দেশ্য, দেশরক্ষাই যখন তোমাদের ব্রত, বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহ যখন তোমাদের সহায়, তখন তোমাদের শরীরে যে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার এক এক বিন্দু রক্তই সেই

উত্তেজনার ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যে ঈষৎ উন্মীলিত হইতেছে, শৈল-প্রভা কোন সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। প্রভাবতী ধীরে ধীরে সেই দল-বিকসিত ওষ্ঠাধর চুম্বন করিলেন, অমনি প্রভাবতীর পদ্ম-নেত্র হইতে দুই এক বিন্দু শিশিরাশ্রু শৈলবালার প্রফুল্ল কপোলে পতিত হইল। ধীরে ধীরে তাহা মুছাইয়া প্রভাবতী আবার শয়ন করিলেন। মনে মনে বলিলেন "বালিকা, তুমিই সুখী!"

সে ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রে প্রভাবতীর একটু তন্দ্রা ও পড়িল। কিছু পরে ভয়ানক কুস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠি-লেন। তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শৈলবালাকেও নিকটে দেখিতে পাইলেন না। একাকী শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ শমিত হইলে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, শৈলবালা নদীতীরে বসিয়া প্রভাত-পবন-হিল্লো-লিত মানসনদীর তরঙ্গ-লীলা দেখিতেছে। তিনিও বাটী ত্যাগ করিয়া উদ্যানাভিমুখে গমন করিলেন। নদীর নিকট আসিলে সহসা সুমধুর বীণা-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে বাজিয়া উঠিল। তিনি থমকিয়া সেই খানে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, শৈলবালার কণ্ঠধ্বনি তাঁহার বীণার ঝঙ্কার বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তিনি আর অধিক দূর না গিয়া নিবিষ্টচিত্তে শৈলবালার বালিকাকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গীত শুনিতে লাগি-লেন। শুনিলেন—

সজনি লো!——

যমুনা পুলিনে, নিশি পোহাইনু,না এল না এল,না এল কালা,
কবরী-কুসুম শুকাইল,হায়! শুকালো লো তোর সাধের মালা।
ক্ষণেক চমকি উঠি নেহারিনু, ক্ষণেক থমকি বসিয়া কাঁদি,
কাটানু রাতিটা ঢেউ গুণে গুণে,পাষাণে হতাশ-হিয়ারে বাঁধি।
ওই যে ওই যে, এল বুঝি শ্যাম, মধুর বাঁশরী বাজিল ওই,
চমকি উঠিয়ে আবার ধাইনু, হরষে পরাণ নাচিল সই।
হরষে উথলি যমুনা বহিল, কাঁপিল কদম ফুলের ভরে,
যাইতে হরষে পড়িনু উঠিনু, লাজেতে চরণ নাহিক সরে।
আসুক না আগে তবে দেখা যাবে,কতছল জানে ব্যথিতে বালা,
কাঁদিব কাঁদাব, চরণে ধরাব, তবে তো ঘুচিবে মরমজ্বালা।
কই কুই হায় শ্যাম তো এল না, নাহি শুনি আর বাঁশরী রব,
আশার খেয়ালে বুঝি মনে মনে, সই লো স্বপন দেখিনু সব।
হতাশে আবার যমুনারি তীরে, অলসে আইনু ফিরিয়া ধীরি,
একাকী বসিয়ে কত যে কাঁদিনু, বারিতে মিশাল নয়ন-বারি।
খেদেতে যমুনা উজান বহিল. কদম কেশর পড়িল খসি,
নয়নের জল থামিল না,হায়! আকাশে মিশাল তারকা রাশি।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে পোহাইল নিশি,তবু তো না এল নিঠুরকালা,
হৃদয়ের সাধ হৃদয়ে রহিল, মরমে রহিল মরম-জ্বালা।”

প্রভাবতীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, গানটী তাঁহার হৃদয়ের সহিত মিলিল। গান শেষ হইলে তিনি মৃদুপদনিক্ষেপে শৈলবালার নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শৈলবালা

বলিলেন "এই যে! মুখ ভারভার দেখ্‌ছি কেন? রাতদিন কি মুখ ভার ক'রে থাকবে?"

প্রভাবতী বলিলেন "আজ ভোরের বেলা আমি ভয়ানক কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, মন যে কি ব্যাকুল হইয়াছে কি বলিব। আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই।" শৈলবালা বলিলেন "তুমি রাত্রি দিন যে ভাব, রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?"

প্রভা। "তুমি তবে এখনো যথার্থ ভালবাসার আস্বাদন জান না। যখন জানবে, তখন অমন করে বলতে পারবে না। যবনশিবিরে গেছেন, সেই অবধি কোন সম্বাদ নাই, তাঁহার কারারুদ্ধ হইবার আশ্চর্য্য কি? আমার বোধ হয়, তাহাই ঘটেছে, তাহা না হইলে এত দিন এক খানাও পত্র লিখিতেন। আর তিনি কিছু দিল্লীও যান নাই, সেখানে গেলেও সম্বাদ পাইতাম। গোলাপ লিখেছে তিনি দিল্লীতে যান নাই। দিল্লী যান নাই, আমাকেও পত্র লেখেন নাই, ইহাতে কি আমার ভাবনা হইবার কোন কারণ নাই?"

শৈল। "আহা, কেঁদে কেঁদে তোমার চক্ষু দুটি ফুলে গিয়াছে। তুমি হাস' আর কাঁদ, সকল সময়েই তোমাকে ভাল দেখায়। তুমি এখন কাঁদছ, এতেও তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে, যেন পদ্মফুলে শিশির পড়েছে।—

প্রভার আমার বদনখানি ভাসছে নয়ন জলে।
মরি! মুকুতা জড়িত যেন কনক-কমলে॥

কবিচন্দ্রের অদৃষ্টে নাই, তাই এমন শোভা দেখতে পেলেন না।”

প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “তোমার আর ছড়া কাটতে হবে না। দুঃখের সময়ও বুঝি ঠাট্টা কর্ত্তে হয়?”

শৈল। “রাগ বুঝি? তবে চল, আমরা কোমর বেঁধে যবন শিবির হ’তে তোমার প্রাণনাথকে উদ্ধার ক’রে আনি।”

প্রভা। “তুমি ঠাট্টা ক’রে বলছ, আমার কিন্তু সত্যই ঐ ইচ্ছা হচ্চে।”

শৈল। “ঠাট্টা নয়, আমিও সত্য বলছি।”

প্রভা। “তুমি আর আমাকে জালিও না। একে আমি আপন কষ্টে মচ্চি, কোথায় তুমি সান্ত্বনা করবে, তা না করে অধিক কষ্ট দিচ্চ।”

শৈলবালা প্রভাবতীকে ভাল বাসিতেন। চন্দ্রপতির সংবাদ না পাইয়া আপনি ভাবিত হইয়াছেন দেখাইলে পাছে প্রভাবতী অধিক কষ্ট পান, সেই জন্য তাহা দেখাইতেন না; কিন্তু আজ তাঁহার দুঃখের সময় হাসিয়া তাঁহাকে অধিক কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া এবার গম্ভীরভাবে বলিলেন “আমি হাসিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া কিছু মনে ক’রো না। আমি সত্যসত্যই এখান হইতে যাইতে বলিতেছি, তামাসা নহে, কিন্তু তুমি যদি আমার পরামর্শ শুন, তবে যবনশিবির না গিয়া অগ্রে দিল্লী চল।”

প্রভা। "সেখানে তো তিনি নাই, সেখানে গিয়া কি করিব ?"

শৈল। "তিনি যদি সত্যই বন্দী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখানে না যাইলে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিব না ?"

প্রভা। "দিল্লী গিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে উদ্ধার করিবে ? আমি তাহা তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

শৈল। "এখন যবনশিবির হইতে উদ্ধার করা আমাদের অসাধ্য, কেন না, তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, আমরা তাহা কিছুই জানি না। সেখানে যাইলে আমরাও ধৃত হইব। তাহা অপেক্ষা দিল্লী গিয়া, মহারাজের নিকট হইতে কতকগুলিন নিপুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখি, যে দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সে দিন যবনশিবিরে অল্প সেনা থাকিবে, সেই দিন আমরা কোন কৌশলে তাঁহাকে উদ্ধার করিব।"

প্রভাবতী শৈলবালার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন একটীমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহারা আজমীর ত্যাগ করিলেন। অনাথ নামে তাঁহাদের সেই পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য রুগ্নাবস্থায় থাকাতে তাহাকে এবার সঙ্গে লইতে পারিলেন না। এখন সম্মুখে যুদ্ধ উপস্থিত, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছে, এখন স্ত্রীবেশে গমন করিলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পুরুষবেশ ধারণ করিলেন।

মোহন আঙ্গিয়া কাঁচলি ও স্থবর্ণখচিত পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কোমল অঙ্গ পুরুষপরিচ্ছদে আবৃত হইল। রঙ্গিণ ওড়না এখন মস্তকে স্থান পাইল না, লম্বিত কেশজাল উষ্ণীষে আবদ্ধ হইল। একে একে সব আভরণ মোচন করিয়া কটিবন্ধে কৃপাণ বাঁধিয়া দিলেন, তাহা অলঙ্কাররূপে শোভিত হইল। এখন আর সে শৈলবালা, সে প্রভাবতী রহিলেন না। তাঁহারা অল্পবয়স্ক বালকবেশ ধারণ করিলেন। পরস্পর দুজনে দুজনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শৈলবালা বলিলেন "তুমি ভাই সত্য সত্যই পুরুষ হয়ে গেছ, আর চিনতে পারছি না, কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে। একবার আরসী দিয়ে আপনার শ্রীমুখ খানি আপনি দেখবে চল।"

প্রভা। "তুই দেখ্‌গে। আমার এখন আর ও সকল সাধ নাই।"

শৈল। "আমি তো দেখ্‌বই, তোমাকেও দেখতে হবে।"

শৈলবালা তাহার হস্ত ধরিয়া মকুরের নিকট লইয়া আসিলেন, বলিলেন "পুরুষ সেজে আপনাকে আমার সত্যই পুরুষ মনে হচ্চে। যদি পথে কেহ অত্যাচার করতে আসে, তা হলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব।" শৈলবালা কটিস্থ কৃপাণ হস্তে লইয়া এক পদ অগ্রসর করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। মুকুরে তাহা বিম্বিত হইল। রণসাজে সজ্জিত হইয়া শৈলবালা আপনাকে আপনি

দেখিতে লাগিলেন। আপন রূপে আপনি যেন মোহিত হইলেন। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এই দেখ কেমন ক'রে পথে তোমাকে রক্ষা করব! এই অবস্থায় দিলীপ যদি আমাকে দেখেন, তা হলে কি তিনি চিনিতে পারেন?"

প্রভা। "কেন, এই বেশ দিলীপকে দেখাতে ইচ্ছা হচ্ছে না কি?" শৈলবালা আবার একটু মোহন হাসি হাসিয়া মুকুরের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।

সচরাচর যে পথ দিয়া লোকে দিল্লী গমন করে, সে পথ দিয়া না গিয়া তাঁহারা লুক্কায়িতভাবে পর্ব্বতপথ দিয়া অশ্বারোহণে দিল্লী গমন করিলেন। স্ত্রীলোকে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন শুনিয়া বোধ হয় কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না। কেন না আমরা যে কালের কথা লিখিতেছি, সে কালে স্ত্রীলোকদিগের অশ্বারোহণপ্রথা যে দূষ্য ছিল না, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। এই প্রথা যে যবন অধিকার হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহার আর বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। যে হেতু মহারাষ্ট্র প্রভৃতি যে সকল দেশ যবন কর-কবলিত হয় নাই, সেখানে স্ত্রীলোকদিগকে এখনো অশ্বারোহণ করিতে দেখা যায়।

আজমীর হইতে তাঁহারা যে দিন বহির্গত হইলেন তাহার পঞ্চম দিবসের সন্ধ্যাকালে দিল্লীর এত নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন, যে আর দুই ঘন্টাকাল ধরিয়া নামিলেই দিল্লী আসা যাইত। কিন্তু তাঁহারা তখন আর না চলিয়া

বিশ্রাম জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই পর্ব্বতে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া, ভৃত্যকে কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিতে নিম্নস্থ একটি গ্রামে প্রেরণ করিলেন। তখন সন্ধ্যার প্রথম প্রহরমাত্র। চন্দ্রদেব কিয়ৎক্ষণ হইতে কিরণ বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিতেছিলেন। তখন জ্যোৎস্নাধৌত ঝরণাবারি পর্ব্বতবক্ষ হইতে চলিতে চলিতে সবেগে নিম্নে পড়িয়া রজতকণায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই জলপ্রপাতের সুগভীর মধুর নিনাদে শ্রোতাদিগের কর্ণে অমৃত বর্ষণ হইতেছিল। শৈলবালা ও প্রভাবতী সেই সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। পর্ব্বতশোভা দেখিয়া শৈলবালার হৃদয় নব-আমোদে পূর্ণ হইল। তিনি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গীত আরম্ভ করিলেন। গাহিবার পূর্ব্বে প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন "তোমারই মনের মত একটা গান করি, যে বিষণ্ণ হয়ে আছ, একটু প্রফুল্ল করি,—

কাহে লো যমুনা নাচত খেলত আজু বিলাস-বিকম্পিত কায়,
মৃদু মৃদু পবনে, হিয়া তুয়া সঘনে, কাহে লো আনন্দ ভায়।
কাহে লো চন্দ্রমা, বরষিয়ে মধুরিমা, শোভয়ে তুয়া হৃদে আজি,
ধিক লো যমুনা, বিনে সে কানাইয়া মাতল নব সাজে সাজি
অব তো লো তুয়া কুলে মোহন কদমতলে, নাহি পেলে শ্যামমুরারী
অব তো বাঁশরীবোল, উছলি ন ভুলায়ে ব্রজপুরগোপিনী নারী।
কদম্ব কেশর কম্পয়ি থর থর, ঝর ঝর ঝরল হুতাশে,
মাধবী লতিকা হায় লুণ্ঠিত ধরণী, অব নাহি মাধুরী বিকাশে।

নিকুঞ্জে অলিকুল,রোতেরোতে গুঞ্জত কোয়েলাকুহরে বিলাপে
রমণী পরাণ মুখ, নাহিত জুড়ায়ত, জারল বিরহউত্তাপে।

তবে লো যমুনা

কাহার মুরতি. দেখিয়ে স্ফুরতি হইল তোর।
কোন সুখ আজ পাওয়লো তুই, আমোদে হৃদয় হইল ভোর
নবপ্রেমে ভুষা সুখ উপজত, নেহারি যো হিয়া দহল লাজে,
কিসিকো সোহাগে ধিক্‌লো যমুনা,সাজত আজু এমোহনসাজে

গান গাহিতে গাহিতে সহসা পশ্চিমদিক হইতে এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ক্রমে মেঘে মেঘে গগন ছাইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী অন্ধকারময় হইল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতে লাগিল, গাঢ় অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল, বাতাস বন্ধ হইয়া বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ আর অনুভূত হইল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, পৃথিবী অন্ধকার; ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ সকলি দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা দুই জনেই স্ত্রীলোক, এই অসহায় অবস্থায় ঝড়ের লক্ষণ দেখিয়া ভীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে একটু করিয়া সজোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। তাঁহারা তখন কোন আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। আর একবার বিদ্যুতালোক প্রকাশ হইলে, একটী পর্ব্বতগুহা দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শৈলবালা বলিলেন "আমাদের পুরুষবেশ ধরাই অন্যায় হইয়াছে। একটু ঝড় দেখে যখন স্ত্রীস্বভাব

প্রকাশ পাইল, সাহস পালাল, তখন আর পুরুষবেশধারণে কি ফল ?" প্রভাবতী বলিলেন "আমার এখন সাহস দেখাবার সময় না। তোর যদি ইচ্ছা হয় পুরুষত্ব দেখিয়ে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করগে।"

শৈলবালা। "তুমি যদি না কাঁদতে বস্‌তে তা হ'লে আমি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তেম কি না দেখ্‌তে পেতে।"

তাঁহারা যে গুহা মধ্যে আশ্রয় লইলেন, তাহার অপর পার্শ্বে ঐ প্রকার আর একটি গুহা। পরস্পর দুই গুহা মধ্যে অর্দ্ধমাত্র ব্যবধান। অর্দ্ধভাগ হইতে এক গুহাদিয়া অপর গুহা মধ্যস্থ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহারা সেই গুহায় আসিবার অল্পক্ষণ পরে অপর গুহায় আলোকহস্তে দুইজন মনুষ্যকে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও বোধ হয় ঝড় আরম্ভ দেখিয়া এই গুহামধ্যে আশ্রয় লইল। তাহারা গুহায় আসিলে ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তীক্ষ্ণ বিদ্যুল্লতা শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঝলসিত হইয়া দিগন্তে বিলীন হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু এক শৈলে আঘাত করিয়া আর এক শৈলে ছুটিল। প্রতিহত হইয়া আবার দ্বিগুণবেগে দ্বিগুণ-রোষে অন্য শৃঙ্গ আক্রমণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ু-তাড়িত এক শিলাখণ্ড ভীষণ শব্দে আর এক শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া, তাহার সহিত উপত্যকার নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বায়ুর হুঙ্কারে, উপর্য্যুপরি বজ্রের গর্জ্জনে, পতন-শীল প্রস্তরখণ্ড সমূহের প্রপাতধ্বনিতে, বৃক্ষের পতন-

শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রলয়ের ঝড়ে পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল, গুহা কাঁপিয়া উঠিল, প্রভাবতী কাঁপিতে লাগিলেন। কেবল বালিকা শৈল নির্ভয়ে বসিয়া রহিলেন, এবং প্রভাবতীর ভয় দেখিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। এই সময় দুইজন পুরুষকে অপর গুহায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া দস্যুবোধে প্রভাবতী আরো ভীত হইলেন। তিনি সেই ব্যবধানের অন্তরালে গুঁড়ি মারিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া শৈলবালা তাঁহার কর্ণে কর্ণে বলিল "ভয় নাই, এখানে অন্ধকার, উহারা আমাদের দেখিতে পাইবে না। তবে যদি তোমার রূপের আলোয় দেখিতে পায় তো বলিতে পারি না—

প্রভাবতী রূপবতী, রূপের আলায়।
আঁধার করিয়ে চার দিক উজলায়॥

আর ভয়ই বা কিসের, উহারাও দুজন পুরুষ, আমরাও দুজন পুরুষ, যদি এখানে আসে না হয় যুদ্ধ করা যাবে।"—

সত্যসত্যই অন্ধকারে উহাদের কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপর গুহায় আলোক থাকাতে প্রভাবতী ও শৈলবালা সেই গুহামধ্যস্থ লোকদিগকে দেখিতে পাইলেন। প্রভাবতী শৈলবালার কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দিলেন। অপর গুহার লোকেরা যদি শুনিতে পায় এই ভয়ে শৈলবালাও আর অধিক কথা কহিলেন না। কিন্তু বিলম্বে সাবধান হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছামত ফল ফলিল

না। অপর গুহামধ্যস্থ একজন লোক তাঁহার কথার অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল "পর্ব্বতে কোন লোক আসিয়াছে, আমি যেন একবার মনুষ্য-স্বর শুনিলাম। এইখানে আলো রাখিয়া তুমি বাহিরে গিয়া যদি কোন মনুষ্যকে দেখিতে পাও উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া আইস।" সঙ্গী বাহিরে আসিল। প্রভাবতী ও শৈলবালা এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এখনি এই গুহামধ্যে তাহারা তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে আসিবে, এই ভয়ে প্রভাবতী প্রতিক্ষণে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গী তাঁহাদের গুহায় প্রবেশ না করিয়া, কিছু পরে বাহির হইতে পুনরায় আপনাদিগের গুহায় প্রবেশ করিল এবং তাহার সঙ্গীকে বলিল "আমি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এত ঝড় বৃষ্টিতে এ পর্ব্বতে কে আসিবে? আপনি বায়ুর শব্দ মনুষ্য-স্বর জ্ঞান করিয়াছেন।" তাহার কথায় আর একজনের সন্দেহ দূর হইল। তখন প্রভাবতীর একটু ভরসা হইল। আসন্ন বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়া প্রভাবতী শৈলবালার অসাবধানতায় ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ক্রোধকটাক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ শৈলবালা অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইলেন না। এখন তাঁহারা নিস্তব্ধে অপর গুহামধ্যস্থ লোকদিগকে দেখিতে লাগিলেন। একজন উহাদের দিকে পশ্চাৎ আর একজন সম্মুখ করিয়া বসিয়াছিল। যে সম্মুখ

করিয়া বসিয়াছিল তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে মুসলমান বলিয়া বোধ হইল। আর যাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, কথার ভাবে তাহাকে হিন্দু বলিয়া বোধ হইল। মুসলমান হিন্দুকে বলিল "মহম্মদঘোরি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" হিন্দু বলিলেন "তাহার প্রমাণ?" যবন বলিল "এই দেখুন" বলিয়া তাহার হস্তে কি দিল। হিন্দু বলিলেন "হাঁ, তুমি তাহার লোক বটে। তাঁহাকে বলিও তিনি যাহার নিকট দিল্লীজয়ের নিমিত্ত সাহায্য পাইতে আশা করিতেছেন, সে তাহা করিতে প্রস্তুত, এবং যে কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা এই।—"

এই বলিয়া, কি কৌশলে যবনেরা যুদ্ধে জয়ী হইবে, বিজয় কি প্রকারে সাহায্য করিবেন তাহা সবিশেষ বলিয়া বলিলেন "ইহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার জয় হইবে, তার পর যুদ্ধের সময় আবার যেমন যেমন করিতে হইবে, আমি সময় ও সুবিধা বুঝিয়া সেই মত আবার বলিয়া পাঠাইব। আমি যাহা বলিলাম তাঁহাকে সবিশেষ বলিতে পারিবে?" যবন বলিল 'পারিব।"

হিন্দু। "কি বলিবে একবার বলিয়া যাও।"

বিজয় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সে তাহা অবিকল বলিয়া গেল। বিজয় বলিলেন তবে যাও, তাঁহাকে বলিও তাঁহার প্রতিজ্ঞা যেন স্মরণ থাকে।" তাহাদের কথা শেষ হইল, ঝড়ও থামিল। বিজয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রকৃতি-

দেবীও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কু-পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন। তাহারা গুহা হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যবন গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিল ঝড় থামিয়া প্রকৃতি আবার প্রশান্ত হইয়াছে, অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে পর্ব্বত-বক্ষ শোভিত হইতেছে। মন্দ মন্দ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষকায়শোভিত বারিবিন্দুকে নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছে। মুসলমান আর আলোকের আবশ্যক না দেখিয়া হস্তস্থিত আলোক নির্ব্বাণ করিয়া আবার চলিতে লাগিল। সে যাইতে যাইতে কিছু দূরে গিয়া দুইটী অশ্ব দেখিতে পাইল। শৈলবালা ও প্রভাবতী সেই অশ্বদ্বয়কে চরিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির সময় তাহারাও এক বৃহৎ শিলাতলে আশ্রয় লইয়াছিল। অশ্ব দেখিয়া যবনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে আপন মনে কত তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। ভাবিল ইহাত চড়িবার অশ্ব দেখিতেছি, লাগাম বল্গা সব দেওয়া আছে। তবে এই পর্ব্বতে অবশ্য কোন লোক আসিয়াছে। সেই হিন্দুর অনুমান মিথ্যা নহে। তাহারা ঝড় দেখিয়া পর্ব্বতের কোন গুহায় আশ্রয়

লইয়াছিল, তাই তখন আমি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। যদি তাহারা আমাদের কথা শুনিয়া থাকে তবে কি হইবে। তাহা হইলে দেখিতেছি এবারও যুদ্ধে জয়লাভ হইবে না।" সে সেই স্থান পুনর্ব্বার দেখিতে চলিল। জ্যোৎস্না-লোকে গুহার চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সেই গুহার নিকটে অন্য কোন এমন গুহা আছে কি না, যাহাতে মানুষে আশ্রয় লইতে পারে, তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে শৈলবালা ও প্রভাবতীর গুহায় প্রবেশ করিল। আলোক হইতে অন্ধকারে আসিয়া সে প্রথমে উহাদের দেখিতে পাইল না। তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সে যে কোন অসদভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে শৈলবালা তাহা বুঝিলেন। প্রভাবতীর কিছু বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। ভয়ে তাঁহার শোণিত শুষ্ক হইল, তিনি স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া রহিলেন। গুহার মধ্যে কেহ আছে কি না হস্তচালনা দ্বারা দেখিতে গিয়া মুসলমান হঠাৎ তাঁহা-দের গাত্র স্পর্শ করিল। সে দেখিল তাঁহারা উহাদের সকল কথাই শুনিয়াছেন, না বধ করিলে উপায় নাই। সহসা যে হস্ত তাঁহাদের গাত্রে ঠেকিয়াছিল তাহার সেই বাহুতে একটী তরবারির অগ্রভাগ বিদ্ধ হইল। শৈলবালা তাহার পদে আঘাত করিতে গিয়াছিলেন। তাহার পদে আঘাত করিবার শৈলবালার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, সে চলিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না,

তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিতে পারিবেন দ্বিতীয়, সে যবনশিবিরে যাইতে না পারিলে, মহম্মদ ঘোরি সেই হিন্দুর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না। তিনি ভাবিলেন তাহার পদে আঘাত করিলে সে চলিতে অক্ষম হইবে, আর তাঁহারা লোক দ্বারা তাহাকে দিল্লী লইয়া যাইবেন. এবং যাহা যাহা শুনিয়াছেন সবিশেষ পৃথ্বীরাজকে বলিবেন। তাহা হইলেই যুদ্ধ পর্য্যন্ত সে বন্দী থাকিবে ও তত দিনে সে আরোগ্য লাভও করিবে। যুদ্ধশেষে তাহাকে বন্দী রাখা কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া পৃথ্বীরাজের দয়ার উপর নির্ভর করিবে।" কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। আঘাত করিতে যাইবার সময় সেই মুসলমান হস্ত অগ্রসর করাতে ও শৈলবালার হস্ত অস্ত্রচালনায় নিপুণ না থাকায় তরবারি পদে না লাগিয়া যবনের বাহুতে বিদ্ধ হইল। অমনি যবন তাহার অপর হস্তদিয়া বজ্রমুষ্টিতে অস্ত্রসহ শৈলবালার কোমল হস্ত ধারণ করতঃ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গুহার বাহিরে লইয়া আসিল। তাঁহাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার বিপদ আশঙ্কায় ভীত হইয়া, প্রভাবতী উচ্চৈঃস্বরে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলিতে বলিতে তাঁহাদের সহিত বাহিরে আসিলেন। অদূরে "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া কে যেন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিল। তিনি দেখিলেন একজন যুবাপুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে নিষ্কোষিত অসিহস্তে দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন। এই সময় তাঁহাদের ভৃত্যও অপর দিক হইতে এই খানে আগমন করিল। ঝড় বৃষ্টিতে সে এতক্ষণ আসিতে পারে নাই। দুই জনকে দুই দিক হইতে আসিতে দেখিয়া মুসলমান একাকী তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। আর মুহূর্ত্তমাত্র থাকিলে নিস্তার নাই দেখিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যুবক কিছু দূর অনুগমন করিয়া যবনের ন্যায় পর্ব্বতপথ জ্ঞাত না থাকায় তাহাকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রভা ও শৈলবালার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে এই সময়ে এই অবস্থায় পর্ব্বত-পথে চলিতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। শৈলবালা এবার দিলীপকে চিনিতে পারিলেন। যাঁহার মূর্ত্তি অহো-রাত্র তাঁহার হৃদয়পটে জাজ্বল্য রহিয়াছে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিরেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পুরুষবেশ বশতঃ এবং শৈলবালা যৌবনাবস্থায় কুটীরবাসিনী বালিকা হইতে পরিবর্ত্তন হওয়াতে কিরণসিংহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিয়া আহ্লাদে শৈলবালার শরীর শিহরিয়া উঠিল, প্রচণ্ডবেগে হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, শৈলবালা দিলীপের পানে চকিতমাত্র চাহিয়াই লজ্জায় নতমুখী হইয়া পড়িলেন। তাহা না হইলে তাহার সেই পূর্ণ অনুরাগব্যঞ্জক অথচ লজ্জায় রক্তিমরাগে রঞ্জিত মুখমণ্ডল দেখিয়া কিরণসিংহ নিশ্চয়ই সন্দিগ্ধমনা হইতেন। শৈলবালা দুই তিন বার মস্তক তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুই তিন বারই মস্তক

যেন আপনা আপনি মত্ত হইয়া পড়িল। প্রভাবতী শৈল-বালার এই ভাব দেখিয়া, এবং নবানুরাগ সন্দেহ করিয়া তাঁহার কাণেকাণে বলিলেন "ও কি লো! তুই পুরুষ বেশের উপযুক্ত পাত্রই বটে, এই যুবা পুরুষ কি মনে ক'রবে বল দেখি?" শৈলবালা একটুকু অপ্রতিভ হইলেন এবং হৃদয়বেগ কতক শমিত করিয়া ঈষৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া প্রভাবতীর কর্ণে আস্তে আস্তে কি বলিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভাবতী কুমারকে বলিলেন "সেই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের কথা মনে করিয়া ইহাঁর এখনও যেন বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না, ক্রোধে এখনও ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ আরক্ত হইয়া উঠিতেছে।" কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ক্রোধের পাত্র বোধ হয় এতক্ষণ এ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, আর আমি জীবিত থাকিতে ভয়ের আশঙ্কা কিছুই নাই।"

শৈলবালা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, বিচ্ছেদের আশঙ্কা?" কিন্তু তাঁহার মনের কথা মনেই মিশাইয়া গেল।

তাঁহারা কি প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইলেন কিরণসিংহ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্‌চতুরা শৈলবালার আজ কথা ফুটিল না। বাল্যসখা দিলীপের সহিত কথা কহিতে তাঁহার আজ এত লজ্জা কেন? যাঁহার সহিত একত্রে শয়ন ভোজন ক্রীড়া য করিতে লজ্জা হইত না, আজ তাঁহার কাছে এত লজ্জা কেন? এ উত্তর শৈলবালা ভিন্ন আমরা কেহ দিতে সক্ষম নহি।

শৈলবালাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল প্রভাবতী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। কিরণসিংহ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "হিন্দুবংশে এমন কুলাঙ্গার কে জন্মিয়াছে যে সে এপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল? ঈশ্বর আমাদের সহায়, তিনি আপনাদের এখানে প্রেরণ করিয়া সেই কুলাঙ্গারের মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই কথা বলিবার নিমিত্ত আবার দেখিতেছি আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে? সে বিশ্বাসঘাতককে কি আপনারা দেখিয়াছেন? তাহাকে চিনিতে পারিলে উত্তম-রূপ দণ্ডবিধান করা যায়।" প্রভাবতী বলিলেন "না, তাহার মুখ আমরা দেখি নাই, কি প্রকারে চিনিব?" প্রভাবতী এবার ভৃত্যকে অশ্ব প্রস্তুত করিতে বলিয়া কিরণকে বলিলেন "অদ্য আপনি আমাদের যে উপকার করিলেন আমরা কখনও যে ইহার শোধ দিতে পারিব, এমন আশা হয় না। আপ-নার নিকট আমরা চিরঋণী রহিলাম।" কিরণসিংহ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমার উচিত কর্ম্ম আমি করিয়াছি, সুতরাং আপনারা আমার নিকট ঋণী নহেন। এখন অদ্যই আমি দিল্লি ফিরিয়া যাইব, আপনাদিগের যদি সেইপথে যাইতে হয় াহা হইলে আমার সঙ্গে যাইলে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া দিতে রি।" প্রভাবতী তাঁহার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ রিলে, কিরণসিংহ তাঁহাদের লইয়া নামিতে আরম্ভ করি-। এদিকে দিবালোকের ন্যায় জ্যোৎস্নালোকে দিকমণ্ডল

ভাসিতে লাগিল। সেই জ্যোৎস্নালোকে নামিতে নামিতে কিরণসিংহ বালক দুটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনারা এই অল্পবয়স্ক বালক; আপনারা এই অসহায় অবস্থায় পর্ব্বতপথে দিল্লি যাইতেছেন দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে। বালকদিগের এপ্রকারে যাইবার কি কারণ হইতে পারে?" শৈলবালা এই সময় কথা কহিবার সুযোগ দেখিয়া প্রভাবতীর কাণে কাণে বলিলেন "আমি এই যুবার সহিত একটু রঙ্গ করি, তুমি নীরব হ'য়ে শোন, তুমি যেন কিছু প্রকাশ কোরো না।" শৈলবালা কিরণকে বলিলেন "আপনি যদিও আমাদের নূতন পরিচিত, তথাপি আপনার সহিত যেরূপ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে, তাহাতে আসিবার কারণ আপনার নিকট বলিতে কোন বাধা নাই।" স্বর শুনিয়া কিরণসিংহ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার কর্ণে যেন বীণা বাজিয়া উঠিল। তিনি যেন সুমধুর বালিকা-স্বর শুনিলেন। সহসা তাঁহার শৈলবালাকে মনে পড়িল। তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। একবার বালিকা বলিয়া তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না। শৈলবালা প্রভাবতীকে দেখাইয়া বলিলেন "ইনি এই অল্পবয়সেই একটি বালিকার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। তাহাকে দেখিবার জন্য পিতামাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ইনি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। নিতান্ত নিরস্ত করিতে না পারিয়া শেষ আমিও সঙ্গে আসিয়াছি।" এই কথায় যুবা

আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। প্রভাবতী বলিলেন "এখানেও তোর রঙ্গ!

শৈল। "তার আবার লজ্জা কি? ইহাঁর নিকট লজ্জার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হয় এই যুবাও কোন যুবতীর প্রতি আসক্ত, তোমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।" কিরণসিংহ অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ লৌহিত প্রভায় শোভিত হইল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শৈলবালা বলিলেন "আমি কি যথার্থ অনুমান করি নাই?"

কিরণ। "আপনারা যখন আমার নিকট হৃদয় খুলিলেন তখন আমারও বলা উচিত। আপনার অনুমান সত্য।" শৈলবালার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। 'তবে এখনো কি সেই শৈলবালাকে তাঁহার মনে আছে? কি অন্য কোন যুবতীর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন?' তিনি বলিলেন "তবে বোধ হয় আপনি তাহারই নিকট যাইতেছিলেন?"

কিরণ। "হায়! না। আমি আপনার বন্ধুর ন্যায় সৌভাগ্যবান নহি।"

শৈল। "কেন, সে যুবতী কি আপনাকে ভাল বাসে না।"

কিরণ। "তাহাও আমি জানিনা, আমি অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই।"

শৈল। "তবে দেখিতেছি আপনি নূতন প্রকারের

প্রণয়ী, আপনি যাহার প্রতি অনুরক্ত তাহার মনের ভাব জানেন না, অনেক দিন হইতে তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত জানেন না, তবে আপনি কি প্রকার ভালবাসেন? আমার বোধ হয় আপনার প্রণয় তেমন গাঢ় নহে।"

কিরণ। "আপনি তাহা মনে করিবেন না, আমার হৃদয় তাহাকে দেখিবার জন্য প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতেছে, কিন্তু এখন সৈনিক ব্রতে ব্রতী হইয়া তাহাকে দেখিবার বিশেষ অবকাশ পাইতেছি না।"

শৈল। "যুবতী আপনাকে ভালবাসে কি না, না জানিয়া আপনি তাহার প্রেমে অনুরাগী হইলেন কেন? সে যদি আপনাকে ভাল না বাসে?"

কিরণ। "কেন ভালবাসি তাহার কারণ বলিতে পারি না, আমি ভালবাসি এই মাত্র জানি। সে যদি এখন আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকে, অন্যকে ভাল বাসে, তথাপি আমি তাহাকে ভাল বাসিব। কিন্তু তাহার কষ্টের কারণ হইব না, তাহার ইচ্ছায় বাধা দিব না, আমার কষ্ট হইলেও তাহার সুখেই আমি আপনাকে সুখী মনে করিব" শৈলবালা আর থাকিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে বলিলেন "তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই যুবতীই প্রকৃত ভাগ্যবতী।" তিনি ভাবিলেন, "কোন্ ভাগ্যবতী দিলীপকে মোহিত করিয়াছে? একি আর সেই বাল্যসখী শৈলবালা? তাহার কি এত সৌভাগ্য হইবে?" এই প্রকার নানা সন্দেহে তাঁহার মন

আলোড়িত হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহারা নীচে আসিয়া পঁহুছিলেন। নীচে কিরণসিংহের সহিত বিজয়ের সাক্ষাৎ হইল। বিজয়, তাঁহার কর্ম্ম সমাধা হইলে দ্রুত যাইবার কোন কারণ না দেখিয়া, ধীরে ধীরে গৃহ অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। এই অসময়ে পর্ব্বতপথে তাঁহার সহিত আর কাহারো সাক্ষাৎ হইবে, তিনি তাহা মনে করেন নাই। কিরণসিংহ দ্রুতগতি আগমন করায়, বিজয়ের অনেক পরে আসিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। বিজয়কে এসময়ে এখানে দেখিয়া কিরণসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "একি? তুমি এখানে কেন?" কুমারকে বালকগণের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বিজয়ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এ আবার কি? আপনি এখানে কেন?"

কিরণ। "আমি বলিতেছি, তুমি অগ্রে বল।"

হঠাৎ কি বলিয়া উত্তর দিবেন স্থির করিতে, বিজয় মুহূর্ত্ত মাত্র সময় লইয়া বলিলেন "এই উপত্যকাভূমিতে একজন সন্ন্যাসী বাস করেন, তিনি ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন. এইবার যুদ্ধে কি হইবে, তাহা আমি এই সন্ন্যাসীর নিকট জানিতে আসিয়াছিলাম। ঝড়বৃষ্টিতে সেই কুটীর হইতে এতক্ষণ প্রত্যাগমন করিতে পারি নাই। ঝড় নিবৃত্তি হইলে সেখান হইতে এই আসিতেছি।"

কিরণ "সন্ন্যাসী কি বলিলেন?"

বিজয়। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আজ

কোথা গিয়াছেন। কিন্তু আপনি আজ এখানে আসিলেন কেন ?”

কিরণ। “আমি কবিচন্দ্রের কি হইল অনুসন্ধান করিতে দিল্লি হইতে আজ বাহির হইয়া যবনশিবিরাভিমুখে যাইতে ছিলাম। কিন্তু একটা কারণবশতঃ আবার দিল্লি ফিরিয়া যাইতেছি। ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় দেখিতেছি আমার আর দিল্লি যাইতে হইবে না, যে কার্য্যে যাইতেছিলাম তাহা তোমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে। আমি যাহা বলি দিল্লীশ্বরকে বলিবে।” এই বলিয়া তিনি প্রভাবতীর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন বিজয়কে সকল বলিলেন। বিজয় শুনিয়া যতদূর ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন করিলেন। তিনি যেন সেই বিশ্বাসঘাতককে পাইলে এখনি তাহার রক্ত পান করেন। ক্রোধে যেন জ্ঞান শূন্য হইলেন। কুমার বিজয়কে সাধ্যমত সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন “তুমি বৃথা কেন ক্রোধ করিতেছ ? এখন ক্রোধ করিলে কি ফল ফলিবে ? তুমি বিলম্ব না করিয়া এখনি দিল্লীশ্বরের নিকট গিয়া ঐ সকল বল, তাহা হইলে সত্য সত্য ফল দর্শিবে, তিনি সাবধান হইতে পারিবেন। তুমি এই সঙ্গে আমার আর একটি উপকার করিলে অনুগৃহীত হই। আমি আর দিল্লী যাইব না, তুমি এই বালক দুটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। ইহাঁরা যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন সেখানে পঁহুছিয়া দিলে পরম বাধিত হইব।” বিজয় বলিলেন “কুমার যাহা বলিলেন

আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" "কুমার" শুনিয়া শৈলবালা চমকিয়া উঠিলেন। "দিলীপ——কুমার! দিলীপ—রাজপুত্র! তবে তাঁহার প্রণয়িনীও কোন রাজবংশীয়া হইবে। অজ্ঞাতকুলশীলা শৈলবালা এখন আর কখনই তাঁহার প্রণয়িনী নহে। তাঁহার সুন্দরী প্রেয়সীর নিকট শৈলবালা এখন দাসীর দাসী। বাল্যসখী শৈলবালার কথা দিলীপের হৃদয়ে এখন আর বিন্দুমাত্রও স্থান পায় না। তাহা হইলে তিনি শৈলবালাকে চিনিতে পারিতেন। যদি সেই বাল্যসখীকে মনে থাকিত তাহা হইলে এতক্ষণে চিনিতে পারিতেন। যে দিলীপের নাম তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে, এখন দেখিতেছেন, তিনি রাজকুমার বলিয়া সেই অনাথিনীকে চিনিতে পারিলেন না, তিনি এখন নবানুরাগী হইয়াছেন।" শৈলবালা আপনার পুরুষবেশ ভুলিয়া গেলেন, দিলীপ তাঁহাকে বালিকা দেখিয়াছিলেন, এখন যে তিনি তাহা হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন তাহাও ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে চিনিতে না পারায় তিনি দিলীপেরই যত দোষ দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন "দিলীপ নবানুরাগী হইয়াছেন।" শৈলবালা তাঁহার দৃঢ়মূল প্রণয় উন্মূলনের চেষ্টা করিলেন কিন্তু হৃদয় উৎপাটিত হয়, তথাপি হৃদয়রোপিত প্রণয় উন্মূলিত হইবার নহে।

কিরণসিংহ বিজয়কে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিতেছেন শুনিয়া প্রভাবতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন

"আমি একটী অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা করিতে হইবে।" কিরণসিংহ হাসিয়া বলিলেন "আপনি কি অপরাধ করিলেন?"

প্রভা। "আমি আপনার ন্যায় উপকারী ব্যক্তির নিকট আত্মপরিচয় লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

কিরণ। "আমি আপনাকে এখনো তো তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই।"

প্রভা। "আপনি না জিজ্ঞাসা করিলেও আমার বলা উচিত ছিল, এখন পরিচয় দিয়া আপনার নিকট প্রায়শ্চিত্ত করি, আপনি একবার কবিচন্দ্রের নাম করিলেন, আপনি কি তাঁহার সহিত পরিচিত আছেন?"

কিরণ। "আছি। আমি তাঁহার অনুসন্ধান জন্যই দিল্লি হইতে বহির্গত হইয়াছি, আজ তাহা নহিলে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতাম না।" প্রভাবতী বলিলেন "আমি কবিচন্দ্রের স্ত্রী—"দিলীপ বিস্ময় সহকারে বলিলেন "আপনি কবিচন্দ্রের স্ত্রী? আপনারা তবে স্বার্থই পুরুষ বেশ ধারণ করিয়াছেন, আমার সন্দেহ সত্য হইয়াছে! তবে আপনাদিগের দিল্লি আগমনের কারণ কি?" প্রভাবতী বলিলেন "আমরাও তাঁহার জন্য আজমীর হইতে আসিতেছি। আপনি যে জন্য যাইতেছেন, সেই কর্ম্মে যদি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তাহা হইলে আপনি দ্বিতীয়বার আমাদের পরম উপকার করেন।" প্রভাবতী পরে শৈল-

বালাকে বলিলেন "কি বল শৈল! ইহাঁর সহিত যাইলে ভাল হয় না?" "শৈল!" শৈল শুনিয়া কুমার চমকিয়া উঠিলেন। গভীর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন স্বপ্নের আভাসে ও সত্যের আভাসে জড়ীভূত হইয়া মনকে বিহ্বল করিয়া তোলে, কিরণের মনও সেইরূপ বিহ্বলপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি তবে আমার সেই হৃদয়ের শৈলবালা নয়? আমার শৈলও তো আজমীরে ছিল?"

কুমার এবার সেই বালকের বদনমণ্ডলে শৈলবালার মুখাবয়ব দেখিতে পাইলেন, তিনি ঘন ঘন তাঁহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন, ঘন ঘন তাঁহার নাম অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তিনি তাঁহার বাল্যসখীকে চিনিতে পারিলেন। উল্লাসে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া গেল,জানিনা কি ভাবনাতে অথবা কি অভিলাষে তিনি যেন ঈষৎ অধীর হইয়া পড়িলেন—আবার পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কতকটা শমিত করিয়া মনে মনে বলিলেন "শৈল! কেন তুমি সেই কুটীরবাসিনী বালিকাই রহিলে না? কেন তুমি সেই শৈশবচাঞ্চল্যের প্রতিমাই রহিলে না? তাহা হইলে আজ তোমাকে সেই বাল্যভালবাসার অনুরাগ ভরে আদর করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে হইত না।" কুমার বুঝিলেন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াই শৈলবালা তাঁহার মন জানিতে

চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ছলনায় মনে মনে হাসিলেন। কিরণসিংহ হর্ষগদগদ চিত্তে প্রভাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শৈলবালাও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন এখনো দিলীপের হৃদয় শৈলবালার পূর্ণ, তিনি এতক্ষণ মিথ্যা দোষারোপ করিতেছিলেন। শৈলবালা ও প্রভাবতীর দিল্লি যাওয়া রহিত হইল দেখিয়া, বিজয়ও অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা দিল্লি যাইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাদের নিকট বিজয়ের কুমন্ত্রণা শুনিয়া সাবধান হইবেন, এই ভাবনায় তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহ অভিমুখে যাইতে যাইতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর এবার নিতান্তই পৃথ্বীরাজের উপর বিমুখ। চন্দ্রপতি ধৃত হইলেন, আমার কুমন্ত্রণা বারম্বার প্রকাশ হইয়াও হইল না, সকলদিক হইতে যবনদিগের জয় হইবার সুবিধা হইতেছে। এখন দেখা যাউক, আমার আশা সফল হয় কি না?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদঘোরি কবিচন্দ্রকে বন্দী করিয়াছিলেন। হত্যাই মুসলমানস্বভাবসূচক, তাহা না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। তিনি ভাবিলেন

"যদি যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহা হইলে কবিচন্দ্রকে বধ করিলে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন। তাহা অপেক্ষা কবিচন্দ্রকে হস্তে রাখিলে যদি যবনদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কোন লোক বন্দী হয়, তবে তাহার উদ্ধারের উপায় রহিল। তাহার পর যদি যুদ্ধে জয় হয়, তখন আর তাঁহাকে মারিতে কতক্ষণ? তাহা হইলে একবার তাঁহার দর্পচূর্ণ করা যাইবে।" এই প্রকার সকল দিক বিবেচনা করিয়া তিনি কবিচন্দ্রকে বধ করেন নাই। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমস্ত দিবারাত্র তাঁহার শিবিরের চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী থাকিত, এবং তিনি শিবিরের মধ্যে কি ভাবে আছেন, কি করিতেছেন, দণ্ডেদণ্ডে প্রহরীগণ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিত। এই অবস্থায় থাকাতে কবিচন্দ্রের পলায়ন করিবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। সমস্ত দিন কষ্টে অতিবাহিত করিয়া, কেবল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তিনি একবারমাত্র নিকটস্থ নদীতীরে গিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতে পাইতেন এবং সেই সময়ই প্রহরীরা ক্ষণকালের জন্য তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিত। প্রথম দুই তিন দিন তাঁহার অদৃষ্টে তাহাও ঘটে নাই। যবনেরা সেই শিবির মধ্যে আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিয়া সেইখানে রন্ধন করিতে বলিয়াছিল। তিনি সেই যবনসংলগ্ন তাম্বুতে রন্ধন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যবনেরা ভাবিল "এখন করি-

তেছে না, যখন উদর জ্বলিবে তখন আর বলিতে হইবে না।” কিন্তু দুই তিন দিবস গত হইল, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তথাপি তাঁহার ক্ষত্রিয়তেজ ও হিন্দুনিষ্ঠার হ্রাস হইল না। তিনি সেখানে আহার করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন “মৃত্যু হইলেও যবনশিবিরে আহার করিবেন না।” তিনি এখন মরেন ইহা পরামর্শসিদ্ধ না হওয়াতে যবনেরা অগত্যা তাম্বুর নিকটস্থ নদীতীরে দিনান্তে এক-বার করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে বাধ্য হইল। তিনি যখন সেইখানে যাইতেন সঙ্গে ছয়জন করিয়া অস্ত্রধারী প্রহরী যাইত। তিনি যতক্ষণ স্নান রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া না অসিতেন তাহারা ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। প্রথম প্রথম এই প্রকার মহা সতর্কতা আরম্ভ হইল। কিন্তু যখন বন্দীর পলায়নের কিছুমাত্র চেষ্টা ও ইচ্ছা দেখিতে পাইল না তখন ক্রমে সতর্কতা কিছু শিথিল হইয়া আসিল। ছয় জন প্রহরী গিয়া চারিজন হইল, চারিজন গিয়া তিনজন হইল, ক্রমে তাহা হইতে আরো কমিয়া আসিল। দুইজন মাত্র রহিল। কোন কোন দিন একজনও থাকিত। আর তাহারা মনে মনে বিবেচনা করিল, বন্দীকে ভয়ই বা কি? যদি পলায়নের চেষ্টা করে, নিকটেই শিবির, একডাকে মুহূর্ত্তমধ্যে কতলোক আসিবে!

একদিন সন্ধ্যাকালে কবিচন্দ্র নদীতীরস্থ এক বৃক্ষমূলে বসিয়া রন্ধন করিতেছেন, অদূরে দুইজন প্রহরী বসিয়া

আছে। অমাবস্যা, চতুর্দ্দিক অন্ধকার। কেবল তাঁহার রন্ধনের অগ্নিতে অল্পস্থান ব্যাপিয়া একটু আলোক হইয়াছে। হঠাৎ কবিচন্দ্রের মনে হইল যেন নদী দিয়া একখানি নৌকা চলিয়া গেল, আর অমনি সেই সময়ই তাঁহার সম্মুখে এক খণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর পড়িল। তিনি তাহা হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাহাতে একখানি পত্র বাঁধা আছে। তিনি শীঘ্র পত্রখানি খুলিয়া লইলেন। প্রহরীগণ প্রস্তর পড়া শব্দ শুনিয়া "কি, কি," করিয়া নিকটে আগমন করিল। কবিচন্দ্র কৃত্রিম ভয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি, জানি না, কিন্তু আমার বড় ভয় হইতেছে। রাম রাম।" একজন প্রহরী ভূত মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইল। আর একজন ভাবিল "হয় তো কেহ আসিয়াছে।" সে চতুর্দ্দিক দেখিতে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভাবিল কোন নিশাচর পক্ষী হয় তো বৃক্ষ হইতে নিম্নে কিছু ফেলিয়া দিয়াছে, তাহারই শব্দ হইল। এই সময় শিবির অঞ্চলে একটা ভয়ানক কোলাহল ওঠাতে, সে সেই ভীরু প্রহরীকে শিবিরে কি হইয়াছে দেখিয়া আসিতে বলিল। কিন্তু কবিচন্দ্রের কথায় সে এত ভীত হইয়াছিল, যে শিবির পর্য্যন্ত একেলা যাইতে তাহার ভয় হইতে লাগিল। তাহার যাইতে অনিচ্ছা দেখিয়া, অন্য প্রহরী বলিল "তবে আমি যাই, শিবিরে কি গোলযোগ হইতেছে দেখিয়া আসি। তুমি সাবধানে পাহারা দেও। যদি আমার আসিতে বিলম্ব হয়,

কয়েদীকে সঙ্গে লইয়া শিবিরে যাইও। আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।" সে চলিয়া গেলে কবিচন্দ্র পত্র পড়িয়া দেখিলেন।—

"আমরা আপনার উদ্ধার জন্য আসিয়াছি। ভয় নাই। কি প্রকারে শীঘ্র উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহার একটা উপায় স্থির করিতে পারেন ত কোনমতে তাহা লিখিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেই আমরা পাইব।"

চন্দ্রপতি ভাবিলেন "যদি এই সুযোগে কোনমতে পলায়ন করিতে পারেন তবেই পারিলেন। কেন না এখন একটীমাত্র প্রহরী এখানে রহিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে কৌশলে কিম্বা বলে পলায়ন করিতে পারিবেন। অধিক প্রহরী আসিলে পলায়ন তত সহজ হইবে না।" এই ভাবিয়া সেই পত্রের পৃষ্ঠে অঙ্গার দ্বারা লিখিলেন "প্রহরী একা—এই সুযোগে।" পত্র লেখা হইলে তাহা উত্তমরূপে মুড়িয়া বৃক্ষ হইতে কয়েকটী পাতা ছিঁড়িয়া লইলেন। সেই পাতা গুলিন একটী ক্ষুদ্র নৌকার আকারে সংযোজিত করিয়া একটী পাত্র হস্তে লইয়া জল আনিবার ছলে নদীঅভিমুখে গমন করিলেন, প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পাছে জলে অঙ্গারাক্ষর ধৌত হয় এই জন্য কবিচন্দ্র সেই পাতায় নৌকা করিয়া পত্রখানি জলে ভাসাইয়া দিলেন। পত্র ভাসাইয়া জল লইয়া আসিবার সময় পত্র লইতে কেহ আসিল কি না দেখিতে তিনি এক একবার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিতে

লাগিলেন। প্রহরী মনে মনে আরো ভীত হইল, সে ভাবিল কবিচন্দ্র হয়তো কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছেন। পূর্ব্বের প্রস্তর ছুঁড়া হইতেই সে ভীত হইয়াছিল। কি দেখিতেছ বলিয়া সেও নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল, অমনি শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, অগ্রশীল নৌকার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, অন্ধকারে ও ভয়ে সে ঐ নৌকাকে একটা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির স্বরূপ দেখিল। প্রহরী যে ভয় পাইয়াছে তাহা কবিচন্দ্র বুঝিলেন। সে ভয়ে চীৎকার করিলে শিবির হইতে অন্য লোক আসিয়া তাঁহার পলায়নে বাধা দিবে এই হেতু তিনি তাহার মুখ বন্ধ করা আবশ্যক দেখিলেন। প্রথমে তাহা বলদ্বারা সম্পন্ন না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রহরীকে বলিলেন "দেখ, সাবধান—এখানে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না। যদি উহারা অন্যমনস্ক থাকে, আমরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেই আমাদের দেখিতে পাইবে, অথবা উহাদের আমাদের প্রতি রাগ হইবে, তাহা হইলে এখনি আমাদের বধ করিবে।" প্রহরীর ভয় আরো বৃদ্ধি হইল, এই সময় কিরণসিংহ তরবারি হস্তে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রহরী ভয়ে তাহাকে তালবৃক্ষ প্রমাণ ভয়ঙ্কর মসীময় মূর্ত্তির ন্যায় দেখিল, তাহার হস্তস্থিত তরবারিও বিপরীত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল, সেই মূর্ত্তি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া তাহাকে যেন ধরিতে আসিল। প্রহরী ভয়ে অজ্ঞানবৎ হইয়া পলা-

য়নের চেষ্টা করিল. কিন্তু পদ সরিল না। ক্রমে মূর্ত্তি আরও অগ্রসর হইয়া এক হস্তে তাহার হস্তধারণ করিয়া, অপর হস্তে তরবারি প্রদর্শন পূর্ব্বক বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিল "কথা কহিও না, নিঃশব্দে সঙ্গে আইস। যাহা বলিলাম ইহার ব্যতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলেই এই তরবারি মস্তকে পড়িবে।" প্রহরী কিছুই উত্তর করিল না, তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, সে কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহার পড়িবার লক্ষণ দেখিয়া কিরণসিংহ হস্ত ছাড়িয়া দিলেন, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। কবিচন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিলেন "উহাকে আর নৌকায় লইয়া যাইতে হইবে না, প্রহরী ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। উহার জ্ঞান হইতে হইতে আমরা অনেক দূর যাইতে পারিব এবং আমরা কোন্ দিকে যাইব তাহা না জানায় জ্ঞান হইলেও পথ বলিয়া দিতে পারিবে না।" তাঁহারা তখনি নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কবিচন্দ্র নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন সেই কুটীরবাসী দিলীপ তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি দিল্লী হইতে আসিতেছ ?" কিরণ বলিলেন "হাঁ, আপনার যবনশিবির হইতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি মহারাজের আজ্ঞা লইয়া আপনার সন্ধানে আসিয়াছি।" প্রভাবতী ও শৈলবালার সংবাদ দিলীপ কিছু জানেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে কবিচন্দ্রের ইচ্ছা হইল, কিন্তু আজমীরের সংবাদ তাঁহার কিছু জানিবার সম্ভাবনা

নাই দেখিয়া সে অনুসন্ধান হইতে তিনি নিরস্ত রহিলেন। ক্রমে নৌকা শিবির হইতে দূরে আসিলে কিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কি আর কোন ভয় আছে।" কবিচন্দ্র বলিলেন "না, আর কোন ভয় নাই। এখন দিল্লীর সমাচার কি? তাহা শুনিতে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, শীঘ্র বল।"

কিরণ। "দিল্লীর সমাচার সমস্ত মঙ্গল। আজ অধিক রাত্রি হইয়াছে, শুইতে চলুন, কাল সে সব কথা হইবে।" কিরণের ইচ্ছা ছিল না যে, শৈলবালা ও প্রভাবতী তাঁহার সহিত আসিয়াছেন তাহা চন্দ্রপতি আজ জানিতে পারেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়াছিলেন, চন্দ্রপতি নিদ্রিত হইলে প্রভাবতীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবেন, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গে হঠাৎ প্রভাবতীকে নিকটে দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রপতি অতিশয় বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইবেন। পাছে কথায় কথায় তাঁহাদের আসার কথা বলিয়া ফেলেন—সেই জন্য তিনি আজ অধিক কথা কহিতে চাহিলেন না। দিল্লীর কোন মন্দ সমাচার না শুনিয়া চন্দ্রপতি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ঐটুক মাত্র শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। সমস্ত রাত্রি তিনি দিলীপের নিকট দিল্লীর সংবাদ শুনিতে পাইতেন, যুদ্ধের কি প্রকার আয়োজন হইতেছে জানিতে পারিতেন, আপনি মহম্মদ ঘোরির সহিত বিজয়ের যে পরামর্শ শুনিয়াছিলেন তাহা দিলীপের নিকট বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু কির-

ণের সে বিষয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া ও তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া যথার্থ আবশ্যক বোধে, অগত্যা অদ্য রাত্রে সে সকল কথা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। কিরণসিংহ বলিলেন "নৌকার মধ্যে অন্য লোক আছে, আসুন আমরা অদ্যকার মত ছাতে শুই।" কিরণসিংহ ও কবিচন্দ্র সেই রাত্রে নৌকার ছাতে শুইয়া রহিলেন। কতদিন পরে আজ যবন-কবল হইতে নিস্তার পাইয়া, অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া, দিল্লীর সমস্ত মঙ্গল শুনিয়া মনের সুখে, স্বাধীন বায়ু উপভোগ করিতে করিতে, ক্ষণকাল মধ্যেই চন্দ্রপতি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে কিরণসিংহ সেখান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া প্রভাবতীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে কবিচন্দ্র সহসা দেখিলেন প্রভা তাঁহার পদতলে বসিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুতে অপ্রত্যয় জন্মিল, তিনি ভাবিলেন, এখনো বুঝি তিনি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। আবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, বিস্ময়ে হর্‌ষোন্মত্তের ন্যায় শেষে চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিলেন। প্রভাবতী তখন স্বামীর পদতলে পড়িয়া অনন্ত সুখপূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে কাঁদিতে লাগিল, যে আদরের পরশে লজ্জাবতী লতাটি ম্রিয়মান হইয়া পড়ে, শিশিরের সোহাগ চুম্বনে ফুলগুলি আরো ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কতদিন পরে কবিচন্দ্রের মুখখানি দেখিয়া সেইরূপ সোহাগের অভিমান ভরে, তাহার এত দিনকার

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আরো যেন উথলিয়া উঠিল—মাগো, কতদিন-কতদিন প্রভাবতী স্বামীর ঐ মুখখানি দেখিতে পান নাই! পাষাণ প্রাণ বলিয়া বুঝি তাই বাঁচিয়াছে।

কবিচন্দ্র স্ত্রীর অশ্রুপূর্ণ মুখখানি ক্রোড়ে রাখিয়া সুখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ মোহময় ভাবেই তাঁহাদের কাটিল—ক্রমে একটি একটি করিয়া তাঁহাদের কথা আরম্ভ হইল—প্রভাবতী তাঁহার দুঃখের কথা বলিতে বলিতে আহ্লাদে কত কাঁদিলেন। যাহা যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেকও বলিতে পারিলেন না, এখন আহ্লাদে সকল ভুলিয়া গেলেন। যাহা মনে ছিল শেষ করিয়া বলিলেন "আমরা তো আবার সুখী হইলাম, এখন শৈলবালাকে সুখী করিতে পারিলেই হয়।"

চন্দ্র। "কেন, সে কিসে অসুখী?"

প্রভা। "তাহা কি তুমি জাননা? সে যে দিলীপ দিলীপ ক'রে সারা হো'ল। দিলীপ কে তাহা কি তুমি জান? তাঁহার যথার্থ নাম কিরণসিংহ। তিনি সমরসিংহের পুত্র।" চন্দ্রপতি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি? দিলীপ কিরণসিংহ? মহারাজ সমরসিংহের পূর্ব্বাপহৃত বালক! তুমি কিপ্রকারে জানিলে?"

প্রভা। "তাঁহারি মুখে শুনিয়াছি।" কিরণসিংহের সহিত তাঁহাদিগের কিপ্রকারে দেখা হইয়াছিল, প্রভাবতী তাহা

এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কথা আরম্ভ হওয়াতে এখন তাহা বলিলেন। পর্ব্বতগুহায় যে হিন্দুর ও মুসলমানের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন তাহাও সবিশেষ বলিলেন। সেই মন্ত্রণা কিরণসিংহ স্বয়ং পৃথ্বীরাজকে বলিতে না গিয়া, বিজয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া কবিচন্দ্র বজ্রাহত হইলেন। তিনি বলিলেন "কি দৈব! যে নিজে বিশ্বাসঘাতক, তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।" ক্রোধে ও নৈরাশ্যে তাঁহার সেই প্রশান্ত ললাট বিবর্ণ ও ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল, গৌরকান্তিবদন আরক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল, তিনি যবন-শিবিরে মহম্মদঘোরির সহিত বিজয়ের যে পরামর্শ শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে কিরণসিংহকে ডাকিলেন।

কুমার এতক্ষণ শৈলবালার সহিত কথা কহিতে ব্যস্ত ছিলেন। নৌকায় আসিয়া অবধি শৈলবালা ও প্রভাবতী একত্রে থাকাতে, নির্জ্জন না পাইয়া পরস্পর মন খুলিতে পারেন নাই। যবন-অনুসরণভয় হইতে এখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ও নির্জ্জন-আলাপনের সুবিধা পাইয়া তিনি শৈলবালার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতেছিলেন। তাঁহারা দুইজনে পৃথক হইলে, দুইজনের জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহারি কথা কহিতেছিলেন। শৈলবালা বলিলেন "তুমি এখন রাজপুত্র, তোমার কি আর এই অজ্ঞাতকুলশীলা

ব্যল্যসখীকে এখন মনে থাকিবে?” কুমার বলিলেন “কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি যদি রাজকন্যা হইতে, আর আমি যদি রাজপুত্র না হইয়া সেই পূর্ব্বকার দিলীপই থাকিতাম, তাহা হইলে আর তোমার আমাকে স্মরণ থাকিত না। তাহা না হইলে ও প্রকার বলিবে কেন?” শৈলবালা হাসিয়া বলিলেন “স্ত্রীলোকদের প্রণয় ও প্রকার নহে; আমি পৃথিবীশ্বরী হইলেও তোমাকে ভুলিতাম না।

কিরণ। “তবে আমি ভুলিব কেন?”

শৈল। “আমি তোমার সমযোগ্যা নহি।”

কিরণ। “সমযোগ্যা না হইলেও ভুলিতাম না। কিন্তু শৈল! বল দেখি, তুমি সমযোগ্যা নহ কিসে?”

শৈল। “সকল বিষয়ে, প্রধানতঃ কুলে শীলে।”

কিরণ। “তাহা তুমি কিপ্রকারে মীমাংসা করিতে পার? তুমি কি তোমার কুলশীল জান?”

শৈল। “না। কিন্তু যদি জানিতাম, তাহা হইলেও তো তোমার সমযোগ্যা হইতে পারিতাম না। আমার পিতা সন্ন্যাসী, তিনি যত বড় হউন না কেন, রাজবংশীয় তো আর ছিলেন না। আর আমি জানি না, তুমি জান না কি?”

কিরণ। যদি আমি জানি কি হয়?”

শৈলবালা সহাস্যে বলিলেন “কি জান বল না?” কিরণসিংহ তাঁহার পরিচয় বলিতে যাইতেছেন এই সময় কবি-

চন্দ্রের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, যবনেরা নৌকা ধরিয়াছে এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি "বেগে চালাও" বলিতে বলিতে এক লম্ফে নৌকার বাহিরে আসিলেন। আসিয়া ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু বিনা কারণে কবিচন্দ্রের শোকব্যঞ্জক অথচ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। নিকটে আসিলে কবিচন্দ্র মহম্মদঘোরির সহিত বিজয়ের যে পরামর্শ শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বলিলেন। কিরণ তাহা শুনিয়া হতজ্ঞান হইয়া বলিলেন "তবে কি উপায়ে এখন দেশ রক্ষা হয়?"

চন্দ্র। "উপায় তো কিছুই দেখিতেছি না। আমি নৌকা হইতে নামিয়া স্থলপথে অদ্যই দিল্লীযাত্রা করি। তাহা হইলে একটু শীঘ্র যাইতে পারিব। প্রভার নিকট শুনিলাম তুমি এখন চিতোরে যাইবে, তুমি তবে প্রভা ও শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া যাও। স্ত্রীলোক সঙ্গে লইলে আমার দিল্লী পঁহুছিতে বিলম্ব হইতে পারে, আর যুদ্ধমধ্যে স্ত্রীলোক সঙ্গে লওয়াও উচিত নহে, বিপদ সম্ভব। আমি যদি যুদ্ধে বাঁচিয়া আসি, তো চিতোর গিয়া প্রভাকে লইয়া আসিব, ও শৈলবালার সহিত তোমার বিবাহ দিব।" কিরণ এই সময়ে শৈলবালার পরিচয় চন্দ্রপতির নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি অন্য সকল কথা প্রভা ও শৈলবালার নিকট বলিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার কুলশীলের পরিচয় দেন নাই। কথা শেষ হইলে চন্দ্রপতি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ

নৌকা হইতে নামিয়া দিল্লি অভিমুখে গমন করিলেন। প্রভাবতী মস্তকমণি পাইয়াই আবার হারাইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রহরী শিবিরে গোলযোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আসিয়া দেখিল, শিবিরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সৈন্যদের আহ্লাদসূচক জয় জয় নাদে শিবির পরিপূরিত, সে চীৎকারে কর্ণপাত করে কাহার সাধ্য। ক্ষুদ্র সৈনিকদল ও প্রহরীগণ সুরাপান আরম্ভ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সকলই আনন্দের চিহ্ন, যেন এখনি যুদ্ধজয়ের সংবাদ আসিয়াছে। প্রহরী আশ্চর্য্য হইয়া আর একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল ‘কি হইয়াছে? এত আনন্দ কিসের?” সে সুরা ঢালিতে ঢালিতে বলিল “কি হইয়াছে আমরা কি জানি? সভাসদ্‌গণ সকলে যেখানে আজ আহ্লাদে মত্ত হয়েছেন, সেখানে অবশ্য কোন সুসংবাদ আছে। আর তাহা হইলেই আমাদের আমোদ করিবার যথেষ্ট কারণ।” ইহারা এখনো আহ্লাদের কারণ জানে না দেখিয়া, প্রহরী আরো আশ্চর্য্য হইল। সে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল “শুনছি নাকি, আমাদের যুদ্ধে জয় হবে,

কে গণনা ক'রে বলেছে, তাই সবার এত আহ্লাদ হয়েছে।"
প্রহরী এইরূপে আহ্লাদের নিশ্চয় কারণ জানিতে না পারিয়া মহম্মদঘোরির শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, একজন সেনার সহিত মহম্মদঘোরি ও সভাসদ্‌গণ আগ্রহ সহকারে কথোপকথন করিতেছেন।

সে কে, কি বলিয়াছে, কি নিমিত্ত যবনেরা এত আহ্লাদিত হইয়াছে, তাহা সেই প্রহরীর জানিবার অগ্রেই আমরা বলিয়া কৌতূহল নিবারণ করি।

বিজয়ের পরামর্শ জানিতে যে সৈনিকপুরুষকে দিল্লীস্থ পর্ব্বতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে আজ ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদঘোরির নিকট বিজয়ের পরামর্শ জ্ঞাপন করিয়াছে। বিজয়ের সাহায্যে এবার তাঁহারা নিশ্চয়ই রণজয়ী হইবেন, এই আশায় মহম্মদঘোরি প্রভৃতি সকলে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। সামান্য পদবীগত সেনাদল তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, কারণ জানিবার অগ্রেই সেই আহ্লাদের সহিত যোগ দিয়াছে। প্রহরী আসিয়া শুনিল মহম্মদঘোরি বলিতেছেন "তবে আমাদের এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ হইবে? কিন্তু মন্ত্রীপুত্র যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন?" সেই সৈনিক পুরুষ বলিল "না, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, তাঁহার কথায় আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে।"

মহম্মদঘোরি এবার তাঁহার সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন "তবে আমরা আজকালের মধ্যে এখান হইতে

শিবির উঠাইয়া দিল্লী আক্রমণার্থে যাইব, হঠাৎ আক্রমণ করিলে যুদ্ধজয়ের আরো অধিক সম্ভব।" সেনাপতি বলিল "আপনার আদেশ গোলামের শিরোধার্য্য।" মহম্মদঘোরি আবার সেই সৈনিক পুরুষকে বলিলেন "তবে পথে তোমার কোন বিপদ ঘটে নাই?" সে বলিল "না, কোন বিপদই ঘটে নাই।" ফিরিয়া আসিবার সময় কিরণসিংহ কর্তৃক তাড়িত হইয়া যবনদূত যে প্রাণভয়ে পলাইয়া পর্ব্বতপ্রদেশে লুকাইয়াছিল দুইটি কারণ বশতঃ তাহা আর সে মহম্মদ-ঘোরির নিকট প্রকাশ করিল না। প্রথম কারণ, মহম্মদ-ঘোরি ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিলে পাছে তাহার দৌত্যকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া, এবং তাহাকে কাপুরুষ ভাবিয়া, তাঁহার অঙ্গী-কৃত পুরস্কার তাহাকে না দেন; দ্বিতীয় কারণ, কিরণসিংহ যখন সেই বালকদিগকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় পর্ব্বতারোহণ করিলেন, তখন বিজয়কে একাকী দেখিয়া সে তাঁহার সহিত আবার সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং বিজয়সিংহ তাঁহাদের পরা-মর্শ প্রকাশ বিষয়ে অভয় প্রদান করাতে সেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে সকল কথা মহম্মদঘোরির কাছে প্রকাশ করিবারও কোন আবশ্যক দেখিল না। মহম্মদঘোরি তাহার দৌত্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু অগ্রে যে কথোপকথন হইয়াছিল প্রহরী তাহা জ্ঞাত না থাকাতে এখন যাহা শুনিল, তাহাতে আহ্লাদের কারণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। পরে সেই সেনা

মহম্মদঘোরির শিবির হইতে বাহিরে আসিলে প্রহরী তাহার নিকট সবিশেষ শুনিল। আহ্লাদের কারণ জ্ঞাত হইয়া সেও অন্য প্রহরীগণের ন্যায় আহ্লাদে মত্ত হইল। সুরাপানে গীতবাদ্যে আমোদে রত হইল। যে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত মুসলমানেরা নরহত্যাকেও মোক্ষপ্রদ বলিয়া মনে করে, সুরাপান না করাও আবার সেই ধর্ম্মের একটি বিশেষ আজ্ঞা, কিন্তু সে আজ্ঞা তাহাদিগের মধ্যে অল্প লোককেই পালন করিতে দেখা যায়।

আমোদপ্রমোদে প্রহরী কিছুক্ষণ কবিচন্দ্রের কথা ভুলিয়া গেল। হঠাৎ আবার তাহার কবিচন্দ্রের কথা স্মরণ হইল। তখন দেখিল তিনি এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। এত বিলম্ব হইল, এখনো কবিচন্দ্র শিবিরে ফিরিয়া আসিতেছেন না কেন এই ভাবিয়া সে আবার নদীতীরে গমন করিল। যেখানে চন্দ্রপতি রন্ধন করিতেছিলেন, সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, সে শিবির হইতে ফিরিয়া আসিতে, আসিতে তাঁহারা এতক্ষণ অন্য পথ দিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একবার মাত্র কষ্টনিঃসৃত কাহার অস্ফুট স্বর তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল। তাহা কিসের শব্দ, চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া প্রহরী দেখিতে পাইল নদী হইতে কিয়ৎদূরে এক জন মনুষ্য পড়িয়া রহিয়াছে, ভাবিল ঐ ভয়-প্রসূত স্বর তাহারই। প্রথমে সে তাহাকে চিনিতে পারিল

না, নিকটে আসিয়া দেখিল যে সে সেই ভীরু প্রহরী। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া তাহার বিস্ময় জন্মিল। নদী হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে চক্ষে দিতে লাগিল। ভীরু প্রহরী একটু সজ্ঞান হইল। কিন্তু নিকটে মনুষ্য দেখিয়া সহসা প্রেতযোনি জ্ঞানে "আল্লা আল্লা" করিয়া আবার অজ্ঞানপ্রায় হইল। অন্য প্রহরী ঐরূপ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি হইয়াছে? এ প্রকার করিতেছ কেন? আমি সেরআলি, আমাকে ভয় করিতেছ কেন!" সেরআলির কথায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল না, সে ভাবিল সয়তান তাহার সহিত চাতুরী করিতেছে। সে স্পন্দহীন হইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। সেরআলি আবার বলিল "উঠ উঠ, কয়েদী কোথায়?" প্রহরী এবার আস্তে নেত্র উন্মীলিত করিয়া তাহাকে সভয়ে দেখিতে লাগিল। উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে সেরআলি বলিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিল। তখন সে উঠিয়া বসিল, কিন্তু কথা কহিলে পাছে সেই বিকট-মূর্ত্তি আবার আসে সেই ভয়ে কথা কহিল না। সেরআলি আবার জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে? কয়েদী কোথায়?" সে অঙ্গুলি দ্বারা নদী দেখাইয়া দিল। এখনও কথা কহিল না। সেরআলি বলিল "কি? নদীতে পলাইয়া গেছে?" প্রহরী মস্তক নাড়িয়া বলিল "না।" সেরআলি অধীর হইয়া বলিল "তবে কি হইয়াছে?" প্রহরী সভয়ে তাহার কর্ণে মুখ দিয়া বলিল "কর কি? অত চেঁচাইয়া কথা কহিতেছ

কেন? তাহা হইলে কয়েদীর দশা আমাদেরও হইবে।” সেরআলি আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “কয়েদীর তবে কি হইয়াছে?” প্রহরী বলিল “এখানে আমার বলিতে ভয় হইতেছে, শিবিরে গিয়া বলিব।” প্রহরী এই রূপে কবিচন্দ্র কোথায় বলিতে বিলম্ব করাতে, সেরআলি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল ‘কয়েদী কোথায়? শীঘ্র বল্ নহিলে আমি এইখানে তোকে মারিয়া রাখিয়া যাইব।” প্রহরী উপায় না পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল “তাহাকে সয়তানে লইয়া গিয়াছে।” এবার সেরআলি বুঝিতে পারিল কয়েদী প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে এখনও যদি ধরা যায় এই আশায় সে শিবিরের লোককে ডাকিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মশালধারী এবং অস্ত্রধারী লোক দ্বারা নদীতীর পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা দেখিল তাহাকে ধরিবার আশা বৃথা। নৌকা কোন্ দিকে গিয়াছে কেহ জানে না। যদি দুই দিকে নৌকা পাঠান যায় তাহা হইলেই যে কয়েদী ধৃত হইবে এমন ঠিক নাই। এতক্ষণ হয়তো কূলে নামিয়া কোথায় লুকাইয়া আছে। সেই জন্য এখন তাহারা কবিচন্দ্রের অনুসন্ধানে না গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত মহম্মদঘোরিকে জানাইতে গেল। কিন্তু এই ঘটনার পরও সেই ভীরু প্রহরীর বিশ্বাস রহিল যে কবিচন্দ্রকে সয়তানে লইয়া গিয়াছে। এ বিশ্বাস তাহার মন হইতে কেহ অপনীত করিতে পারিল না।

সে এইরূপ বিশ্বাস অনুসারে মহম্মদঘোরির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদঘোরি যখন শুনিলেন কবিচন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত আক্ষেপ হইতে লাগিল। কিন্তু এখন ক্রোধ করিয়া কোন ফল নাই, যদি যুদ্ধে জয় হয় তবে হিন্দুদের উপর ইহার শোধ তুলিবেন, এই ভাবিয়া আপাততঃ সে ক্রোধ দমন করিলেন। মহম্মদঘোরি দেখিলেন কবিচন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তিনি দিল্লিতে অগ্রে পঁহুছিলে তাঁহাদের জয় হইবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন জন্মিবে। কবিচন্দ্রের নিকট বিজয়ের বিশ্বাসঘাতকতা শুনিলে পৃথ্বীরাজ সতর্ক হইবেন ও পূর্ব্ববারের ন্যায় তাড়িত হইয়া তাঁহাদের হয় ত এদেশ হইতে পলায়ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই বা কি প্রকারে মহম্মদঘোরি এবার স্বদেশে ও ভ্রাতার নিকট মুখ দেখাইবেন? আর এখন বিলম্ব করিবারই বা আবশ্যক কি? বিজয়ের পরামর্শ জানিবার জন্য এতদিন

অপেক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাহা জানিয়াছেন, এখন যত শীঘ্র দিল্লি পঁহুছিতে পারেন ততই ভাল। পৃথ্বীরাজ উত্তম রূপে যুদ্ধের আয়োজন করিবার অগ্রে যাইতেই হইবে। আবশ্যকমতে সত্যচ্যুত হইলে পাপ নাই। এই সকল ভাবিয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রেই তিনি সসৈন্যে দিল্লি যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত জঙ্গলপথ দিয়া গুপ্তভাবে চলিয়া অষ্টম দিবসের রাত্রে স্থানেশ্বরের পরপারে উপস্থিত হইয়া সেখানে একটী অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইলেন। রাত্রিটুক মাত্র বিশ্রামের পর তিনি কিয়দংশ সৈন্য সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া, ৩০০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া ঘোর ঘোর থাকিতেই নদী পার হইলেন এবং সহসা হিন্দুসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থে রাজপুতনার করপ্রদ ও সন্ধিবদ্ধ রাজগণ সকলে এখনো এখানে আসিয়া পঁহুছেন নাই। এত দিনে দুই এক জন মাত্র আসিয়াছেন। বিজয়ের চাতুরীতে অনেকে পত্র প্রাপ্ত হন নাই, কেহবা আসা আবশ্যক মনে করেন নাই। আবার জয়চন্দ্রের কুপরামর্শেও অনেকে বিচলিত হইয়া এবং তাঁহার বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে কেহ বা বাধ্য হইয়া আপন আপন স্বীকৃত সাহায্য প্রেরণে বিমুখ হইয়াছেন। এইরূপ নানা কারণে পৃথ্বীরাজ এখনো আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু সাহায্যের আশায় না থাকিয়া পৃথ্বীরাজ

আপাততঃ উপস্থিত সৈন্যগণ লইয়াই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকায়, হিন্দুসেনাগণ সহসা আক্রান্ত হইলেও যবনেরা শিবির পর্য্যন্ত না আসিতে আসিতে সৈন্যেরা উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইল।

আজ সমরক্ষেত্রের ভয়ানক ভাব দেখিলে হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। একদিকে যবনসৈন্যগণ দৃশদ্বতী পার হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আস্ফালন করিতেছে। কাহারো হস্তে বর্শা, কাহারো হস্তে কৃপাণ, কাহারো হস্তে বল্লম, কাহারো হস্তে ধনুক, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, সকলেই যেন আজ ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'আল্লা-হো' শব্দে দিক্‌দিগন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। অপর দিকে ধনুর্দ্ধারী ও কৃপাণধারী রাজপুত সৈন্যগণ যবন-সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদন করিতেছে। সম্মুখেই কামানশ্রেণী উদ্‌ঘাটিত বদনে যেন শত্রুবিনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে। "জয় পৃথ্বীরাজের জয়" "জয় সমরসিংহের জয়" শব্দ হিন্দু সৈন্যগণের মধ্যে চারিদিক হইতেই উত্থিত হইতেছে। রাজপুত ও যবনসৈন্যের সমাবেশের কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। ক্ষত্রিয় সৈন্যদের সম্মুখীন শ্রেণী প্রায় একক্রোশ পথ জুড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে স্বল্পতর সৈন্যের সমাবেশ। মধ্যশ্রেণীর সেনাপতি পৃথ্বীরাজ, তাঁহার দক্ষিণ দিকে সমর-

সিংহ আপনার মিবারসৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের বামপার্শ্বের সৈন্যশ্রেণী যুবরাজ কল্যাণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ভাগে বিজয়সিংহ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, সম্মুখীন শ্রেণীতে সৈন্যের অভাব হইলে তাহা পূরণ করিতে অথবা কোনস্থানে হঠাৎ কোন অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এদিকে মহম্মদঘোরি সম্মুখীন সৈন্যশ্রেণী স্বল্পতর করিয়া পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যশ্রেণী প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, সৈন্যে সৈন্যে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হইল। ক্ষত্রিয়সৈন্যগণ বিকট গর্জ্জন করিয়া "জয় পৃথ্বীরাজের জয়—জয় পৃথ্বীরাজের জয়" এইরূপ রব করিতে করিতে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। পৃথ্বীরাজের সৈন্যশ্রেণীই প্রথমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যবনসেনার সম্মুখীন শ্রেণীসমূহকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল, বিকট গর্জ্জনে কামান গর্জ্জিতে লাগিল, গোলার আঘাতে সম্মুখীন বিশালাকার যবনেরা খড়্গ ও ধনুক হস্তে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ আল্লাহোর অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল, কেহ বা পলায়নপর হইল। ক্রমে পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ আরো অগ্রসর হইতে লাগিল, জয়ধ্বনি করিতে করিতে জলপ্রপাত বেগে যবনদিগকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। মহম্মদঘোরি বন্যার জলের ন্যায় সম্মুখীন সৈন্যশ্রেণী পশ্চাদ্ভাগ

হইতে ক্রমাগত বাড়াইতে লাগিলেন। কামানের গোলা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে সসৈন্যে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়া পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিলেন, সৈন্যদিগকে উত্তেজনা-বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, উৎসাহে স্বয়ং সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া স্বহস্তে কৃপাণ চালনা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বদেশ হইতে একবার পৃথ্বীরাজের ব্যূহ ভঙ্গ করিবার উপক্রম করিলেন, কতকটা ভঙ্গও করিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়তলবারে আগুয়ান যবনসৈন্যদল পলকের মধ্যে ছিন্নমস্তক হইয়া অশ্বারোহীদিগের অশ্বপদে দলিত হইয়া গেল। মহম্মদঘোরি এইবার দ্বিগুণতর ভীষণ পরাক্রমের সহিত তাঁহার সমস্ত সৈন্যের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য একেবারে চালিত করিয়া পৃথ্বীরাজের ব্যূহের ভগ্নাংশে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তুমুল সংগ্রাম বাধিল, সমরসিংহের ও কল্যানের সৈন্য আসিয়া প্রবিষ্ট যবনদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল, অশ্বপদ ও রথচক্রের ঘর্ষণে সমুত্থিত ধূলিরাশি এবং কামানের ধূম-সমূহ নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, যেন প্রলয়কালের জলদরাশিতে দিগন্ত আবরিত হইয়া গেল, সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, কামানের শব্দ, সৈন্যদের কোলাহল, রণবাদ্যের নিনাদ একত্রিত হইয়া প্রলয়ের বজ্রের ন্যায় গর্জ্জিত হইতে লাগিল, দিকমণ্ডল আলোড়িত হইতে লাগিল, ঘন ঘন তলবার চালনায় প্রলয়ের বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল। বীরপদদাপে পৃথিবী কম্প-

মান, যেমন প্রলয়বিপ্লবে ধরণীমণ্ডল কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছে। পৃথ্বীরাজ সম্মুখে, কল্যাণ বামপার্শ্ব হইতে, এবং সমরসিংহ দক্ষিণদিক হইতে যবনসৈন্যদলকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সময় যদি বিজয়সিংহ আসিয়া চতুর্থ দিকটি ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতেন তাহা হইলে ব্যূহগত একটি যবনকেও আর ফিরিয়া যাইতে হইত না, একটী যবনের পক্ষেও আর সে রাত্রি প্রভাত হইত না, কিন্তু বিজয়সিংহ অক্ষত্রিয় ব্রতে দীক্ষিত হইয়া স্বচ্ছন্দে আপন সৈন্য সমস্ত লইয়া পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ভাগে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহার সৈন্যদের উৎসাহ বরং অবরোধ করিতে চেষ্টা পাইলেন এবং 'এখনো সময় হয় নাই' বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এদিকে মহম্মদঘোরি তিনদিক হইতে ভয়ানক রূপে আক্রান্ত হইয়া, যবনসেনার অধিকাংশকেই ধরাশায়ী দেখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসমেত চতুর্থ দিকদিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। আপনিই সকলের অগ্রে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন, সেনাগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধশ্বাসে অনুগমন করিল, পৃথ্বীরাজ সমরসিংহ ও কল্যাণ তিন জনেই তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং ক্ষত্রিয়-তরবারের খরসানে আর্য্যস্থল যবনরক্তে প্লাবিত করিয়া তুলিলেন। যবনেরা দৃশদ্বতীর পরপারে যাইলেপর ক্ষত্রিয়েরা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিল। হিন্দুরা রণজয়ী হইল। সকলে

মিলিয়া মহাদেবের পূজায় ও আশাপূর্ণা দেবীর জয়কীর্ত্তনে অধিক রাত্রি যাপন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ, সৈন্যগণকে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া আবার মহিষী ও উষাবতীকে দেখিতে চলিলেন। ভাবিলেন, সেখান হইতে আসিয়া তাঁহারা সসৈন্যে পরপারে গিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিবেন। গত দিবসের পরাজয়ের উপর আজ আবার পরাজিত হইলে যবনেরা আর ক্ষণকালও ভারতবর্ষে থাকিতে সাহসী হইবে না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্থানেশ্বরে রাজ শিবিরের একটি প্রকোষ্ঠে রাজমহিষী মুমূর্ষু উষাবতীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতেছেন। মহিষীর আর সে শরীর নাই, তিনি আর পূর্ণযৌবনা নাই, এই কয়েক দিনেই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে যাঁহারা ইহাঁকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পারেন কি না সন্দেহ। নিকটে কল্যাণ ও পৃথ্বীরাজ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের আজ আবার এখনি যুদ্ধে যাইতে হইবে বলিয়া ইহাঁদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

নিশা অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনো দিবার আলোক দেখা দেয় নাই, সেই জন্য এই রুগ্নকক্ষে এখনো প্রদীপ জ্বলিতেছে। কল্যাণ একদৃষ্টে রাজকন্যার সেই নির্জীব নির্দ্দোষ মুখ-মণ্ডলে চাহিয়া আছেন, কিন্তু এই সময় তিনি যে কি ভাবিতেছেন, তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? আগ্নেয়গিরি বিদারণের পূর্ব্বে যদি কেহ তাহার অভ্যন্তরের অবস্থা দেখিয়া থাকেন; যদি কেহ তাহার গর্ভস্থ আগ্নেয় পদার্থ ও ধাতুময় পদার্থের অভিঘাত প্রতিঘাতরূপ ভীষণ ব্যাপার অনুভব করিতে পারেন, তিনিই কল্যাণের চিত্তবিকার বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার প্রাণের উষাবতী আজ মৃত্যু-শয্যায় শয়ান—আবার তিনিই সেই মৃত্যুর কারণ। তিনিই তাঁহার বিমল চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বজ্রগম্ভীর স্বরে 'মায়াবিনী' বলিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কঠোর আঘাতে যে লতাকে তিনিই ছেদন করিয়াছেন সেই ছিন্ন লতার জন্য তিনিই আবার আজ শোক করিতে আসিয়াছেন!

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যাতনায় ও লজ্জায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় উষাবতীর প্রাতঃশশী-সদৃশ ম্লানকান্তি মুখমণ্ডলের উপর চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার অর্দ্ধমুদিত রক্তোৎপলসদৃশ নয়নযুগলের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। শোকে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। তাঁহার

সেই শোকব্যঞ্জক বীরমূর্ত্তি দেখিলে ক্ষুদ্রশিশুও সেই শোক অনুভব করিতে পারিত। পৃথ্বীরাজ কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিছুক্ষণ কাহারো বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পৃথ্বীরাজ অগ্রে কথা কহিয়া বলিলেন "মহিষি! এই হৃদয়-বিদারক ঘটনায়ও আমাদের অধীর হওয়া উচিত নহে। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশরক্ষাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম—অদ্য আবার সেই দেশরক্ষার জন্য যাইতেছি। এখন শত শত বিপদে পড়িলেও তাহাতে নিরুৎসাহী হইব না ও তাহাতে ভঙ্গ দিব না। এখন আমি চলিলাম। দেবী আশাপূর্ণাই তোমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। তাঁহারই হস্তে এখন আমি প্রাণাধিক পত্নী ও কন্যাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।" মহিষী কাঁদিতেছিলেন, সকল কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, তিনি বলিলেন "এবার গৃহলক্ষ্মী আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, ভাগ্যলক্ষ্মীও আমাদের প্রতি নির্দ্দয় হইবেন। আমার মনে হইতেছে এবার যুদ্ধে জয় লাভ হইবে না।"

পৃথ্বী। "সে কি মহিষি! ওরূপ কথা তোমার মুখ হইতে নির্গত হইল কেন? যে যবনদিগকে কা'ল একবার যুদ্ধেই পরাস্ত করিয়াছি; তাহাদিগের নিকট আমরা আবার পরাজিত হইব? শোকে ব্যাকুল হইয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্যের প্রতিও আজ

তোমার অবিশ্বাস হইতেছে। ধর্ম্মের জয়েও আজ তোমার সন্দেহ জন্মিতেছে। তবে যদি সত্যই ঈশ্বর তাহাই করেন, যদি সত্যই এখন অধর্ম্মের জয় হয়, এখন অবধি যদি সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীকে আর আলোক প্রদান না করেন, তাহা হইলে পরাজিত হইয়া আমি কখনই জীবন্ত ফিরিব না। যুদ্ধে জয় লাভ হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে, নহিলে এই পর্য্যন্ত।”

মহিষী বলিলেন “দেব! তুমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাক ইহা আমি ইচ্ছা করি না। তবে তুমি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে মরিতে পারিব না, মনে এই খেদ থাকিবে। কিন্তু আমাদের এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ তাহা মনে ভাবিও না। যদি তোমার মৃত্যু হয় আমিও তোমার অনুগামিনী হইব। পরলোকে আবার আমরা সকলে একত্রে মিলিত হইতে পারিব। দেব! তবে আর তুমি বিলম্ব করিও না—আর আমাদের ভাবনা ভাবিয়া মনকে কষ্ট দিও না।”

কল্যাণ এপর্য্যন্ত একটিও কথা কহিলেন না। তাঁহার অনুতাপিত চিত্ত হইতে বাক্য স্ফুরিত হইবার নহে। আপনাকেই এই মর্ম্মভেদী ঘটনার মূলীভূত কারণ জানিয়া তিনি অনুতাপিত চিত্তে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে ছিলেন, হায়! কাহার জন্য আজ এই কুসুমলতিকা অকালে শুষ্ক হইয়া গেল? তিনি কি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী নহেন? তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত দেশ হইতে যেন এই সকল কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—“আমিই সম্পূর্ণ দোষী, পৃথিবীতে

আমার মত দোষী নাই, আমার মত পাপী নাই। এই নির্দ্দোষ পবিত্রহৃদয়া বালিকাকে আমিই অবিশ্বাস করিয়াছিলাম? যে নির্ব্বোধ বালা আমাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিত, যাহার আমাতেই সকল সুখ, যে আমা বই কাহাকেও জানিত না, তাহাকেও অবিশ্বাস করিয়াছিলাম? তাহার সরলতার কি এই পুরস্কার? তাহার হৃদয়দানের কি এই প্রতিদান? আমিই নির্ব্বোধ ভাবে, নির্দ্দয় ভাবে স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কলিকাকে ছিঁড়িয়া দলিত করিয়াছি। উঃ!— দেবি! ভগবতি, চিতোর অধিষ্ঠাত্রি! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমাকে কি শাস্তি দিবে দাও। আমার হৃদয়ে নরকাগ্নি জ্বালাইয়া দাও—আমি অবিকৃত ভাবে তাহা সহ্য করিব? কিন্তু নরকের জ্বালা কি ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক? নরকের জ্বালাও কি ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত জ্বালা? ভগবতি! তোমার নিকট আমি যে প্রার্থনা করি এমন অধিকারও কি আমার আছে? এ পাপীর মুখ হইতে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারিত করিলে কি তাহা কলুষিত হইবে না? তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেও আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু দেবি! প্রসন্ন হও! আমি সঙ্কুচিতভাবে তোমার নিকট কেবল একটীমাত্র প্রার্থনা করি। আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করিতেছি না, এবং যত দিন বাঁচিব করিব না, আমার আপনার জন্য প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমি এই প্রার্থনা করি, উষাবতীকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে

স্থান দাও, আমি তাহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছি, তাহা যেন তোমার অমৃত বারিতে নির্ব্বাপিত হয়।”—বলিতে বলিতে তিনি আবার উষাবতীর দিকে চাহিলেন—অমনি তাঁহার হৃদয় দারুণ যাতনায় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদিলেন, ভাবিলেন “আমি এখনও কি ও পবিত্র মুখচন্দ্র দেখিবার অধিকারী? আমি নৃশংস! আমি স্ত্রীহন্তা! আমি সতীহন্তা! আমি আমার প্রাণাধিক প্রণয়িণীহন্তা! আমার ও মুখ দেখিবার আর অধিকার নাই।” আবার মনে করিলেন “আমি ত এখনি যুদ্ধে যাইব, মরিব, আমি কি উষাবতীর কাছে অপরাধী হইয়া মরিব? না, আমি বিগলিতনেত্রে তাঁহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব, আপনার অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিব। মার্জ্জনা করেন ভালই—নহিলে সমরাঙ্গনে উষাবতীর নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া এ জীবন বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু কাহার কাছে মার্জ্জনা চাহিব?—উষাবতীর কাছে? উষাবতী তো রুগ্ন, উষাবতী আমার তো অজ্ঞান, উষাবতী আমার মৃতপ্রায়। উঃ—!” কল্যাণের আর চিন্তা করিবারও শক্তি রহিল না। হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল।

তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিলেন, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। অবশ হইয়া রাজকন্যার পদতলে পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তক

রাজকুমারীর চরণে ঠেকিল। মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও রাজকন্যা চরণ সরাইয়া লইলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া চমকিত হইলেন, কিঞ্চিৎ ভীতও হইলেন। নিকটে গিয়া কল্যাণের মস্তক ধরিয়া সাদরে বলিলেন "কল্যাণ, প্রাণাধিক কল্যাণ!" কল্যাণের আর সাড়া নাই, তাঁহার আর সংজ্ঞা নাই। একদিকে মৃতপ্রায় প্রাণের দুহিতা, অন্য দিকে শোকোন্মত্ত মহিষী, অপর দিকে মূর্চ্ছাপন্ন পুত্রপ্রায় বীরকেশরী কল্যাণ, পৃথ্বীরাজের হৃদয়ও যেন দলিত হইয়া গেল। সহসা সৈন্যদিগের 'ওই যবন আসিয়াছে' 'ওই যবন আসিয়াছে'— এই ভীষণ কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যবনেরা আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তিনি চমকিত ভাবে মহিষীকে বলিলেন "মহিষি! আর আমি থাকিতে পারি না, যবন আসিয়াছে, আমি এক্ষণে বিদায় হই, যুবরাজ কল্যাণ ও ঊষাবতী তোমারই কাছে রহিল। আর বিলম্ব করিলে আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবে, স্নেহ মমতার নিকট ক্ষত্রিয়বীর্য্য পরাজিত হইবে।" মহিষী সজলনয়নে বলিলেন "দেব! আমি অচৈতন্য যুবরাজ ও মুমূর্ষু দুহিতাকে লইয়া একাকী কি প্রকারে থাকিব? তুমি এখন চলিয়া গেলে আমি নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িব, তাহাতে আবার যুদ্ধে—" তাঁহার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই পৃথ্বীরাজ বলিলেন "ভদ্রে! ভগবতী কাত্যায়নী তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, ক্ষত্রকুল-লক্ষ্মী এক্ষণে নিদ্রিতা

হয় নাই, ধর্ম্মই আমাদের সহায়।" মহিষী বলিলেন "কিন্তু—"

পৃথ্বী। "না মহিষি, আর কিন্তু না। আমি অনুচিত বিলম্ব করিতেছি, তুমি আর রোদন করিয়া আমার গমনে বাধা দিওনা।"

মহিষী। "মহারাজ! ক্ষত্রিয়-স্ত্রী কি কখন স্বামীর যুদ্ধযাত্রায় বাধা দিতে পারে। আমি তোমাকে বাধা দিতেছি না—আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম যে, অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত না কুমারের জ্ঞানোদয় হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকিয়া আমাদের সাহস বর্দ্ধন কর। কিন্তু তাহাতেও যদি যুদ্ধের কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে, এখনি যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয় লাভ কর।" এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতেই কল্যাণ একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। পরিচারিকাগণ তাঁহার মুখে চক্ষে জল সিঞ্চন করিতেছিল। তাঁহাকে জাগিতে দেখিয়া রাণীকে বলিল "রাজমহিষি, যুবরাজ সচেতন হইয়াছেন।" মহিষী কল্যাণকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কল্যাণ! তোমার অতিশয় যাতনা হইতেছে?" কুমার তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ভগবতি শৈলসুতে! দেবী ক্ষত্রকুল-লক্ষ্মি!—" মহিষী কথঞ্চিৎ ভীত হইয়া কুমারের হস্ত ধরিয়া "কল্যাণ, কল্যাণ, যুবরাজ কল্যাণ!" বলিয়া বার বার ডাকিতে লাগিলেন। কুমার চমকিত হইয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার

বোধ হইল যেন প্রকৃতই ভগবতী তাঁহার রোদনে কাতর হইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভাব হইয়াছেন, তিনি চাহিয়া দেখিলেন—রাজমহিষী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহার কিঞ্চিৎ লজ্জা হইল, তাঁহার বাক্য শেষ হইল। কিন্তু তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ভগবতী শৈলসুতে! দেবী ক্ষত্রকুল-লক্ষ্মি! যদি আজও আমি তোমাকে আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে উষাবতীর একবার চৈতন্য সম্পাদন কর, আমি একবার তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার করি, অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লই।" বলিতে বলিতে কল্যাণের ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, অজস্র অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িতে লাগিল। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্যথিত হৃদয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আবার উষাবতীর দিকে চাহিলেন। তুষারক্লিষ্টা ম্লানা কমলিনীকে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল। নয়নের শতধারা শুকাইয়া গেল, আর একবিন্দু বারিও নেত্রে আসিল না। যদি পূর্ব্বকার ন্যায় কাঁদিতে পারিতেন, তাহা হইলেও হয় তো হৃদয়ের অগ্নি আবার কিছু নির্ব্বাণ হইত। কিন্তু তাহাও হইল না—হৃদয় নিভৃত, শরীর স্তম্ভিত, শিরায় শিরায় শোণিত স্তব্ধ রহিয়াছে, তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, কিছুই শুনিতেছেন না, কিছুই ভাবিতেছেন না, জ্যোতিঃহীন নয়ন অনিমেষ রহিয়াছে। হঠাৎ শরীরে রক্ত চম-

কিয়া উঠিল. নির্জীব জ্ঞান সজীব হইল, চিন্তা হৃদয়ে দেখা দিল, তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন "আজ ও সুন্দর মুখ শুষ্ক কেন? ও মধুর কণ্ঠ নীরব কেন? ও প্রেমপূর্ণ নয়ন মুদ্রিত কেন? কাহার জন্য আজ ইহাঁর মাতার হৃদয় শূন্য? পিতা ভগ্নহৃদয়; কাহার জন্য তাঁহারাও আজ মৃতপ্রায়? আমি পাষণ্ড—আমিই তাহার কারণ। নীরবে আমার হৃদয়ে আগুন জলিতেছে, আমরণ তাহা আহুতি পাইবে। তবে আমি যাই—কামানের জ্বলন্ত মুখে ছুটি, পৃথিবীর সহিত আমার বন্ধন ছিড়িয়া যাক্, হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দেহও ছিন্ন হউক, জীবন বিচ্ছিন্ন হউক। তবে চলিলাম—উষার অগ্রেই যেন আমি পৃথিবীর নিকট বিদায় লইতে পারি।" এই সময় পৃথ্বীরাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "যুবরাজ কল্যাণ কি তবে স্ত্রীলোকের মত শোকে অধীর হইয়া পড়িবে। যুদ্ধের কথা কি একেবারে বিস্মৃত হইবে?" কল্যাণ কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন "মহারাজ! অগ্রসর হউন, আমি এখনি যুদ্ধে যাইব।" পৃথ্বীরাজ দেখিলেন, যে কল্যাণ যদি আর অধিক ক্ষণ এই থানে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় শিথিল হইয়া পড়িবে, শোকে আরো অধীর হইবেন। শোকের সময় শোকদৃশ্য সন্তাপবৃদ্ধিকর। এই ভাবিয়া তিনি ঈষৎ কপট কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তবে কি আজ ক্ষত্রবীর কল্যাণের পক্ষে রণক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশান্ত রুগ্নকক্ষই অধিক প্রিয়তর?" কল্যাণ অপ্রতিভ হইলেন। কোন উত্তর না

করিয়া কিয়ৎক্ষণ নতমুখে থাকিয়া যাইবার জন্য রাণীর কাছে বিদায় লইলেন। কিন্তু কি কারণ বশতঃ জানি না, অচেতন উষাবতীর মুখের দিকে আর না চাহিয়াই মৃদু পদনিক্ষেপে পৃথ্বীরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্দ্বারে গমন করিলেন। ক্রমে যখন সৈন্যকোলাহল ও রণবাজনা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। যখন সৈন্যদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, তখন সমরোৎসাহই তাঁহার মনে বলবৎ হইয়া উঠিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ যখন রাজমহিষীর শিবিরে গমন করিলেন, তখন যোগীন্দ্র সমরসিংহ প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিতে পুণ্যতোয়া দৃশদ্বতীর কূলে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাঁহার অনুচর অল্প সংখ্যক সেনারাও ক্ষত্রিয়-রীতি অনুসারে পূজায় প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে নিশা অবসান হইল, উষা-সমাগমে পূর্ব্বদিক রক্ত নীল পীত নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, লতা পল্লব ঈষৎ দুলাইয়া, সরোবর কাঁপাইয়া, দৃশদ্বতীর নির্ম্মল বক্ষ ঈষৎ তরঙ্গিত করিয়া মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, তীরস্থ মল্লিকা মালতীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মধুলুব্ধ মক্ষিকা-

গণ উড়িয়া উড়িয়া গুণ গুণ শব্দ আরম্ভ করিল, অশোক কিংশুকের শাখা হইতে পাপিয়ার পিউ পিউ, কোকিলের কুহূ কুহূ কণ্ঠরব নিদ্রিত সৈনিকদিগকে চমকিত করিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমরসিংহেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি যবনসৈন্য দৃশদ্বতীর প্রায় অর্দ্ধেক অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, পশ্চাতে বহুসংখ্যক সেনা পার হইবার জন্য নিরীহ ও নিস্তব্ধ ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। সমরসিংহ তাঁহার অনুচরদিগকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য বিজুলিগতি একত্রিত করিয়া পৃথ্বীরাজকে সংবাদ দিতে দুই জন অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে সমরসিংহ তাঁহার অনুচরবর্গকে লইয়া সম্মুখীন যবনদলের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। যবনেরা অর্দ্ধেক জলে অর্দ্ধেক স্থলে দাঁড়াইয়া অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। আল্লাহো করিতে করিতে ঝুঁকিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সমরসিংহের অটল অচল বীরভাবের বিরুদ্ধে তাহারা আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সমরসিংহ ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অনুচরের মধ্যেও অনেকে হত বা আহত হইয়া পড়িল, এদিকে ক্ষত্রিয় সৈনিকেরা পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণের অন্তঃপুর হইতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাদের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া, অনেকে সমরসিংহের সাহায্য জন্য আগমন করলি, ওদিকে আবার বিপুল যবনসেনা

ভীষণ বেগে আগুয়ান সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়া সকলে মিলিয়া দুর্দ্ধর্ষ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময় পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমরসিংহের বিপদ দেখিয়া তীব্রগতিতে নদীতীরে পঁহুছিয়া "জয় আশাপূর্ণার জয়" নাদে যবনদিগকে আক্রমণ করিলেন। সমরসিংহও ক্রুদ্ধ সিংহের পরাক্রমে শাণিত কৃপাণ বিদ্যুৎবৎ চালাইতে চালাইতে বিপক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাবানলের মত প্রচণ্ড অথচ চঞ্চল ভাবে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। যবনেরা পৃথ্বীরাজের নবাগত সৈন্যদল দেখিয়াই তো পলায়নপর হইয়াছিল, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়-বিক্রমে ত্রাসিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকলে পলাইতে লাগিল, পশ্চাদ্ভাগে চাহিতেও আর কাহারো সাহস হইল না।

ক্ষত্রিয় সৈন্যগণের শিবিরে ফিরিয়া আসিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও আহত সৈনিকেরা বিশ্রামলালসায় কেহ শিবির মধ্যে কেহ বা বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিল। সেই দিন অপরাহ্ণে সমরসিংহ পৃথ্বীরাজ মন্ত্রী ও বিজয়সিংহ প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া মহম্মদঘোরির সহিত এখন কিরূপ ব্যবহার করা উচিত সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শেষে সকলে এই স্থির করিলেন যে মহম্মদ ঘোরি যদি এখন আপন ইচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, কেননা অক্ষম

পলায়নপর শত্রুকে ক্ষমা করাই এখন কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়যোগ্য কার্য্য নহে? কিন্তু বিজয়-সিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি বলিলেন "যবন-দিগের আবার ইচ্ছা কি, যখন তাহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভারতবর্ষ স্পর্শ করিতেও স্পর্দ্ধিত হইয়াছে তখন তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমরা যুদ্ধে তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া, দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। যুদ্ধে আবার মীমাংসা কি; যবনদিগকে আবার ক্ষমা করিব কি? বৈরনির্য্যাতনে আবার অমায়িকতা কি?" পৃথ্বী-রাজ ও সমরসিংহ উভয়েই বলিলেন "যথেষ্ট দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, দুর্ব্বল দলিয়া আর কি হইবে, এবং অকারণ আমা-দিগের সৈন্যক্ষয় করিবারও আবশ্যক নাই। তাহারা যদি এখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চায়, আমরা তাহাদিগকে এবারও ক্ষমা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিব এই প্রস্তাব করিতে অদ্যই তাহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করা যাউক, কেন না তাহারা স্বয়ং এইরূপ যাজ্ঞা করিতে এবার সাহসী হইবে না।" এই কথায় সকলেই অনুমোদন করিল এবং মহম্মদঘোরির নিকট দূত প্রেরিত হইল। মহম্মদঘোরি অতীব আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দুই দিন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার অনেক সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, এইরূপ দুই একবার যুদ্ধে পরাজিত হই-

লেই, তাঁহাদের আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। বিজয় তাঁহার পক্ষে থাকায় মধ্যে মধ্যে পলায়নের উপায় ও অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারাওতো আর জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, এই সকল ভাবিয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। আপনারাই সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিতে সাহসী না হইয়া বিজয়ের পরামর্শ জানিতে গোপনে তাঁহার নিকট অগ্রে লোক প্রেরণ করিলেন, বিজয়ের কথায় আবার তাঁহার জয়ের আশা হইল এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিজয় পরামর্শ দিলেন "সন্ধি স্থাপন করুন, তাহা হইলে হিন্দু সেনাগণ নিশ্চিন্ত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে, তখন হঠাৎ আক্রমণ করিবেন, কিন্তু প্রথমে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আনিবেন না, কতক সৈন্য লুক্কায়িত রাখিবেন! হিন্দুসৈন্যগণ যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, সেই অবশিষ্ট লুক্কায়িত সৈন্যভাগ লইয়া আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয় হইবে।" মহম্মদঘোরি বিজয়ের পরামর্শানুসারে সন্ধি স্থাপন করিলেন। পৃথ্বীরাজের ক্ষমাগুণে তিনি যেন অত্যন্ত উপকৃত হইলেন, এইরূপ ভাব সেই দূতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে স্কন্ধাবার উঠাইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দূত থাকিতে থাকিতেই

উঠিয়া যাইবার অনেক আয়োজন হইয়া গেল। দূত দেখিয়া শুনিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধি স্থাপন হইয়াছে এবং মহম্মদঘোরি পৃথ্বীরাজের নিকট অত্যন্ত অবনতি স্বীকার করিয়াছেন, দূতমুখে এই সকল বার্ত্তা সৈন্যদিগের মধ্যে প্রচার হইলে, তাহাদের আনন্দ-ধ্বনিতে, ভারতের জয়ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল বিদারিত হইতে লাগিল, সেনাপতিতে সেনাপতিতে গাঢ় আলিঙ্গন ও সৈনিকে সৈনিকে উৎসব-সম্ভাষণে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেনাদলের মধ্যে পৃথ্বীরাজ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজ রাত্রে আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করত পূজা করিয়া এবং তদুপলক্ষে উৎসব সমাধা পূর্ব্বক কাল প্রাতঃকালে সকলকেই দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল পৃথ্বীরাজ, উষাবতী পীড়িত বলিয়া প্রয়োজনীয় অল্প সৈন্যসমেত সপরিবারে অল্পদিন এইখানে থাকিবেন। পূজার আয়োজনেই সমস্ত দিন সৈনিকেরা ব্যস্ত রহিল। কেহ কুসুমরাশি অন্বেষণে, কেহ বলিদানের ছাগমহিষ অনু-সন্ধানে, কেহ দৃশদ্বতীর পবিত্র জল আহরণে, এইরূপে হর্ষো-ল্লাসে সকলে নানাদিকে চলিয়া গেল। কেহ কেহ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। ক্রমে প্রতিমা প্রস্তুত হইলে সকলে মিলিয়া ঘোর করতালি দিয়া, আশাপূর্ণার জয়শব্দে আর্য্য-স্থল কম্পিত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার প্রথম প্রহর অতীত হইল, আকাশের প্রান্তবর্ত্তী তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র অস্তমিত

হইল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবরিত হইতে লাগিল। কিন্তু আকাশের তারকারাজিতে এবং সৈন্যদের প্রদীপিত অনল শিখায় সেই অন্ধকার কেবল ক্ষেত্রপ্রান্তেই ঘনীভূত হইয়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল। পূজার উৎসবে, বলিদানের কোলাহলে, তুরিভেরীর বাদ্যরবে, জয় জয় নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। ধূপধূনার সমুত্থিত ধূমরাশি, বলিদানের রক্তলহরী, বিবিধ কুসুমের সুরভিপ্রবাহ সকলই উৎসব বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল। কোনখানে শত শত সেনা একত্রিত হইয়া পুরুরাজের পরাক্রমের গল্প ও ক্ষত্রিয়-বিক্রমের জয়কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে, কোনখানে শত শত সৈন্য ভোজামোদে মত্ত রহিয়াছে, কোথাও বন্ধুতে বন্ধুতে হৃদয় খুলিয়া হৃদয়ের কথা কহিতেছে, কেহ যবন ভীরুতার কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে, কেহ কেহ অন্যের নিকট নিজ নিজ প্রণয়িনীর রূপগুণের ব্যাখ্যা করিতেছে, কেহ বা বিরহ-যন্ত্রণায় সুখস্বপ্ন দেখিতেছে। কেহ পূজা সমাপ্তে শারীরিক ও মানসিক শান্তি লাভ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কেহ শিবিরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বৃক্ষতলে, সকলেই আজ বিশৃঙ্খলভাবে সুরাপানে মত্ত হইয়া, গীতবাদ্য উৎসবে সময় অতিবাহিত করিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই আবার সকলে দিল্লি প্রত্যাগমন করিবে, স্ত্রীপুত্র কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে, যবন পরা-

জয়ের গল্প করিতে পারিবে—সকল দিকেই উৎসাহ ও উল্লাস।

পূজা সমাপ্ত হইলে ক্ষেত্রপ্রান্তবর্ত্তী আশাপূর্ণার পূজার স্থল যখন শূন্য হইয়া পড়িল, যখন সকলে উৎসবে মত্ত হইল, তখন সমরসিংহ কেবল একাকী এই নিভৃত প্রান্তর মধ্যে আশাপূর্ণার প্রতিমার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবী উদ্দেশে তিনি করযোড়ে মুদ্রিত নয়নে বলিলেন "দেবি আশাপূর্ণে! ভগবতি ক্ষত্রিয়কুললক্ষ্মি! তুমিই প্রসন্ন হইয়া আমাদের—তোমার ক্ষত্রিয় সন্তানদের—আশাভরসা পূর্ণ করিয়াছ—কি বলিয়া যে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভাব প্রকাশ করিব, জানি না। ভক্তির উচ্ছ্বাসেই সমস্ত হৃদয় পূর্ণ। মাতঃ! তুমি অন্তর্যামিনী, তুমিই আমার অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত একবার নেত্রপাত কর, তুমিই হৃদয়ের সমস্ত ভাব বুঝিয়া লও—আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া সমরসিংহ ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন কৃতজ্ঞতা সহকারে আবার প্রতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিলেন যেন সেই প্রতিমার জ্যোতির্ম্ময় নেত্রযুগল হইতে দুইবিন্দু অশ্রুবারি পতিত হইয়া কপোলের রক্তময় আভাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিল। দেখিয়া সমরসিংহ চমকিত হইলেন, ভীত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যোগীন্দ্র সমরসিংহ বুঝিলেন, ইহা কোন ভাবী অমঙ্গল

ঘটনার লক্ষণ। "না জানি আমরা দেবীচরণে কি অপরাধ করিয়াছি, না জানি ইহা আবার কিরূপ অমঙ্গলের সূচনা।" এই ভাবিয়া সমরসিংহ দেবীকে প্রসন্ন করিতে আবার তাঁহার আরাধনায় বসিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর দেবীর সেই ম্লানমুখচ্ছবি প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল না। তখন সমরসিংহ নিরাশ ও নিরানন্দ হৃদয়ে পূজা সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না, ভাবিলেন এই অমঙ্গল লক্ষণ শুনিলেই এই আনন্দের পর সকলে নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ হইবে এবং তাহাতে আশু কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব ইহা এখন গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য। সমরসিংহ যখন ব্যাকুল চিত্তে এই অশুভ লক্ষণের ফলাফল ভাবিতেছিলেন, তখন বিজয়সিংহ দৃশদ্বতীকূলে একাকী ঘোর চিন্তায় অভিভূত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে দুই তিন জন রাজপুতবেশধারী যবনসেনা নদী পার হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। তিনি সশঙ্কিত ভাবে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া অতি মৃদু, অতি সতর্ক ভাবে, তাহাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিছু পরে তাহারাও সতর্কতা সহকারে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বিজয়ও ধীরে ধীরে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ কোথায়? তাঁহারা শয্যাশায়ী মুমূর্ষু উষাবতীকে আজ আবার দেখিতে গিয়াছেন। রণজয়ী

হইয়া কাল সকালে আবার সকলে দিল্লি প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এই আহ্লাদে আজ সকলেই উন্মত্ত, কিন্তু কল্যাণ?—তাঁহার একমাত্র অবশিষ্ট কামনা, একমাত্র ইচ্ছা ব্যর্থ হইল, সমরেও তাঁহার মৃত্যু হইল না। তাঁহার হৃদয়যাতনা এখন কে বর্ণনা করিবে? মনে করিয়াছিলেন যুদ্ধে মরিবেন, উষাবতীর অগ্রেই এই পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু কই?—সমরেও তো তাঁহার মৃত্যু হইল না। তাঁহার মৃত্যু হইল না কেন? উষাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবার নিমিত্তই কি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল না? তবে এখন আর কি উপায় আছে? আত্মহত্যা? আত্মহত্যার কথা মনে করিয়া এই দারুণ যাতনার মধ্যেও ক্ষত্রিয়-বীর শিহরিয়া উঠিলেন। এই জঘন্য কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না, আত্মহত্যা তো কাপুরুষের কর্ম্ম, তাহা হইলে চিতোর রাজবংশের অপমান করা হয়, ক্ষত্রিয় সহিষ্ণুতার গর্ব্ব লোপ হয়, মনে মনে বলিলেন, "না, না, তাহা হইতে পারে না, আত্মহত্যা করিব না, বাঁচিয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ করিব, জীবন্তে চির কাল পুড়িব, নহিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি? যে বিজন, জলন্ত, দিগন্ত-প্রসারিত মরুপ্রান্তরের মধ্যে পশু নাই, পক্ষী নাই, তৃণ নাই, লতা নাই, সেই উষ্ণ বালুকাময় মরুভূমিমাঝে বসিয়া উষাবতীর সুখের নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিব, যেখানে আগ্নেয়গিরি-গর্ভ ভেদ করিয়া জলন্ত বহ্নি ও গলিত ধাতুস্রোত উদগীরিত হইতেছে, সেই

থানে সেই অগম্য ভীষণ পর্ব্বতে বসিয়া উষার জন্য প্রার্থনা করিব। না—আমি মরির না—মরিলে লঘু দণ্ড হইবে. মরিলে এ গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, আমি চির কাল অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া দারুণ দগ্ধযন্ত্রণা ভোগ করিব তাহাতেও যদি এ পাপের কিছুমাত্র শান্তি হয়, কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে আমি তাহাই ভোগ করিব।” তিনি এইরূপ নানা প্রকার দারুণ যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে উষাবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিন প্রহর হইল। এই সময়ে সহসা বাহিরে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। এই নিস্তব্ধ কক্ষকে কাঁপাইয়া সৈনিকদিগের গগণভেদী রব ধ্বনিত হইল। পৃথ্বীরাজ বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, “আবার কি হইল” বলিয়া কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ক্রমে কোলাহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পৃথ্বীরাজ, রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া কল্যাণের হস্ত ধারণ করতঃ বাহিরে আসিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। এখনো কন্যাবৎসলা মহিষী সেই অচেতন উষাবতীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আছেন, তাহার

মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে-ছেন, কখন ধীর গতি অশ্রুজল আপন চক্ষু হইতে মুছিতে-ছেন, কখন উষাবতীর আলু থালু কেশ-রাশি গুছাইয়া দিতেছেন, কখন বা ধীরে ধীরে কন্যার মুখচুম্বন করিতেছেন। পরিচারিকাগণ বাতাস করিতেছিল, মহিষীর যেন কিছুই মনঃপূত হইতেছে না, অমনি তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া কখনও বা কন্যাকে বাতাস করিতে-ছেন, কখন বা কন্যার মস্তক আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিতে-ছেন। অনেক ক্ষণ পরে উষাবতীর এইবার একটু জ্ঞান হইল, তিনি শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে দেখিতে দেখিলেন যে পাশেই স্নেহময়ী মাতা বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ, সম্মুখে পরিচারিকা-গণও মৌন ও স্তম্ভিত প্রায়—উষাবতী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হই-লেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন "মা, কি হইয়াছে? কাঁদিতেছ কেন মাগো? যাই যে—বড় যাতনা হইতেছে কেন মা?" এই বলিয়া মহিষীর হস্ত আপন বক্ষের উপরে স্থাপন করিলেন। কথা কহিতে কহিতে উষাবতী আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মহিষী কন্যার কথায় আরো কাতর হইলেন। কাতর দৃষ্টিতে কন্যার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, অজস্র অশ্রুধারা কপোল বহিয়া কন্যার কেশজাল আর্দ্র করিয়া দিল, তিনি সস্নেহে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা মুছাইয়া দিলেন, আবার নূতন অশ্রুধারা পড়িয়া কেশজাল আর্দ্র হইতে লাগিল। তিনি

ধীরে ধীরে কন্যার মস্তক ক্রোড় হইতে উপাধানে স্থাপন করিলেন। অমনি সহসা উষাবতী সকরুণস্বরে "পিতা— যুবরাজ—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহিষী ব্যগ্র হইয়া আপন ক্রোড়ে মস্তক উঠাইয়া লইলেন তিনি ভাবিলেন "হয়তো রাজকন্যা মস্তকের ব্যথিত স্থানে বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু পরেই আবার বুঝিলেন তিনি বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া প্রলাপে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন। তাহাই সত্য, রাজকন্যা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—

—যেন তিনি কল্যাণের সহিত যমুনার শ্যামল তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, দুজনে প্রেমালাপে মগ্ন রহিয়াছেন। কল্যাণ লজ্জিত ভাবে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। কল্যাণের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আবার সুখী দেখিয়া তিনি যেন আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে মনে মনে হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ক্ষমা করিতেছেন। কিন্তু লজ্জায় ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না, কেবল অধরের হর্ষ-উচ্ছ্বাসিত মধুর হাস্য, প্রেমপূর্ণ নয়নের স্থিরজ্যোতিঃ তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কথা কহিতে কহিতে কল্যাণ উষাবতীর চরণ ধরিতে গেলেন। উষা সলজ্জভাবে মৃদু হাসি হাসিয়া সরিয়া গেলেন। তাঁহার কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন "উঠ উঠ, প্রাণ থাকিতে তোমাকে ওঅবস্থায় দেখিতে পারিব না, তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন?

আমি কি তোমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য? তুমি কি দোষ করিয়াছ যে আমি তাহার জন্য তোমার উপর অভিমান করিব? তবে তুমি ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি তোমার কোন দোষ জানি না। তুমি আমার দেবতা স্বরূপ। দেবতারা যাহা করেন কিছুই দোষের নহে। তোমার মনের ভ্রম দূর হইয়াছে, তুমি যে আর আমাকে মায়াবিনী ভাবিতেছ না, তুমি যে আবার আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, এই আহ্লাদেই আমার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে দোষ ধরিবার বিন্দুমাত্রও স্থান নাই।" কল্যাণ আহ্লাদে অধীর হইলেন। পরস্পর উভয়েই এখন মহাসুখী। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই সুখ দেখিতেছেন। যাহা দেখিতেছেন, তাহাতেই হর্ষ, তাহাতেই আশা, সকলি এখন তাঁহাদের নিকট হাসিতেছে! এখন সন্ধ্যাকাল, প্রকৃতি প্রশান্ত ও মধুময়। জ্যোৎস্নায় প্রদীপ্ত হইয়া নদীতীরস্থ বৃক্ষশাখাগণ প্রদোষ পবনে মন্দ মন্দ দুলিতে দুলিতে মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে যমুনাবারি নিঃশব্দে সেই তীরবাসী পাদপমূল আর্দ্র করিয়া আবার নদীতে গড়াইয়া পড়িতেছে। সুনীল যমুনা এখন জোৎস্নার স্ফটিক কিরণে বিধৌত হইতেছে। মৃদু নিনাদিনী, তটপ্রঘাতিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচীমালা নৃত্য করিতে করিতে তটিনী তট স্পর্শ করিতেছে; নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত আকাশ অমনি সেই তরঙ্গমালার সহিত নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। এখন চতুর্দ্দিকে

শোভা, চতুর্দ্দিকে হর্ষ, চতুর্দ্দিক শান্ত। সহসা উষাবতী আবার অন্যপ্রকার দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। পৃথিবী বিপরীত ভাব ধারণ করিল। প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। সহসা শান্তির স্থলে অশান্তি উপস্থিত হইল। ভীষণ কোলাহলে নিস্তব্ধতা নিঃশেষিত হইল। চতুর্দ্দিক মধুময়ের পরিবর্ত্তে ভয়ানক হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন আর জ্যোৎস্না নাই, আর নক্ষত্রমালা নাই, সহসা ঘন ঘোর মেঘে গগন আচ্ছন্ন হইল, গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী আবরিত হইয়া গেল, ভীষণ ঝটিকা আসিয়া প্রচণ্ড প্রতাপ প্রকাশ করিল। বায়ুর শব্দে, মেঘ গর্জ্জনে, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা এখন পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া তীরাভিমুখে ঝাঁপিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইহার মধ্যে একবারও বিদ্যুৎ হানিল না, কিম্বা একবিন্দু বৃষ্টিবারিও পতিত হইল না। অন্ধকারে তাঁহারা বাটী দেখিতে পাইলেন না। এই দুর্যোগে উষাবতীর নিমিত্ত কোন আশ্রয় অন্বেষণে কল্যাণ অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। পাছে অন্ধকারে উষাবতীকে হারাইয়া ফেলেন এই ভয়ে কল্যাণ তাঁহার হস্ত দৃঢ় করিয়া স্বহস্তে ধারণ করিলেন। উষাবতীও দুর্যোগে ভীত হইয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই পর্ব্বত প্রমাণ বীচিমালা কূলে আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। অমনি উষাবতীর স্বপ্ন ভিন্নভাব ধারণ করিল।

তরঙ্গের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। কি আশ্চর্য্য উহা তো ভীষণ তরঙ্গ নহে। সেই তরঙ্গগুলি এখন অসংখ্য অসংখ্য নৌকারূপে পরিণত হইল। নৌকা তীরসংলগ্ন হইলে অসংখ্য অসংখ্য যবন সেনা কূলে লাফাইয়া পড়িল। প্রভূত যবন সেনায় নদীতীর যেন মেঘাবৃত হইল। বায়ুর শব্দ ও মেঘ গর্জ্জন গিয়া যবনদিগের আল্লাহো ধ্বনি গগনস্পর্শ করিল, অস্ত্রের ঝণঝণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যবন দেখিয়া কল্যাণের ক্ষত্রিয় রক্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি ঊষাবতীকে ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধে তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া ঊষাবতীকে সেই বিপন্ন অবস্থাতেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া তীর-বেগে যবনবিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কল্যাণকে একাকী সেই অসংখ্য যবন মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঊষাবতী সভয়ে সেই খানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে আবার মোহ ভাঙ্গিল। দেখিলেন যে যমুনাতীরে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেখানে আর যমুনা নাই। তাহার পরিবর্ত্তে সেই খান দি[illegible] রক্তনদী বহিয়া যাইতেছে। শোণিত প্রবাহে সহস্র সহস্র তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণে বারম্বার আঘাত করিতেছে। তীরে অসংখ্য অসংখ্য মৃত মনুষ্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিত তিনিও শয়ন করিয়া আছেন। শৃগাল কুক্কুরে সেই সকল মৃত দেহ লইয়া বিবাদ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে শকুনি গৃধিনী শবলোভে সেইখানে উড়িয়া

আসিতেছে। অদূরে রণবাদ্য বাজিতেছে। কামানের গম্ভীর গর্জ্জন ও অস্ত্রের ঝন ঝন ধ্বনি শুনা যাইতেছে। তিনি সভয়ে ধীরে ধীরে সেই রণক্ষেত্রে উঠিয়া বসিলেন। কি ভয়ানক দৃশ্য! তিনি তাঁহার পিতা পৃথ্বীরাজকে যবন-করে বন্দী দেখিলেন। রাজবাটী অনলময় দেখিলেন। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি বসিতে পারিলেন না, ঢলিয়া পড়িলেন, একটী শবের রক্তময়গাত্রে পড়িয়া গেলেন। দেখিলেন—তিনি কল্যাণের মৃতদেহের উপর পড়িয়া গিয়াছেন। স্বপ্নে এইরূপ দেখিবামাত্র তিনি অমনি বিহ্বল-চিত্তে "পিতা—যুবরাজ" বলিয়া সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মহিষী ত্রস্তভাবে "উষা, উষা, মা—কেন অমন করিতেছ? বলিয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন। উষার আবার চেতনা হইল, ধীরে ধীরে পদ্মনেত্র উন্মীলিত হইল. গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। মহিষী বলিলেন "মা. কোন ভয় পেয়েছিলে?" ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে উষা বলিলেন "হাঁ মা, একটী ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মা—পিতা—আর—আর—?" এই খানে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল। পাংশু বদনে ঈষৎ লোহিত আভা দেখা দিল, তবুও কল্যাণের নাম বলিতে পারিলেন না। "—তাঁহারা সব কোথায়? তাঁহাদের দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। স্বপ্ন দেখিলাম যেন পিতা—যেন যুবরাজ"—উষাবতী আর

বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আবার নিদ্রিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চিকিৎসক আসিলেন। রাজবালার আজ মুর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে, তিনি কথা কহিয়াছেন, শুনিয়া ভাবিলেন "একি! আজ সহসা এরূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি কেন? যে পীড়ার আতিশয্যে দুই দিন হইতে প্রত্যহ মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াছি, হঠাৎ তাহার এরূপ উপশম হইল কেন? পীড়া কি আবার আরোগ্য হইবে? কিম্বা ইহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ? যাহাই হউক, অদ্যকার দিন যাইলেই নিশ্চয় বুঝা যাইবে।" ইহা আরোগ্য চিহ্ন কিম্বা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ তাহা চিকিৎসক নিশ্চয় না জানিয়াও তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। উষাবতীর নিস্পন্দ মুখের ভাব দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সে মুখ ঈষৎ হাস্যে বিকসিত হইতেছে, প্রাতঃ পদ্মের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে, দেখিলেন উষাবতীর ওষ্ঠাধর মৃদু মন্দভাবে কাঁপিতেছে, যেন কি বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ক্রমে শুনিতে পাইলেন "ইন্দ্র-ভুবন—পারিজাত—ঐ—যুবরাজ—তুলিয়া দাও—মাথায়"—কণ্ঠস্বর কণ্ঠেই মিশাইয়া গেল, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে উষাবতী দক্ষিণবাহু ধীরে ধীরে তুলিয়া আপন স্খলিত কেশ-গুচ্ছের উপর রাখিলেন এবং ঈষৎ সোহাগের হাসি হাসি-লেন। চিকিৎসক মহিষীকে বলিলেন "রাজবালা সুখের

স্বপ্নই দেখিতেছেন, ইহাও একটি সুলক্ষণ। এই সূচিকাভরণ খাওয়াইতে হইবে। মস্তকে আর ঔষধ দিতে হইবে না। মস্তক এখন উত্তম দেখিতেছি। আজ এখন যে প্রকার লক্ষণ দেখিয়া যাইতেছি এই প্রকারে যদি অদ্যকার রাত্রি প্রভাত হয় তাহা হইলে আরোগ্যেরই অধিক সম্ভাবনা। এমন কি, তাহা হইলে রাজবালা সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন।" এই বলিয়া চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। মহিষীর এবং পরিচারিকাগণের মুখ কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রমে অপরাহ্নে উষাবতীর আবার জ্ঞানোদয় হইল। বলিলেন "মা, বড় তৃষ্ণা পাইতেছে।" মহিষী নিজ হস্তে স্বর্ণ পাত্র হইতে জল লইয়া স্বর্ণ ঝিনুকে করিয়া মুখে দিলেন। রাজকন্যা বলিলেন "মা, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন এখান হইতে আর কোথায় গিয়াছি। কেমন সুখে আমরা বেড়াইতেছিলাম! সেখানে কত পারিজাত—কত কনকপদ্ম, সেখানে গেলে তোমাদের দেখিতে পাইব তো?" মহিষী মনের ভাব গোপন করিয়া কষ্টে বলিলেন "পাবে বই কি মা।" উষা বলিলেন "মা, পিতা কোথায়, আর—আর—" উষাবতী যুবরাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আবার লজ্জিত হইলেন। মহিষী বলিলেন "তাঁহারা যুদ্ধে গিয়াছেন।"

উষা। "আমাকে বলে গেলেন না কেন না?"

মহিষী। "তুমি তখন নিদ্রিত ছিলে।" উষাবতীর আবার কথা কহিতে কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "মা, আর আমি

কথা কহিতে পারিতেছি না, একটা কথা—সেখানে গেলে আবার তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে তো?" এই সময় বহির্দ্বারে একটি ভয়ানক কোলাহল হইল। পরিচারিকাগণ সকলে নিবিষ্টচিত্তে সেই দিকে কর্ণপাত করিল। মহিষীও চমকিয়া উঠিলেন। মুমূর্ষুপ্রায় উষাবতীর কর্ণেও সেই কোলাহল অস্পষ্টরূপে প্রবেশ করিল। সহসা দুই তিন জন ক্ষত্রিয় সৈনিক উর্দ্ধশ্বাসে সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "আসুন—আসুন—শীঘ্র আসুন।" সকলে মিলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "কি হইয়াছে," তাহারা উত্তর করিল "বলিবার সময় নাই, শীঘ্র আসুন, যবনদিগের প্রায় জয় হইল, তাহারা এখনি রাজশিবির লুণ্ঠন করিতে আসিবে—শিবিকা প্রস্তুত।" মহিষী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ?" তাহারা বলিল "তাঁহাকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়াছি।" এই কথায় রাজকন্যা চমকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। রাজমহিষী আবার উন্মত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "সমরসিংহ—কল্যাণ?" কল্যাণ নামটি এখনো রাজকন্যার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি সহসা বল পাইলেন। উত্তরের আশায় ঈষৎ মস্তক তুলিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন,—শুনিলেন সমরসিংহ হীনবল হইয়াও এখনো যবনদিগের গতিরোধ করিতেছেন, নহিলে তাহারা এতক্ষণ শিবির পর্য্যন্ত আসিত,—আর যুবরাজ কল্যাণ?—যুবরাজ কল্যাণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অমনি রাজকন্যার মস্তক মৃৎপিণ্ডের

ন্যায় উপাধানে পড়িল। একবারমাত্র পিতঃ—যুবরাজ—এই দুইটি নাম অতি কষ্টে নির্গত হইল। তিনি চক্ষু নিমীলন করিলেন। অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। দীপ নির্ব্বাণ হইল।

কিন্তু প্রাণত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখশ্রী কিছুমাত্র বিকৃত হইল না। বরং তাঁহার বদনমণ্ডলে একটী স্বর্গীয় শান্তভাব আবির্ভূত হইল। তাঁহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ ভিন্ন ও চক্ষু অল্প উন্মীলিত হইয়া থাকাতে মনে হইতে লাগিল তিনি এখনি কথা কহিবেন। রাজমহিষী কন্যার মস্তক পালঙ্গে পড়িতে দেখিয়া সভয়ে তাঁহার নাসিকায় বক্ষে হস্ত দিয়া দেখিলেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস কিছুই পাইলেন না। ক্রমে হস্তপদ মুখাবয়ব দেখিয়া কন্যার যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। মহিষী উষাবতীর পীড়া অবধি আহার নিদ্রা প্রায় সকলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একে এ কয়েক দিন-কার মনের কষ্ট, নিদ্রাহারত্যাগ, তাহাতে আজ পতি-কন্যা-রাজ্যহীনা হইয়া তিনি অসহ্য কষ্টে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে দাসীদিগের শুশ্রূষায় সজ্ঞান হইয়া মহিষী উঠিয়া বসিলেন, অমনি উষাবতীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, সেই সৈনিক পুরুষের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তাঁহার যথার্থ অবস্থা আবার স্মৃতিপথে উদয় হইল। তিনি এখন পতিহীনা, কন্যাহীনা, তাঁহাদের আর রাজ্য নাই, দেশ এখন যবন-

হস্তে। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল, তিনি আর পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল ধারা বহিতে লাগিল। মৃত কন্যাকে বক্ষে লইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় একজন সৈনিক পুরুষ বলিল “মহিষি, কোলাহল বৃদ্ধি হইতেছে; আর বিলম্ব করিলে বিপদ সম্ভাবনা।” মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বসিলেন। গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করিয়া বেগে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, নয়নের জল মুছিয়া ফেলিলেন, নেত্রে আর বিন্দুমাত্রও বারি রহিল না, কেশরাশি খুলিয়া দিলেন, মহিষীর মূর্ত্তি উন্মাদিনীর মূর্ত্তি হইল। তিনি উন্মত্তার ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া হৃদয়ভেদী গম্ভীর স্বরে বলিলেন “কিসের বিপদ! আমার আর কি বিপদ হইবে? বিপদে আর আমাকে ভয় দেখাইতে পারে না। তোমাদের বিপদে ভয় হয় তোমরা যাও আমি যাইব না, আমি পলায়ন করিব না। ক্ষত্রিয় স্ত্রী, স্বামী পুত্র রাজ্য হীনা হইয়া পলায়ন করিতে জানে না। শিবিকারোহণের পরিবর্ত্তে এখন আমি চিতারোহণ করিব। যবনাধীন হইয়া তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় পলায়নে প্রাণরক্ষা কর, যাহার ইচ্ছা হয় ক্ষত্রিয়রক্ত কলঙ্কিত কর, কিন্তু আমার জীবন তোমাদের ন্যায় নহে। যেমন রাজমহিষী ছিলাম—মরিবার সময়ও তেমনি রাজমহিষীর মত মরিব, ক্ষত্রিয় স্ত্রীর ন্যায় মরিব, বীরবালার ন্যায় মরিব, যবনে আমাকে দেখিতেও পাইবে না।” এই বলিয়া মহিষী তখনি চিতা প্রস্তুত

করিতে আজ্ঞা দিলেন। লজ্জিত ও হতাশ হৃদয়ে সেনাগণ প্রস্থান করিল।

উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

যে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলেন, যে যুদ্ধে কল্যাণ প্রাণত্যাগ করিলেন সেই যুদ্ধের একটী আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আবশ্যক বোধে আমরা এই পরিচ্ছেদটি ঐ বিষয়েই উৎসর্গ করিতেছি। যবনদিগের সহিত হিন্দুদের সন্ধিস্থাপনের পর পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ যে রাত্রে উষাবতীকে দেখিতে গিয়াছিলেন সেই রাত্রে তিন প্রহরের সময় সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যবনেরা নিস্তব্ধে নির্ব্বিবাদে দৃশদ্বতী পার হইয়া আসিয়াছিল। উৎসবোন্মত্ত হিন্দু সেনারা যখন দেখিল যে যবনেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাহাদের শিবিরের এক প্রান্তে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছে, প্রান্তরস্থিত হিন্দু সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা আমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অসজ্জ অবস্থাতেই কেহ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল, কেহ যবন বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। সৈন্যদের আনন্দধ্বনি আর্ত্তনাদে পরিনত হইল, বাদ্যধ্বনি কামানধ্বনিতে ডুবিয়া গেল। সমরসিংহ বিপদ

দেখিয়াই সশস্ত্র অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় দুই হস্তে অসি চালনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার অশ্বও যেন বীর মদে মত্ত হইয়া তাঁহাকে যবনদিগের মধ্যেই আনিয়া ফেলিল। তাঁহার চতুস্পার্শ্বের কতকগুলি ক্ষত্রসেনা কেহ অস্ত্র লইয়া কেহ নিরস্ত্রই কেহ বর্ম্মাবৃত কেহবা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ক্রমে অল্প অল্প করিয়া সজ্জিত হইয়া সৈনিকেরা তাঁহাদের সাহায্যে আগমন করিতে লাগিল, মৃত ও আহত সৈন্যদের স্থান আবার নূতন সৈন্যে পূর্ণ হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজ ও কল্যাণ যবনআক্রমণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সৈনিকগণের মধ্যে আসিয়া পঁহুছিয়া ছিলেন। সমরসিংহ কিছুকাল যুদ্ধে যবনদিগকে নিরস্ত র‍া-খিতে রাখিতে তাঁহারা সেই শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণকে যথাসাধ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমরসিংহের সহিত রণেযোগ দিলেন। সমরসিংহ সম্মুখদিক হইতে যবনদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা দুই পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করি-লেন। এবং সমরসিংহের অধীনে আরো নূতন সেনা প্রেরণ করিলেন। কেবল চার হাজার অশ্বারোহী ও তিন হাজার পদাতিক সৈন্য সজ্জিত করিয়া লইয়া বিজয় যেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইসেন এই আজ্ঞা দিলেন। পৃথ্বীরাজ এই সকল সৈন্যগণকে সঞ্চিত রাখিলেন, ভাবিলেন যদি পরে নিতান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা সাহায্য পাইতে

পারিবেন। পৃথ্বীরাজ স্বয়ং রাজভেরী না বাজাইলে, বিজয় যেন সেই সৈন্যগণ লইয়া রণে প্রবৃত্ত না হন ইহা তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। ক্রমে আবার ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, অস্ত্রের ঝণঝণা, রণবাদ্য, ও সৈন্য-কোলাহলে শিবির কাঁপিতে লাগিল, রণক্ষেত্রে রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল। একবার জয় জয় মহারাজ, একবার আল্লা হো রব পরস্পরকে ছাড়াইয়া গগনমার্গে উঠিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর আবার এবারও যবনেরা পরাজিত হইল, এত ধূর্ত্ততা এবং কৌশলে ও জয়ী হইতে পারিল না। পরাস্ত হইয়া তাহারা ভীতমনে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। রণজয়ী হইয়া হিন্দুগণ আহ্লাদে মত্ত হইল। তাহারা কেবল জয়ী হুইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। যবনদিগের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত সেই পলায়নপর শত্রুদিগের অনুসরণ করিল। কল্যাণ উন্মত্তের ন্যায় সেই যবনরাশি ভেদ করিয়া মহম্মদঘোরির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার সৈন্যেরা কল্যাণের পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ উন্মত্ততা দেখিয়া বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহও সসৈন্যে তাঁহাদের সাহায্যার্থে গমন করিলেন। এইরূপে তুইদলেই ক্রমান্বয়ে দৌড়িতে লাগিল। ক্রমে হিন্দু সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মহম্মদঘোরি যখন দেখি-লেন কল্যাণের সেনা আগুয়ান হইয়া পৃথ্বীরাজ ও সমর-

সিংহের দলবলকে অনেক ছাড়াইয়া আসিয়াছে তখন তিনি সহসা সসৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কল্যাণ অমনি পূর্ণবেগে অশ্বচালাইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় অসি চালিত করিয়া বলিলেন "রে যবন, তোর বিশ্বাস ঘাতকতার দণ্ড গ্রহণ কর" বলিয়া মহম্মদঘোরির বক্ষে তরবারি আঘাত করিবার মানসে প্রচণ্ড বেগে অস্ত্র চালিত করিলেন, কিন্তু মহম্মদঘোরি তীরবৎ পশ্চাৎ সরিয়া যাওয়াতে তাহার অগ্রভাগমাত্র তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিল, তাহাতেই সেই অস্ত্রের প্রাণনাশী তীক্ষ্ণতা অনুভব করিয়া তিনিও তীব্র দৃষ্টিতে কল্যাণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গোত্তোলন করিলেন, কিন্তু কল্যাণের ঢালে পড়িয়া তাহা তখনি চূর্ণ হইয়া গেল, মহম্মদঘোরি অমনি আবার নিমেষ মধ্যে কটিস্থ অসি খুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহা খুলিয়া লইবার আবশ্যক ছিল না, কেন না তাহার অনতিপূর্ব্বেই একজন সৈনিক পশ্চাৎদিক হইতে কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া একটি শর সন্ধান করিয়াছিল। সেই শর কল্যাণের মস্তিষ্ক দিয়া ললাট ভেদ করিয়া আটকিয়া রহিল, কল্যাণ তাহা চকিতের ন্যায় টানিয়া লইতে লইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন বিজয়সিংহ শরাসনে আর একটি শরসন্ধান করিয়া বিকট হাস্য হাসিতেছেন। কল্যাণ তাহা দেখিতে দেখিতে মস্তকস্থিত শর তুলিয়া বেগে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা এক যবন সেনার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

কল্যাণ বিজয়ের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অনেকক্ষণ দেখিতে হইল না, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং "রে পাপীষ্ঠ, উষাবতীকে বধ করিয়াও তোর রক্ত পিপাসা মিটিল না" বলিতে বলিতে মৃতপ্রায় হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। মহম্মদঘোরির উত্তোলিত খড়্গে কল্যাণের অশ্ব ছিন্ন মস্তক হইয়া তাহার আরোহীর সঙ্গেই পড়িল, উভয়েই ক্ষণকালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। এমন সময় সসৈন্যে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা যেন সহস্রগুণ বলবান হইয়া যবনসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সহসা মহম্মদঘোরির সেই লুক্কায়িত সৈন্যভাগের মধ্য হইতে, ৫০০০ অশ্বারোহী, এবং ৪০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য আসিয়া সেই বিশৃঙ্খল শ্রান্ত ক্লান্ত হিন্দুসেনাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন পৃথ্বীরাজ বিজয়কে সেই অবশিষ্ট সৈন্যভাগ আনিবার জন্য কটীস্থ ভেরী বাজাইয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিজয় আসিলেন না। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহ প্রভৃতি সকলে প্রতিক্ষণে বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন বিজয় আসিলেন না। বিজয় আসাপর্য্যন্ত কিছু-কাল জন্যও যদি যবনদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন এই চেষ্টায় তাঁহারা সেই রণশ্রান্ত ভগ্নাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুল যবনসেনার অগ্রসরে বাধা দিতে যত্ন-বান হইলেন। কিন্তু সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল, তথাপি বিজয় আসিলেন না। তবুও নূতন সৈন্য আসিতেছে

এই আশ্বাস দান করিয়া ও হিন্দুবীর্য্য স্মরণ করাইয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সৈন্যদিগকে সমরোৎসাহী করিতে লাগিলেন ও এক এক বার বিজয় সসৈন্যে আসিতেছেন কি না দেখিতে লাগিলেন। এই সময় দূর হইতে সৈন্য সমূহকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। বিজয় সৈন্য লইয়া আসি-তেছেন এই আশায় তাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিজয়কে পশ্চাৎ রাখিয়াছিলেন কিন্তু সম্মুখ দিয়া আসিতে দেখিয়া পৃথ্বীরাজ ভাবিলেন, কোন কারণে এই দিক দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইল বলিয়া বিজয়ের আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। নূতন সৈন্য দেখিয়া পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ আবার বলপ্রাপ্ত হইল। তাহারা 'জয় জয় মহারাজ' বলিতে বলিতে দ্বিগুণ বেগে দ্বিগুণ রোষে সেই প্রভূত যবন সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই সৈন্যগণ নিকটে আগমন করিল। অমনি রাজপুত সেনাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পড়িল—হায়! এ বিজয়ের সৈন্য নহে। আবার নূতন ৫০০০ যবন অশ্বারোহী ও ৬০০০ যবন পদাতিক সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

এই সময় পৃথ্বীরাজ পরাজিত সৈন্যগণের সহিত বিজয়কেও পলায়ন করিতে দেখিলেন। তিনি বুঝিলেন বিজয় তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপন অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহারাও অন্য সৈন্যগণের ন্যায় শ্রান্ত হইয়া যুদ্ধে অপারগ হইয়া পড়িয়াছে।

সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজ আর উপায় দেখিলেন না। নিরাশ হইয়াও যতক্ষণ সৈন্যগণকে সমরোৎসাহী রাখিতে পারেন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার নূতন সেনাদল আনিয়া তাহাদের আক্রমণ করায় সেই ভগ্নাবশিষ্ট নিতান্ত পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ তাহাদের সহিত আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। অধিকাংশ হত ও আহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট ভাগ এখন হতাশ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। এখন আর সেনাপতিগণের সমরোৎসাহ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিল না। কেবল প্রভুভক্ত অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রভুদিগের সহিত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত রহিল। শেষে আহতসিংহপরাক্রমে সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজ তাঁহাদের বিশ্বস্ত কতিপয় সেনা লইয়াই উন্মত্তের ন্যায় সেই শত সহস্র যবন নিধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তুমুল সংগ্রাম—খড়্গে খড়্গে, বর্ষায় বর্ষায়, অসিতে অসিতে, তীরে তীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়া তুলিলেন। দুই হস্তে অসি চালাইতে চালাইতে, সমরসিংহ একবার পশ্চাতে, একবার সম্মুখে আসিয়া সৈন্য সংহার আরম্ভ করিলেন। পৃথ্বীরাজও সমরসিংহের ন্যায় প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; একাকীই অনেক যবন সৈন্য ধ্বংশ করিলেন বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে জয়ী হইবার কতদূর সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য। যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে ভূমিশায়ী হইল, এবং তিনিও সর্ব্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া

অশ্ব হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজ সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই যবনকরে বন্দী হইলেন। দেবী আশাপূর্ণা যবনদিগেরই আশা পূর্ণ করিলেন! পৃথ্বীরাজকে যেন কোন সৈনিকেরা হত্যা না করে মহম্মদঘোরি যুদ্ধক্ষেত্রে এই আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পৃথ্বীরাজকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া সমরসিংহের জয়ের আশা লুপ্ত হইল কিন্তু তথাপি তিনি শেষ পর্য্যন্ত যবনদিগের গতিরোধ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই রূপেই চলিল। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি এরূপ অটল ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যে যবনদিগের হৃদয়ে ত্রাস জন্মিতে লাগিল। এক দণ্ড গেল, দুই দণ্ড গেল, সমরসিংহের অল্প সৈন্য অল্পতর হইয়া আসিল তথাপি তিনি সেইরূপ অটলই রহিলেন। সাহস করিয়া যাহারা তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, তিনি সেই অল্প সেনা লইয়াই তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে লাগিলেন। সমরসিংহের বীরভাবে ভীত হইয়া ক্রমে যবনেরা তাঁহার নিকট আসিতে ভীত হইতে লাগিল। যখন মহম্মদঘোরি দেখিলেন তাঁহার আজ্ঞায় আর সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে না তখন তাহাদের সাহসী করিতে স্বয়ং তিনি আগুয়ান হইয়া সমরসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার সৈন্যগণও সাহস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিল। যখন সমরসিংহের সকল সৈন্যই প্রায় বিনষ্ট হইল তখন মহম্মদ-

ঘোরি সমরসিংহকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্ত-চালিত তরবারির সম্মুখে আসিতে সাহসী না হইয়া পশ্চাৎ হইতে আসিয়া সমরসিংহের অশ্বের এক পদ ছেদন করিয়া দিলেন। অশ্ব পড়িতে না পড়িতে সমরসিংহ ভূমে লম্ফ প্রদান করিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার অঙ্গে অস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিল. তিনি দুই হস্ত পরিচালিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সমরসিংহকে বিপন্ন দেখিয়া মহম্মদঘোরি এবার তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গোত্তোলন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কেবল সমরসিংহের ঘূর্ণ্যমান দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়াই প্রভুত যবনসেনা নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। কেহ হস্তে কেহ পৃষ্ঠে কেহ বক্ষে কেহ মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। সমরসিংহ আর পারিলেন না, অস্ত্র চালাইতে চালাইতে ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যবনেরা জয়ী হইল। চির প্রজ্বলিত দীপ এইবার নির্ব্বাণ হইল, আর্য্যগৌরবসূর্য্য আজ অস্তমিত হইল, ধর্ম্ম আজ অধর্ম্মের নিকট পরাস্ত হইলেন; ভারতবর্ষ আজ বিষাদআঁধারে আবৃত হইল, কেবল যবনদিগের বিজয়পতাকা রূপ জলন্ত ধূমকেতু মস্তকোপরে জাজ্বল্যমান রহিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখনো দিবা অবসান হয় নাই। অনেকক্ষণ হইতে নভোমণ্ডল অল্প অল্প মেঘে আবরিত রহিয়াছে। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যদেব সেই তরল মেঘমালার মধ্যে লুকাইয়া আপন নিস্তেজ আলোক প্রকাশ করিতেছেন। মেঘাবরিত ম্লানালোকে চতুর্দ্দিকের অন্ধকারভাব যেন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। ওদিকে ঐ দূরবর্ত্তী ভীষণ রণক্ষেত্রের ভীষণভাব ভীষণতর হইয়াছে, এদিকে এই নিভৃত নির্জ্জন ক্ষেত্রপ্রান্তস্থিত সজ্জিত চিতা মানবহৃদয় ঔদাস্যে অভিভূত করিয়া দিতেছে। মহিষী আজ কন্যার সহিত এই চিতায় আরোহণ করিবেন। মহিষী আজ দেবলোকে স্বামীসন্দর্শনে গমন করিবেন। কিন্তু মহিষীর মুখে একটিও কথা নাই, তিনি আপন মনে প্রাণের উষাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সচল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় চিতাভিমুখে আগমন করিলেন। পরিচারিকারাও স্তম্ভিতভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। পরে তিনি কন্যাকে সেই চিতায় শয়ান করাইয়া তাঁহাকে চন্দন মাল্যে ভূষিত করিয়া আপনিও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিলেন, এবং সেই চিতাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চিতায় আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একদল ক্ষত্রিয় অশ্বারোহী সৈন্য সেইখানে আসিয়া

উপনীত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ মহিষীকে প্রণাম করিয়া কি বলিবার আশয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের আগমনে মহিষী আবার দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "বলদেবসিংহ! তোমার কি বলিবার আছে বল, বলিতে আজ্ঞা দিতেছি।"

বল। "দেবি! দিল্লীশ্বর আমাকে আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন।"

মহি। "দিল্লীশ্বর!—তিনি তো রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

বল। "না দেবি! তিনি আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে সকলেই তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তিনি—"

মহি। "বাস্তবিক তিনি কি—?—বল, তোমাদের মহিষী আজ্ঞা করিতেছেন—বল।"

বল। "বাস্তবিক তিনি যবন করে—ব—ন্দী—হইয়াছেন"। বন্দী শুনিয়া মহিষী চমকিত হইলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে যে কি কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি শুনিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সৈনিকদিগের প্রতি একটী ঘৃণাব্যঞ্জক ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া, পরিচারিকাদের পানে রোষকম্পিত মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন "পরিচারিকাগণ! এই ক্ষত্রিয়সৈনিকেরা, এই ক্ষত্রিয় বীরপুরুষেরা সমরক্ষেত্র ত্যাগ

করিয়া মহারাজ বন্দী হইয়াছেন এই সুসংবাদটি দিতে এত-দূর কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। থাকুক, ইহারা এই খানেই থাকুক, অথবা স্ত্রীপুত্র কন্যাদিগের মুখ দেখিতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুক, কিন্তু মহারাজ দিল্লীর সম্রাট, আমি প্রজা হইয়া কখনই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিব না, মহারাজ আমার স্বামী, আমি পত্নী হইয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিব না। ইহারা কখনই ক্ষত্রিয় জননীর স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত নহে, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, আমি ক্ষত্রিয়পত্নী, আমি নিঃসহায়ই আজ তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আনিব।” এই বলিয়াই যে সৈনিক পুরুষ মহিষীকে সংবাদ দিবার জন্য অশ্ব হইতে অব-তরণ করিয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে কৃপাণ টানিয়া লইয়া ও তাহার অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই পট্টবস্ত্র পরিধানা, রক্তচন্দনচর্চ্চিতা, নিবিড় স্খলিতকুন্তলজালশোভিতা, বীরপত্নী অভিমানে গম্ভীর হইয়া, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া, ও বীরতেজে উন্মত্তের ন্যায় সমরক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা এতক্ষণ লজ্জায় ও অনুতাপে মৃতপ্রায় হইয়া মনে মনে বলিতেছিল “মহারাজকে মুক্ত করিবার জন্য যতক্ষণ আমাদের একজনের প্রাণ থাকিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করি-তাম, কিন্তু কি করিব, মহারাজ আমাদের যুদ্ধে নিবৃত্ত করিয়া অত্যাচারী যবনকর হইতে মহিষী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে অন্ততঃ চিতারোহণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।” পরে মহিষীকে অশ্বপৃষ্ঠে

অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারাও আবার যেন তাড়িত-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং সকলে ভারতের জয়-ধ্বনি করিতে করিতে রাণীর অনুগমন করিল। পরিচারিকা-গণ চিতার সন্নিকটে উষাবতীকে লইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মহিষী যখন যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন তখন যবনেরা তাহা-দের একমাত্র অবশিষ্ট অদম্য ও অটল শত্রু বীরশ্রেষ্ঠ সমর সিংহকে বহুকষ্টে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শিবির লুণ্ঠনে আসিতেছিল। পথে তাহারা সেই উগ্রমূর্ত্তি, সেই সংহারমূর্ত্তি বীরাঙ্গণাকে কৃপাণ হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রথমে চমকিত হইল; পরে যখন ক্ষত্রিয় সেনাদল তাহাদের গতিরোধ করিতে তরবারি আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন তাহাদের চমক ভঙ্গ হইল। জলধারার ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে তীর, বর্শা, আসিয়া বেগে ক্ষত্রিয় সেনাদিগের উপর পড়িতে লাগিল, ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ দুর্ভেদ্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যবনগণ উন্মত্ত তরঙ্গের ন্যায় যতই আক্র-মণ করিতে লাগিল, ক্ষত্রিয়েরাও সমুদ্রতীরের শৈলশ্রেণীর ন্যায় অটল ভাবে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে দূরে প্রক্ষেপণ করিতে লাগিল। কিন্তু মহিষী ব্যূহ মধ্যে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, আপন সৈন্যদিগকে সরাইয়া, কৃপাণহস্তে যবনসৈন্যের সম্মুখে আসিতে চেষ্টা করিলেন,

সেই চেষ্টায় তাঁহার সম্মুখীন সেনাদল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, অমনি তাহার মধ্য দিয়া একটি বর্শা আসিয়া রাণীর বক্ষে বিদ্ধ হইল, তিনি অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। পাছে তাঁহার দেহ যবনে স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় এক জন সৈনিক তাঁহাকে আপন অশ্বে উঠাইয়া লইয়া অশ্ব বেগে ছুটাইয়া দিল। যবনেরা তাহার নিকট হইতে বলদ্বারা মহিষীকে লইতে গেল, তাহা নিবারণ করিতে রাজ্ঞীর সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক জন সৈনিক দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া দিল। যবনেরা তাহাদের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে না করিতে রাজ্ঞীর অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বাঁচিবার আশা কিম্বা ইচ্ছা আর তাহাদের কাহারো রহিল না। সেই অল্প সংখ্যক ক্ষত্রিয় সেনাদের পরাজয় করিতে অনেক সময় লাগিল এবং অনেক যবন সৈন্য ধরাশায়ী হইল।

সৈনিকেরা রাজ্ঞীর মৃতদেহ লইয়া যখন চিতার নিকট উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে। উষাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া চিতা প্রশান্ত ভাবে যেন রাজ্ঞীর অপেক্ষা করিতেছে। সৈনিকেরা সেই চিতায় উষাবতীর নিকট রাণীকে শয়ান করাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল, চিতা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সৈনিকেরা আরো আহুতি প্রদান করিতে লাগিল, রাশি রাশি চন্দন কাষ্ঠে অনল বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ক্রমে অগ্নিশিখা গগন-

স্পর্শ করিল, পরিচারিকাগণও সকলে চিতারোহণ করিল, অগ্নি আরো আস্ফালন করিয়া উঠিল, পতিব্রতার আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া সেই চিতা জ্বলিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে অনল উচ্ছ্বাস আরক্তিম হইয়া আসিল, অবশেষে চতুর্দ্দিক আঁধার করিয়া সেই প্রদীপ্ত আলোকস্তম্ভ অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থীর চন্দ্রমাও অস্তমিত হইলেন, ভারতের দীপও নির্ব্বাণ হইল।

চারিদিক অন্ধকারময়—চারিদিক শূন্যময়—স্থানেশ্বর অদ্য শ্মশানময়—কেবল মধ্যে মধ্যে যবনদিগের আহ্লাদ কোলাহল, হিন্দুদিগের আর্ত্তনাদ, আহতদিগের কাতরধ্বনি, ও শিবার অশিব চীৎকার দিগ্‌দিগন্ত হইতে উত্থিত হইয়া গগণমার্গ বিদারণ করিতে লাগিল।

সেই অবধি সেই সঙ্কীর্ণ শ্মশানক্ষেত্র ক্রমে বর্দ্ধিতকায় হইয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতেই সেই শিবার অশিব চীৎকার, সেই আহতদিগের আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দীপশূন্য ভারতের চতুর্দ্দিকই ক্রমে নিশার ঘোর অন্ধকারে আবরিত হইয়া আসিল। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে কোথাও বা দূরপ্রান্তে দুই একটী প্রজ্জ্বলিত চিতানলে পাষাণ হৃদয়কেও সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে,

কোথাও বা অবিশ্বাস্য আলেয়ার আলোকে নেত্র ঝলসিত করিতেছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমরসিংহ হত, পৃথ্বীরাজ বন্দী, রণজয়ী মহম্মদঘোরির আজ কি সুখের দিন, তাঁহার আজ শ্রান্তি নাই, তাঁহার আজ বিশ্রাম নাই। যুদ্ধ জয়ের পর বিশ্রাম না করিয়া তিনি এখন অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, চতুর্দ্দিকের তত্বাবধারণ করিতেছেন। সৈন্যগণকে যুদ্ধের পুরস্কার স্বরূপ হিন্দুশিবির লুণ্ঠনে আজ্ঞা দিতেছেন, আহত শ্রান্ত সৈন্যগণকে আবার বিশ্রাম আজ্ঞা দিতেছেন, হিন্দু বন্দীগণ কে কোথায় আছে দেখিয়া তাহাদের নিকট উত্তমরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিতেছেন, কোন হিন্দুবন্দীর বা আশু বধের আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন। এই প্রকারে চতুর্দ্দিকের বন্দোবস্ত করিতেই তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন, এমন সময় দুই তিনজন যবনসেনা আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল "জাঁহাপনা! আমরা শিবির লুণ্ঠনে যাইতেছিলাম, পথে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া হিন্দুবেগম উন্মত্তাবেশে আমাদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ বন্দী শুনিয়া তিনি উদ্ধার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে এই বধ করিয়া আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া মহম্মদঘোরি বিস্মিতের ন্যায় মুহূর্ত্ত কাল

নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, পরে কি ভাবিয়া আবার বলিলেন "তোমরা আমার সেনাপতি ও প্রধান সভাসদদিগকে এই খানে লইয়া আইস, শীঘ্র যাও, আমি এই বটবৃক্ষতলে অপেক্ষা করি।" একজন সৈনিক বলিল "প্রধান সেনাপতি তো যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

মহ। "অদ্য কুতবউদ্দিনকে নূতন সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা গিয়াছে। তাহাকেই সংবাদ দাও।" এই কথায় সৈনিকেরা চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেনাপতি ও সভাসদগণ এই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহম্মদঘোরি সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কুতব! শুনিয়াছ পৃথ্বীরাজ বন্দী শুনিয়া হিন্দুবেগম তাঁহার উদ্ধারার্থে আসিয়াছিলেন।"

সেনাপতি বলিল "কিন্তু যেমন স্পর্দ্ধা তার তো তেমনি প্রতিফল হইয়াছে?"

মহ। "তাহা যেন হইল, কিন্তু ইহাতে কি তোমাদের বোধ হয় না, যে পৃথ্বীরাজ যতক্ষণ বন্দী থাকিবেন ততক্ষণ আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। পারুক বা নাই পারুক, তাঁহার উদ্ধার জন্য হিন্দুরা আবার যুদ্ধ করিতে আসিবে?"

সেনা। "হিন্দুরা যেরূপ পরাজিত হইয়াছে, তাহাদের আর যুদ্ধের শক্তি থাকিলে তো?"

মহ। "তবে তোমরা এখনো তাহাদের চেন নাই। তাহারা যেরূপ রাজভক্ত, রাজা বন্দী শুনিলে দেশীয় যে লোকেরা কখনো অস্ত্র ধারণ করে নাই, কখনো অস্ত্র ধরিতে

ও জানে না, তাঁহারা পর্য্যন্ত একবার অস্ত্র ধরিতে চেষ্টা করিবে। তাহার সাক্ষী—স্ত্রীলোকেও তাঁহার জন্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল।"

সেনা। "কিন্তু যদিও আসে তাহা হইলেই বা কি? এখন পৃথ্বীরাজ নাই, সমরসিংহ নাই, সেই সিংহশাবক কল্যাণও নাই, এখন কাহাকে ভয়? দেশীয় লোককে? যাহারা জন্মে কখনো অস্ত্র ধরে নাই?"

মহ। "না, না, আমি ভয়ের কথা বলিতেছি না, এখন তো আমরা নিঃসন্দেহ সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্রব দমন করিতে পারিব। কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলেই আবার সৈন্য ক্ষয় হইবে, নানা দিকে ক্ষতি হইবে। নিষ্কণ্টকে যদি আমরা জয়ের ফলভোগ করিতে পারি, তবে অনর্থক কেন যুদ্ধ করিব। পৃথ্বীরাজকে বধ করিলেই এখন আমরা কণ্টকশূন্য হই, তাহা হইলে আর কাহার উদ্ধারের জন্য হিন্দুরা প্রাণ দিতে আসিবে? বধ করিলে কি ক্ষতি বৃদ্ধি সকলে মিলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক এখনি ইহার যাহা হয় স্থির করিতে হইবে।"

সেই বটবৃক্ষ তলায় অশ্বপৃষ্ঠে এইরূপ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ চলিতে লাগিল। একজন সৈনিক পুরুষ বলিল "কিন্তু পৃথ্বীরাজকে বধ করা অপেক্ষা যুদ্ধ জয়ের চিহ্নস্বরূপ দেশে লইয়া গেলে আমাদের আরো গৌরব বৃদ্ধি হয়।"

মহ। "না, না, যে সকল কারণ বলিলাম সেই সকল কারণে পৃথ্বীরাজকে ততদিন বন্দী রাখা আমাদের ভিলিসিদ্ধ

হে।" আর একজন সৈনিকপুরুষ বলিল "কিন্তু পৃথ্বীরাজকে
ীবিত রাখিলে তদ্দ্বারা যদি আমরা আর এক উপকার পাই
াহা হইলে তাঁহাকে জীবিত রাখা উচিত, কেননা আমরা
।খন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করিতে যাইব,
।থ্বীরাজ ঐ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য
দিদ্ধি হইবে। আর তিনি যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত
ন, তাহা হইলে আমাদের অধীনে একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব দিয়া
াঁহাকে জীবিত রাখা যাউক। এ কার্য্য সিদ্ধি হইলে প্রয়ো-
নন মত সন্ধি ভঙ্গ করা আমাদেরই ত ইচ্ছাধীন। এইরূপ
।ন্ধি হইয়া গেলে আর কোন উপদ্রবের ভয় নাই।" সকলেই
সই কথার অনুমোদন করিল। মহম্মদঘোরি বলিলেন "এ
ারামর্শ মন্দ নহে। কিন্তু সন্ধিই করি আর বধই করি, এখনি
াকল স্থির করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি পৃথ্বীরাজকে
এইখানে আনিতে আদেশ করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা
ৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথ্বীরাজকে সেই খানে আনয়ন করিল। পৃথ্বী-
রাজের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু শারীরিক কষ্টে তাঁহার
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃষ্টিতে অবনতির ভাব বা সঙ্কুচিত
ভাব কিছুমাত্র নাই। বরং বীর মূর্ত্তি অধিকতর উগ্রতর
হইয়াছে, অধিকতর তেজস্বিন হইয়াছে। পৃথ্বীরাজ এখানে
আসিয়া একটিও কথা কহিলেন না, কথা কহিতেও তাঁহার
অপমান বোধ হইতে লাগিল। তিনি তাচ্ছিল্যভাবব্যঞ্জক
অথচ রোষগম্ভীর আরক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বন্দীর

এইরূপ ভাব দেখিয়া মহম্মদঘোরি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার দৃষ্টি পানে চাহিয়া অজ্ঞাত ভাবে আপনা আপনি যেন কিছু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে আর কঠোর বাক্য নির্গত হইল না। তিনি নম্রভাবে বলিলেন "মহারাজ, আপনি আর বার আমাদের উপকার করিয়াছিলেন, এবার দেখিবেন যবনে তাহা ভোলে নাই, আমি ও আপনার প্রত্যুপকার করিব।" এই কথায় পৃথ্বীরাজ কি উত্তর দেন শুনিতে ইচ্ছা করিয়া মহম্মদঘোরি নিস্তব্ধ হইলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজ কিছুই উত্তর করিলেন না। অনুগ্রহের কথা শুনিয়া অপমানে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, কেশ পর্য্যন্তও যেন শিহরিয়া উঠিল। যবনে অনুগ্রহের কথা বলিবে ইহাও তাঁহায় শুনিতে হইল! বিধাতা যুদ্ধেও তাঁহার মৃত্যু লেখেন নাই! পৃথ্বীরাজ অতি কষ্টে চিত্ত সংযত করিলেন। কাহারো পানে না চাহিয়া নিম্নদৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মহম্মদঘোরি আবার বলিলেন "আমি আপনাকে প্রাণ দান করিব, আমাদের অধীনে রাজ্য প্রদান করিব"—অধীনে রাজ্য প্রদান করিব! পৃথ্বীরাজের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। মহম্মদঘোরি মনে করিলেন জীবনদান শুনিয়া বুঝি সহসা পৃথ্বীরাজ আরো সতেজ হইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন "কিন্তু আমি যে আপনার এত উপকার করিব, আপনারও সেই সঙ্গে আমার

কটি উপকার করিতে হইবে। আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য
াদেশ জয় করিতে যাইব, আপনাকে সাহায্য করিতে
ইবে।" পৃথ্বীরাজ আর থাকিতে পারিলেন না, আর
াপন সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিলেন না, কথা না কহিয়া
াার থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে আত্ম বিস্মৃত হইয়া
বভ্যাসগুণে কটীস্থ তরবারিতে হস্ত দিবার চেষ্টা করিলেন,
কিন্তু চেষ্টা নিস্ফল হইল, শৃঙ্খলের ঝন ঝন শব্দ হইল, হস্তে
াধা প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ হইল,
দখিলেন তিনি বন্দী, দিল্লির সম্রাট মহারাজাধিরাজ পৃথ্বী-
াজ আজ যবনকরে বন্দী। তখন তিনি রজ্জুবদ্ধ ক্রুদ্ধ
সিংহের ন্যায়, রুদ্ধ দাবানলের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ
করিয়া রোষকম্পিত বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যবন!
়রাত্মন! বন্দী বলিয়া আমার নিকট ঐরূপ জঘন্য প্রস্তাব
করিতেও সাহস হইল। আমি যবন অধীনে রাজ্য ভোগ
করিব!—আমি স্বদেশ দিয়া—" ক্রোধে পৃথ্বীরাজের বাক্য
রোধ হইয়া গেল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। সেই
গর্ব্বিত বাক্যে মহম্মদঘোরিও ক্রুদ্ধ হইলেন। আপনা
হইতেই হৃদয়ের যথার্থ ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল, মিষ্ট
কথায় আর তাহা ঢাকিতে পারিলেন না। কর্কশ কঠোর
স্বরে বলিলেন,"হাঁ যবনদিগের সহিত সন্ধি দিল্লীশ্বরের এখন
অপমান! তবে যবন করে মৃত্যুই এখন হিন্দু রাজার পক্ষে
সম্মানজনক বোধ হয়?"

পৃথ্বী। "যবন করে?—পিশাচ করে মৃত্যুও এখন আমার পক্ষে সম্মানজনক। কিন্তু আর না—তোর উপহাস বাক্যে আর আমি উত্তর করিব না। দুরাত্মন! যবনের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কলঙ্ক।" বলিয়া পৃথ্বীরাজ মৌন হইয়া রহিলেন। বন্দীর গর্ব্বিতভাব মহম্মদঘোরি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে ইঙ্গিত করিলেন, প্রহরীগণ পৃথ্বীরাজের হস্তধারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অন্তরে লইয়া গেল, তাঁহাকে অবনত মস্তকে বসিতে আজ্ঞা করিল, সৈনিকেরা চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল, মহম্মদঘোরি আবার ইঙ্গিত করিলেন, ঘাতক আদেশানুসারে কুঠার দ্বারা প্রথমে একে একে পৃথ্বীরাজের সকল অঙ্গ ছেদন করিতে লাগিল, হর্ষনিস্পন্দ লোচনে মহম্মদঘোরি তাহা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এত যাতনাতেও পৃথ্বীরাজ একটিও কথা কহিলেন না, একবারও কাতরোক্তি করিলেন না। মহম্মদঘোরি আবার ইঙ্গিত করিলেন, ঘাতক হস্তোত্তোলন করিয়া পৃথ্বীরাজের গলদেশে কুঠারাঘাত করিল, রক্তোচ্ছ্বাসিত মস্তক ভূমিতে পড়িল, আর্য্যকুল গৌরব দিল্লীশ্বরের মস্তক আজ যবন হস্তে ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল—বাসুকি সহস্র মস্তকে ব্যথিত হইল—আসমুদ্র ভারতবর্ষ কাঁপিয়া উঠিল—স্বাধীনতা অনন্ত মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইল—দীপ নির্ব্বাণ হইল।

উপসংহার।

দীপ তো নির্ব্বাণ হইল, এক্ষণে কিরণসিংহ, কবিচন্দ্র, শৈলবালা ও প্রভাবতীর কি হইল, তাহা কিছু বলিয়া এই উপন্যাসের উপসংহার করি। কবিচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নানা কারণ বশতঃ সময়কালে দিল্লি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। প্রথম কারণ—কবিচন্দ্রকে অনুসন্ধান করিতে যবনদিগের প্রথমে দিল্লি অভিমুখে যাওয়া সম্ভব বোধে তিনি সেই রাত্রে পলায়নের পর অগ্রে দিল্লির দিকে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই, সেই হেতু অপর দিকে গিয়া একরাত্র মধ্যেই দিল্লি হইতে আরো অধিক দূরে গিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় কারণ—সেখান হইতে দিল্লি আগমনের সুবিধামত উত্তম পথ না থাকায়, সেই সঙ্কটাকীর্ণ দুর্গম পথ দিয়া আসিবার সময় পথভ্রম ইত্যাদি নানা অসুবিধা ঘটিল। সুতরাং এইরূপ সামান্য সামান্য নানা কারণে যবনেরা স্থানেশ্বর আসিবার তিন চারি দিন পরে, তিনি দিল্লি আসিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে আসিয়া শুনিলেন, মহম্মদ-ঘোরি জয়ী হইয়া পৃথ্বীরাজকে বধ করিয়াছেন এবং দিল্লিতে রাজত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্থানেশ্বর হইতে দিল্লি আসিতেছেন। কবিচন্দ্র সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া কতদূর ব্যথিত

হইলেন বলা বাহুল্যমাত্র। পরে তিনি গোলাপের সঙ্গে দেখা করিলেন, গোলাপকে উন্মত্তাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার শোকসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল, কিন্তু কি করেন— ভগ্নহৃদয়ে উন্মত্তা গোলাপকে সঙ্গে লইয়া চিতোর যাত্রা করিলেন। গোলাপ উন্মত্ত হইয়াছিল বলিয়া মহিষী তাহাকে সঙ্গে করিয়া স্থানেশ্বর লইয়া যান নাই, দিল্লিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্র নিজে যতই ব্যথিত হউন না কেন, তিনি চিতোরে আসিয়া প্রথমেই একটি বিশেষ কার্য্য করিতে তৎপর হইলেন—যদি যবনে চিতোর-আক্রমণ করিতে আইসে তাহা ব্যর্থ করিবার আশয়ে তিনি চিতোরনগরীকে উত্তমরূপে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। সে কার্য্য সমাধা হইলে কিছুদিন পরে শৈলবালা ও কিরণসিংহের বিবাহ দিয়া প্রভাবতী ও গোলাপকে লইয়া জন্মভূমি আজমীরের একটী নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে আসিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে সেই থানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে পৃথ্বীরাজের পরাক্রম, রূপ, ও মহিমা বর্ণন, এবং রচনা ও কাব্যচ্ছলে রাজপুত ইতিহাস বর্ণনা করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হইল। গোলাপ আজমীরে আসিয়া অল্পদিন পরেই পরলোক গমন করিল।

উপসংহারকালে বিজয়ের জীবনের উপসংহার ভাগও বর্ণনা করা আবশ্যক। যুদ্ধজয়ের পর যখন মহম্মদঘোরি সৈনিকদের পুরস্কার দিবার জন্য সভা করিয়া বসিলেন, তখন

বিজয় সর্ব্বাগ্রেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া মহম্মদ-ঘোরির নিকট দিল্লির সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ-ঘোরি উগ্রস্বরে বলিলেন "স্বদেশের প্রতি যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে পারে, তাহাকে সিংহাসন দান না করিয়া যে জীবন দান করিয়াছি এই তাহার যথেষ্ট পুর-স্কার।" এই কথা বলিতে সভাসদগণ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল, বিজয় স্তম্ভিত হইলেন, পুরস্কার শ্রবণে বিজয় বজ্রা-হত হইলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে সকল আশাই বিলুপ্ত হইল, তিনি বুঝিলেন কোন কুকর্ম্ম করিলে যাহার জন্ত তাহা করা যায় তাহার নিকটেও হেয় হইতে হয়, আপনার কার্য্য সিদ্ধি হইলে তাহাদের দ্বারা আর প্রত্যুপকার পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যবনহৃদয়ে দয়া নাই, তাহাদের কথায় তিনি কেন ভুলিলেন? তখন কি হিংসা ও লোভপরবশ হইয়া যবনস্বভাবকেও চিনিতে পারেন নাই? স্বদেশকে কি যবনদিগকে দিবার নিমিত্তই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া-ছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন তিনি সকল দোষেই দোষী। তিনি লোভপরবশ হইয়া স্বদেশের গৌরব নষ্ট করিলেন, তিনি হিংসাপরবশ হইয়া কল্যাণ ও রাজকন্যার ইহলোকের সুখ হরণ করি-লেন, তিনি স্বার্থপরবশ হইয়া নির্দ্দোষী গোলাপকে দোষী করিলেন। তিনিই কল্যাণের হত্যাকারী। তাঁহা হইতে কি পাপ না হইয়াছে? তাঁহার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত

নাই। বিজয় আপনার ন্যায় পাপী আর কাহাকেও দেখিলেন না। তিনি জীবিত অবস্থাতেই নরকভোগ করিতে লাগিলেন, তখন সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে মৃত্যুই একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে প্রথম মনোবেগ যখন কিছু হ্রাস হইল তখন তাঁহার চিন্তা-শ্রেণী ভিন্নভাব ধারণ করিল, মহম্মদঘোরির অন্যায়াচরণ মনে করিয়া ক্রোধে অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি অতি ক্রুদ্ধ-ভাবে মহম্মদঘোরিকে বলিলেন "যবন! আমি অতি মূর্খ!—তাই নরাধম—তাই পাষণ্ড—তাই কৃতঘ্ন যবনকে বিশ্বাস করিয়া আমার দেশের আমি বৈরিতা সাধন করিয়াছি। পাষণ্ড! আমি ইহার প্রতিশোধ তুলিবই তুলিব, এবং ইহার প্রতিশোধ তুলিয়াই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এই বলিয়া বিজয়সিংহ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। বিজয়ের বাক্য শ্রবণে মহম্মদঘোরিও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। এই স্থলে বলা উচিত—বিজয়ের পিতা বৃদ্ধ মন্ত্রী রণক্ষেত্রে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহার এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে আর বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

OPINION OF THE PRESS.

দীপ-নির্ব্বাণ।

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

CALCUTTA REVIEW.

"দীপ-নির্ব্বাণ নামে এথকানি অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা, এরূপ রচনা, এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণী।

বসন্তোৎসব।

Basanta Utsab * * * has here and there passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt it will make its way to every lover of Bengali literature. The songs in pp, 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic,and have an exquisitely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of which is so throughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, revolutionize the exsisting style of opera-writing in Bengali by giving it a healthy tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a "bubble of visionary happiness" unruffled by the tempests blowing without. We cordially recommend it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excellent production. We shall be glad to see it in the hands of every reader of Bengali literature.

We hear the author is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. It is customary

to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers. We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it, in the present case *Basanta Utsab* can stand upon its own merits.

INDIAN MIRROR.

This charming little work is, we understand, the production of a Bengali lady, otherwise known as the authoress of *Dip Nirban*. It has an immense interest for us. Written by a lady belonging to an illustrious family in Bengal, it shows in the clearest manner possible, the many advantages to be derived from a superior order of mental training among females.

The number of operatic pieces in Bengali is small, much less the number of good and readable ones. But here we have a work containing a number of exquisite songs. The scenes are all well conceived. And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste, so rarely to be met with in the ordinary run of Bengali operas. We may venture to say *Basanta Utsab* is the *best of its kind* in the Bengali language. The song serving as dedi-

cation, *Lila's* songs of despair and disappointed love, and those of *Sangit* and *Kabita* have a charming effect upon the reader. The third scene, Act I, which brings us to the temple of *Maya Debi* with *Udasini* absorbed in prayer is exquisitely grand. And we can well conceive what a telling effect it will have on the audience if properly managed. From what we have said above we have no hesitation in asserting that *Basanta Utsab* is a work of intrinsic merit and that it differs widely from other works of its class in its superior moral tone and purity of sentiments and expression. We heartily wish it may have an extensive circulation.

BRAHMO PUBLIC OPINION.

আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসীদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুলতোলা, লীলার নৈরাশ্য শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি-

সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতিনাট্য খানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।

নববিভাকর।

The writer of this small opera is a Bengali lady who is very favorably known to our readers is the authoress of Dip Nirvan a novel which has been noticed at considerable length in a previous number of this *Review*. The present work fully sustains the reputation of its writer. The subject of the opera is a well conceived story of two male and two female lovers. The story is told in an exquisite style. The authoress displays high poetical powers and many of her discription are charming webs of fancy woven by a fine and subtle instinct of poetry.

This is indeed the best Bengali opera we have yet seen. Its writer is an honour to her sex and to her country.

CALCUTTA REVIEW, JANUARY 1881.

ছিন্ন-মুকুল।

Another good book is before us—*Chinna Mukul* a Novel by the authoress of *Dip Nirban* and *Basanta Utsob*. The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasent transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of *Dip Nirban*. A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters' broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all of the characters are exteemely natural especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman-heroism and abnegation of self, liberate the fancy

tion of the writer. She then produced **Malati** an excellent novel, in which within a short compass, are vividly protrayed some of the subtlest workings of the heart.

Srimati Svarna Kumari Devi's last published work is Gatha, which is now before us. It is a collection of four beautiful idylls and as such a novelty in Bengali literature. Its poetry, as a contemporary justly remarks "is the poetry of genuine heart felt pathos—powerful from its soblimity and affecting from its tenderness,'' and its vercification is delicate and sweet" It is difficult to single out any one passage when so many challenge our admiration. But the best piece in the book is certainly that with which it concludes. The story on which this truly pathetic piece is based is very simple. A young man leaving behind his beloved and charming wife goes to a distant foreign country to fight the battle of life. He achieves success and sets out for home. He, however, encounters the grave perils of a ship-wreak on the return journey, and reaches his destination just in time to clasp in his agonised bosom the almost lifeless form of his wife. The feelings and situation of the unfortunate wife are beautifully conceived and skilfuly delineated.

The richness of imagination with which the

picture of the final catastrophe is drawn cannot be sufficiently admired, and reminds us of some of Byron's vigorous touches.

It is customary to make some relaxation of strict critical canons in favour of lady writers. But there is no necessity for extending this indulgence of the productions of Srimati Svarna Kumari Devi * * *

The works of Srimati Svarna Kumari Ghosal show clearly that she is well read in both English and Sanskrit poetry as well as in European works of imagination ; and we perfectly agree with the Calcutta Correspondent of the *Hindu* of Madras, an extract from whose letter we published in these columns some little while ago, "that never before in Bengal did a lady writer of such real powers and abilities appear, and shed such a lustre on the literature of her country" as the talented arthoress of Dip Nirvan, Basanta Utsav, Chinna Mukul, Malati and Gatha.

HINDOO PATRIOT.

To readers of this Review, the writer of this work is already favorably known as the authoress of a good Bengali novel, entitled *Dip Nirvan*, and of a good Bengali opera entitled *Basanta Utsav*.

The work before us consists of four small love stories in verse. The stories, we must say, are all happily conceived, indicating a refined and cultivated taste, a poetical frame of mind and a sweet, tender, and some times even vigorous, fancy. The stories are told in a half lyrical, half narrative style, of which the fair writer seems to be a parfect master. Her versification is sweet, smooth musical and eloquent. She appeals strongly to her reader's feelings. She describes the minds of lovers with great skill, and she has also a fine pencil for external objects.

CALCUTTA REVIEW.

১। 'দীপনির্ব্বাণরচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মালতী, ছিন্ন-মুকুল, বসন্ত উৎসব, গাথা ও দীপ-নির্ব্বাণ।"

বঙ্গের চিরভূষণ-স্বরূপা দীপনির্ব্বাণরচয়িত্রীর উচ্চশ্রেণীস্থ কাব্যোপন্যাসসমূহ বালিকা কুসুমকুমারীর কুসুমিকার সহিত এ স্থলে একত্র স্থাপিত ও একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। দীপ-নির্ব্বাণ, ছিন্নমুকুল ও গাথা প্রভৃতি গ্রন্থ এভাবে এবং এইরূপে সমালোচিত হইতে পারে না। আমরা যদি কখনও হিমেন্স, হানামোর, হেরিয়েট মার্টিনিয়ু এবং মেরায়া এজওয়ার্থ প্রভৃতি বৃটিশললনাদিগের কবিত্ব ও লিপিনৈপুণ্যের সমা-

লোচনা করিতে অবসর পাই, তাহা হইলে তুলনায় সমালোচনা করিয়া তখন আমরা এই চিরস্মরণীয় বঙ্গললনার কবিত্ব ও চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় দিব। ইহাঁর সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইহাঁর পুষ্পময়ী লেখনীর উপর ভারতীর পুষ্পবৃষ্টি হউক, এবং বঙ্গের যে সকল শিক্ষানুরাগিণী কুলকামিনী লেখা পড়া শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার ইহাঁর গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পড়িলে অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগেরও আমাদিগের উপকার হইতে পারে।

বান্ধব, পৌষ ১২৮৮।

পৃথিবী।

This book is a novelty in the Scientific literature of Bengali. It contains a series of essays in the astronomical, geological and physical aspects of the earth, by a lady of real powers and abilities. Srimati Sarna Cumari Devi, wife of Mr Janoki nath Ghosol, is well known to the literary world.

The book before us opens with a learned essay in the study of Science, in which the writer gives a clear explanation of Bacon's theory of induction and traces the rise and development of astronomy geology in Europe. She frequently compares the

astronomical theories of Europe with those of Hindoo astronomy.

The early chapters treat of the fundamental physical phenomena such as the solar system, the motions of the earth and the seasons. To elucedate the solar system, a clear explanation of Newton's laws of universal gravitation and of motion has been given. Later on the authoress enters way fully into the origin and structure of the earth's surface. She also touches upon the various theories regarding the interior of the earth. The concluding chapter is devoted to the discussion of the possible end of the earth.

The writer brings a great research and vast information to bear upon her book. All the difficult theories of the European astronomers and geologists have been explained in a clare chaste, and vigorous style. She has introduced many Scientific terms into the Bengali language. The work does great credit to the writer. We have no hesitation in saying that this is the best book in popular astronomy and geology in the Bengali language.

THE STATESMAN AND FRIEND OF INDIA.
Thursday, May 24 1883.

This is a book on Astronomy, Geology &c. It consists of an Introduction andof nine chapters. The first two chapters are astronomical treaties of universal gravitation, centripetal and centrifugal forces, the solar system the milky way, the fixed stars, the planets, the satellites, the comets &c. and of the size, figure, and movements of the earth. The third chapter treats of the origin of the Earth, and gives a short account of the views of Kant. Sir William Herschell, Laplace, Sir William Thomson and Helmholtj. The fourth, fifth, sixth, seventh and eighth chapters are geological, treating of the origin and formation of the crust of the earth of the different geological epochs and of the state of the interior at the earth. The last or ninth chapter is a speculation on the final condition of the earth—or, in other words, of its natural death. In the Introduction, the authoress gives a short account of the origin of history of science in India and in Europe, and, also of the progress and methods (Induction and Deduction) of modern science. The book is written in a very clear and simple style. On the whole, it is perhaps the best book in Bengali on the subjects of which it treats. the astronomical chapters give a very accurate account of the relation and revolution of the earth, of the precession of the Equinoxes, &c.

ced her literary career six years ago nor her other works which followed one another in rapid success-ion disclosed the name of their writer. And as these books possessed great merits and gave promise of future excellence, speculation was naturally rife as to their authorship. We set all the specula-tion at rest by announcing the name of this fair writer, an announcement which as might be ex-pected created much interest. The public saw now a zenana lady, who had never been in any school, or mixed in society, could write books in a chaste and vigorous style, delineating some of the sublest working of the human heart and display-ing admirable depth and purity of thought. Srima-ti Svarno Kumari Devi, indeed, is an ornament to her sex and to her country.

We are very glad to see that this talented au-thoress does not allow her powers to remain idle. Her last production—the work before us—fully sustains her reputation. She had previously writ-ten romances and tales, poetical and operatic pieces. This might have led the public to sup-pose that her powers did not go beyond the field of imagination. If such an impression was created, it would be removed by the present work which treats of scientific subjects. The "Prithivi," which is the first Scientfic work written by a Ben-

gali lady, is a collection and rep[illegible] of a series of papers that appeared from ti[illegible] time within the last two or three years in [illegible] pages of the well known Bengali periodicals—the Tatwabodhini Patrica and the Bharati. The authoress informs us in the preface that those papers have been carefully revised and in many places intirely re-written. The introduction to the book is worth more than a passing notice. It bears testimony to the extent of the fair writer's sanskrit learning. She points out that India was the birth-place of science, and that even in the Vedic times we find indications of the scientific acquirements of our fore-fathers. The Ancient Indians diligently cultivated astronomy at least three thousand years before the commencement of the Christian era; and it was from here that the cultivation of this science gradually extended to Chaldea, Egypt, and Greece. The law that the sun stands motionless in the centre while the earth and the other planets revolve about it was made known in Europe by copernicus in the sixteenth century; but Sirmati Surno Kumari Devi quotes a passage of Arya Bhatta's works which proves conclusively that the law was known in India more than a thousand years before its discovery in Europe. Then, She gives us a sloka from the Martundya